বর্ষ
পবর্ষ

সুনীল রায় সম্পাদিত

বঙ্গপ্রসঙ্গ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত -লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

সুশীল রায়
সম্পাদিত

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

পরিবর্ধিত সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৩৭২

~~সাধারণ সংস্করণ দাম আট টাকা~~

শোভন সংস্করণ দাম দশ টাকা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ১২
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমন্মথনাথ পান কর্তৃক কে. এম. প্রেস
১।১ দীনবন্ধু লেন হইতে মুদ্রিত

উৎসর্গ

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

বাংলা গদ্যসাহিত্যের বয়স বেশী নয়। খৃষ্টাব্দের উনিশ শতকের প্রারম্ভ ওর জন্মকাল বললে খুব ভুল হয় না। অবশ্য জন্মের আগেও জন্মাবার প্রস্তুতি আছে। দীপ জ্বালার পূর্বে সলতে পাকাবার কাল। সে সময়টা বাদ দিচ্ছি। এই অল্পকালের মধ্যে বাক্য-রচনা-রীতির সৌকর্য, তার শব্দসম্ভার, সূক্ষ্ম ও জটিল ওজঃ ও গভীর সব রকম ভাবপ্রকাশের অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য বাংলা গদ্যকে যে পরিণত সমৃদ্ধি দিয়েছে তা বাঙালীর আনন্দের উৎস। প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের আবির্ভাবের সৌভাগ্যে তা সম্ভব হয়েছে।

জন্ম থেকে অর্ধশতাব্দীর কিছু বেশী সময়, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনা আরম্ভ করার পূর্ব পর্যন্ত, বাংলা গদ্যসাহিত্য রসসৃষ্টির সাহিত্য ছিল না। সে রকমের সাহিত্য তখন যা লেখা হয়েছিল ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া তার বিশেষ সাহিত্যিক মূল্য দিতে সাহিত্যরসিকেরা সম্ভব রাজি হবেন না। সে সময়ের যা বড় সাহিত্য তা ছিল চিন্তা-প্রকাশের সাহিত্য। ইউরোপের নব বিদ্যা ও নূতন শক্তিমান ভাবধারার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে ধর্মে সমাজে শিক্ষায় আচরণে ও ব্যবহারে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল সে সাহিত্য ছিল মুখ্যত তার প্রতিক্রিয়া।—আলোচনার সাহিত্য, বিচারের সাহিত্য। কিছু বড় পুঁথি লেখা হয়েছিল। কিন্তু সে আলোচনা ও বিচার প্রধানত লেখা হয়েছে প্রবন্ধের আকারে। বাংলা গদ্যসাহিত্যের সে যুগের নাম দেওয়া চলে 'প্রবন্ধ-সাহিত্যের যুগ'।

সে প্রবন্ধ-সাহিত্যের যেগুলি শ্রেষ্ঠ রচনা তাদের সাহিত্যিক আকর্ষণ আজও লোপ হয়নি। সাহিত্যের ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের কাছেই নয়, তারা শিক্ষিত সাধারণ পাঠকের চিন্তাকে সচল করে সাহিত্য-পাঠের আনন্দ দেয়। বর্তমান কালের বাঙালী পাঠক, বিশেষ বাংলার লেখকদের সঙ্গে এই প্রবন্ধ-সাহিত্যের নিকট-পরিচয় আজ একটা বড় প্রয়োজন। বর্তমানের বাংলা গদ্য বাক্য-গড়নের সূক্ষ্ম সৌকুমার্যে সংস্কৃত ও দেশজ শব্দের সুষ্ঠ মিশ্রণে এক মহিমময় লঘু গতিছন্দ পেয়েছে। সাধারণ গুণী লোকের পক্ষেও বাংলা গদ্যের এই মনোরম ভঙ্গীটি গড়ে তোলা দুঃসাধ্য নয়। এবং তা গড়ে তোলার আকর্ষণ প্রবল। বিস্ময়ের কথা নয় যে, আমাদের হালের প্রবন্ধ-সাহিত্যে

ভাবের চেয়ে ভঙ্গী বেশী। চিন্তার অভাব পুরণ করতে চাচ্ছে ভাষার চাতুরী। সে চেষ্টায় যা লেখা হচ্ছে তার নামকরণ হয়েছে 'রম্যরচনা'। অর্থাৎ যে রচনার পোষাকটা ছিমছাম। সে পোষাক কি রকম শরীর ঢেকে আছে তা দেখার প্রয়োজন নেই। কোন্ ভদ্রলোক সেটা দেখতে চায়! বক্তব্য বিশেষ কিছু না থাকলেও চলে, যদি বলার কায়দাটা মনের চামড়ার উপর সুড়সুড়ি দেয়।

এই সৌখিন সাহিত্য-রচনার লোভ ও পড়ার আসক্তির একটা প্রতিষেধক আমাদের প্রাচীন প্রবন্ধ-সাহিত্যের চিন্তার গভীরতা ও সূক্ষ্মতা; ও যাকে ইংরেজিতে বলে high seriousness তার সঙ্গে পরিচয়। সে সব লেখা এখন সহজে পাওয়া যায় না। কিন্তু যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা প্রয়োজন। তার শ্রেষ্ঠ উপায় এ সব প্রবন্ধ বেছে বেছে নানা সংগ্রহ-গ্রন্থের প্রকাশ। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের জন্য নয়, শিক্ষিত সাধারণ পাঠকের জন্য।

শ্রীসুশীল রায় -সম্পাদিত 'বঙ্গপ্রসঙ্গ' বইখানিকে সেইজন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। বইখানি নানা লেখকের প্রবন্ধের সংগ্রহ-গ্রন্থ। সংগ্রহ কোনও বিশেষ কালে আবদ্ধ নয়। রামমোহন রায়ের ১৮২১ সালে লেখা প্রবন্ধ থেকে বিনয়কুমার সরকারের লেখা প্রবন্ধ পর্যন্ত বহু লেখকের লেখা এতে সংগ্রহ হয়েছে। যে সকল পাঠক এই সংগ্রহ-গ্রন্থের অনেক প্রবন্ধ প্রথম পড়বেন তাঁরা সম্ভব চমৎকৃত ও বিস্মিত হবেন। যে সব ভাব ও চিন্তাকে আমরা মনে করি আধুনিক, অনাধুনিক কালে তাদের গভীর মর্মস্পর্শী আলোচনায়, বাংলা গদ্যের যে লঘু ছন্দকে আমরা মনে করি সেদিনের সৃষ্টি, বহুদিন পূর্বে তার আবির্ভাব ও সৌকর্য দেখে।

এ সংগ্রহের প্রবন্ধগুলির স্বতন্ত্র উল্লেখ সম্ভব নয়, আর তার প্রয়োজনও নেই। পাঠকেরা এ প্রবন্ধগুলি পড়ে দেখবেন সেই আশায় ও ভরসাতেই বইখানি প্রকাশ হচ্ছে। তবে এ কথা নিশ্চয় বলা যায় এ প্রবন্ধগুলি পড়তে আরম্ভ করলে পাঠকের মন ক্লান্ত হবে না, কখনও ঝিমিয়ে পড়বে না। নানা সময়ের নানা লেখকের নানা বিষয়ের প্রবন্ধগুলির এমনি বৈচিত্র্য।

অনেকগুলি প্রবন্ধ বাংলা ভাষা নিয়ে। রাজনারায়ণ বসুর 'বাংলার ভাষা', কেশবচন্দ্র সেনের 'বাঙ্গালা ভাষা', দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার সাহিত্য', যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'বাংলা ভাষার প্রসারচিন্তা,' স্বামী বিবেকানন্দের 'বাঙ্গালা ভাষা'। এর কতকগুলি অনেকে পূর্বে পড়েছেন। কিন্তু এ প্রবন্ধগুলি

বহুবার পড়লেও মন প্রতিবার চিন্তার উদ্দীপনায় ও সাহিত্যপাঠের আনন্দের দোল খাবে। কেশবচন্দ্রকে যাঁরা নবধর্মপ্রবর্তক ও সমাজসংস্কারক বলেই জানেন, বিবেকানন্দকে কেবল মহাযোগী রামকৃষ্ণের সহকর্মী বীর্যবান শিষ্য বলে জানেন, 'সুলভ সমাচার' থেকে সংগ্রহ কেশবচন্দ্রের লেখাটি ও 'উদ্বোধন' থেকে উদ্ধৃত স্বামীজির চিঠিটি তাঁদের বিস্মিত করবে। ও দুটি লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃত করার লোভ কষ্টে দমন করলেম। ভক্তদের একাধিপত্য লোপ করে বাঙালী সাহিত্যকদের ও-দুজনকে নিজের বলে দাবি করার সময় হয়েছে।

ভূমিকা আর বাড়াব না। এ সংগ্রহকে আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

ভাদ্র ১৩৬৫

সম্পাদকের কথা

আমরা বাংলাদেশের অধিবাসী; কিন্তু এ আমাদেরই দুর্ভাগ্য, না, বাংলাদেশেরই দুর্ভাগ্য বলতে পারব না— আমরা এই দেশের বিষয়ে খুব বেশি কিছু ভাবতে শিখিনি, জানার কৌতূহলও হয়তো আমাদের মধ্যে খুব বেশি না। এর জন্যে আমাদের জ্ঞান বিন্দুমাত্র সংকুচিত হচ্ছে বলে আমরা স্বীকার করিনে, কেননা, আমরা এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডটির মধ্যে আমাদের জ্ঞানের সীমা বেঁধে না রেখে তাকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে দিয়েছি। আমরা দেশ-বিদেশের কথা পড়েছি, এবং সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস ও ভূগোল মুখস্থ করেছি। যাকে বাহির-বিশ্ব বলে, এর দ্বারা আমরা হয়তো তার নাড়িনক্ষত্রের হিসাব পেলাম, আমাদের চোখের আলো হয়তো নিক্ষেপ করলাম চতুর্দিকে; কিন্তু যে পিলসুজটির উপর দাঁড়িয়ে আমরা চারিদিকে আলোকসম্পাত করলাম, তার পাদমূল রয়ে গেল অন্ধকার।

বাংলাদেশের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বাংলার চিন্তাশীল মনীষীবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে যেসব অভিমত প্রকাশ করে গিয়েছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে তা সংগ্রহ করে একত্র করাই এই সংকলন-গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এর দ্বারা বাংলাদেশের একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। পিলসুজটির পাদমূলে হয়তো এর দ্বারা আলোকপাত ঘটবে।

পঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মরাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ— এই সমগ্র ভূমি নিয়ে ভারত-মহাদেশটি গঠিত।

পশ্চিমপ্রান্তের পোরবন্দর থেকে পূর্বপারের ব্রহ্মপুত্র, উত্তরের কাশ্মীর থেকে দক্ষিণের কুমারিকা-অন্তরীপ— এই বিশাল দেশ আমাদের স্বদেশ। বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন আচার বিভিন্ন আচরণ সত্ত্বেও এই দেশ সর্বসমন্বয়ের ভূমিতে পরিণত। এই সমন্বয় সম্ভব হয়েছে ভারতের একই জীবন-দর্শনের জন্যে। নগরবাসীর কথা আলাদা, ভারতের সপ্ত লক্ষ গ্রামের অধিবাসী একই কাহিনীর দ্বারা লালিত— সে-কাহিনী হচ্ছে মহাভারত ও রামায়ণের কাহিনী। রামায়ণ ও মহাভারতের পাত্রপাত্রীরা ভারতের প্রতিটি অঞ্চলের অধিবাসীর কাছেই আপনার জন বলে গণ্য। ভাষার বাধা কিম্বা আচার-আচরণের ব্যবধান এই আত্মীয়তার মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে নি। শত বিভিন্নতা সত্ত্বেও প্রতিটি ভারতবাসী একই মনের অধিকারী হয়েছে— সে মন ভারতীয় মন।

সবই সমন্বিত হয়েছে বটে, কিন্তু আর-কিছুর দ্বারা তেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে না হোক, ভাষার দ্বারা আমরা যেন কিছুটা খণ্ডিত। এরই দ্বারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের চৌহদ্দি রচনা করা হয়েছে বলা যায়। সংস্কৃত ভাষা থেকেই ভারতের বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি বটে, কিন্তু সেই ভাষা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ার সময় মূল সংস্কৃতের রূপ গিয়েছে বদ্‌লে, আকার গিয়েছে পরিবর্তিত হয়ে। এইজন্যে সংস্কৃতের প্রতি আমাদের প্রাণের বন্ধন থাকলেও আমাদের মনের লাগাম বাঁধা পড়েছে নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে। মাতৃস্তন্যের সঙ্গে যে ভাষা আমরা লাভ করেছি সেই ভাষাকেই আমরা বলি আমাদের মাতৃভাষা।

ভাষার কথা প্রসঙ্গে আর-একটি কথা মনে পড়েছে। সে-কথাটি হচ্ছে লিপি সম্বন্ধে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও অঞ্চলে অঞ্চলে যে ব্যবধান এখন আছে তা হয়তো দূর হয়ে যেত, যদি সারা ভারতে একটি লিপি প্রচলিত থাকত। বেশি দূরে না গিয়ে বাংলার কাছাকাছি দুটি অঞ্চলের কথা ধরি, আসাম ও উড়িষ্যা। অসমীয়া লিপির সঙ্গে বঙ্গলিপির অনেক মিল, এই জন্যে অসমীয়া ভাষা শিখতে বা লিখতে বেশি কষ্ট নেই, কিন্তু ভাষার দিক থেকে ওড়িয়া ও বাংলার সামান্য পার্থক্য সত্ত্বেও এই দুই অঞ্চলের লিপির পার্থক্য এতই ভয়ানক যে, উভয়ের ভাষা উভয়ের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত রূপ নিয়েছে। লিপির এই পার্থক্যটি সম্ভবত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা-গত মিলনের একমাত্র অন্তরায়।

আমরা বঙ্গবাসী। ভারতবর্ষ আমাদের স্বদেশ, বঙ্গদেশ আমাদের মাতৃভূমি। মাতৃভূমির কথা স্মরণে বিমুখ এমন হতভাগ্যের সংখ্যা হয়তো খুব বেশি না। আমরা অকপটে স্বীকার করব, এ কথা স্মরণে আমরা আনন্দ পাই। এই সংকলনটি প্রস্তুত করে সেই আনন্দই প্রকাশ করা হল।

বঙ্গভাষায় যাঁরা চিন্তা করেন, কথা বলেন, সাহিত্যচর্চা করেন, কোঁদল করেন, ক্ষেতখামারে কাজের ফাঁকে এই ভাষায় যাঁরা গান করেন, এবং যাঁরা স্বপ্ন দেখেন এই ভাষাতেই— তাঁরাই বঙ্গবাসী। বঙ্গদেশের সুখদুঃখ-হাসিঅশ্রুকে নিজেরই আনন্দ ও বেদনা বলে যাঁরা মনে করেন এ-বই তাঁদের জন্যে।

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এর মধ্যে কোনো অঞ্চল কোনো বিষয়ে হয়তো কিছু কম, আবার কোনো বিষয়ে

হয়তো কিছু বেশি অগ্রসর। কোনো অঞ্চলে সাহিত্যের, কোনো অঞ্চলে সংগীতের, কোনো অঞ্চলে শিল্পের উৎকর্ষ দেখা গিয়েছে। ব্যক্তিজীবনে বিশেষ একটি বিষয়ের চর্চা করে আত্মোন্নতি সম্ভব, কিন্তু সামগ্রিক উন্নতি না ঘটলে একটি জাতির জীবনের উন্নতি হল না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল সমগ্রভাবে ভারতের উন্নতির জন্যে নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে যুগপৎ প্রয়াস করে চলেছে।

বঙ্গদেশের সম্বল তার সাহিত্য এবং তার মনীষা। অতীতেও ভারতের ভাণ্ডারে বাংলাদেশ তার এই সাধ্য ও সাধনা দান করেছে, বর্তমানেও করছে এবং ভবিষ্যতেও সম্ভবত করবে। আমরা এখানে বাংলাদেশের সাহিত্যসাধক ও চিন্তানায়কদের অভিজ্ঞতা-অর্জিত সূক্তি সংগ্রহ করে দিলাম।

এই সংকলন প্রস্তুত করার সময়ে বাংলার গদ্যসাহিত্যের প্রথম যুগ থেকে আরম্ভ করে বঙ্গদেশ-সংক্রান্ত বিভিন্ন রচনা একত্র করার চেষ্টা করি। এইজন্যে সেই আদি যুগ থেকে আরম্ভ করে প্রায় এক শত নামের একটি তালিকা তৈরি করে নিই। তারপর প্রতি জনের রচনা কোন্ গ্রন্থে বা পত্রিকায় আছে, অনুসন্ধান করি। অন্বেষণ করতে করতে বেশির ভাগেরই লেখার মধ্যে অভিপ্রেত বিষয়ের উপরে রচনা চোখে পড়ে না। এইজন্যে শেষ পর্যন্ত তালিকা সংক্ষিপ্ত হয়ে এল।

এখানে উল্লেখ করে রাখা ভালো যে, এই বইতে জীবিত কোনো লেখকের রচনা সংকলিত হল না।

এই কাজে অনেকের কাছ থেকে সহযোগিতা লাভ করেছি। ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ অনেক বই ও পত্র-পত্রিকা দেখার সুযোগ দিয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠান তিনটির কর্মীদের সহযোগিতার জন্যে তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

জন্মাষ্টমী ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ
১৩বি কাঁকুলিয়া রোড। বালিগঞ্জ। কলিকাতা ১৯

সুশীল রায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বইটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় বোঝা গেল, বইটি পাঠক-সাধারণ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। বর্তমান সংস্করণে আরও চার জন লেখকের রচনা যুক্ত করতে পারায় আনন্দলাভ করেছি, তাঁরা হলেন— রাজেন্দ্রলাল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মীর মশার্‌রফ হোসেন ও মুন্সী আব্দুল করিম।

জন্মাষ্টমী ১৩৭২
৫৯বি (পুরাতন ১৩বি) কাঁকুলিয়া রোড
কলিকাতা ১৯

সুশীল রায়

সূচীপত্র

বঙ্গপ্রসঙ্গ

আদিবঙ্গ

রামমোহন রায়

১৭৭৪ - ১৮৩৩

শতার্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা। পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতারা ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্মের ঔৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্মের অপকৃষ্টতাসূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রীষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও যিশুখ্রীষ্টের শিষ্যের স্বধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্মের ঔৎকর্ষ্যের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না সেইরূপ মিসনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্বল ও দীন ও ভয়ার্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যক্তিরা দুর্বলের মনঃপীড়াতে সর্বদা সঙ্কুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই দুর্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্মান্তিক কোনোমতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ

আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্বপ্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়। লোকের স্বভাবসিদ্ধ প্রায় এই যে যখন এক দেশীয় লোক অন্য দেশকে আক্রমণ করে সেই প্রবলের ধর্ম যদ্যপিও হাস্যাস্পদস্বরূপ হয় তথাপি ঐ দুর্বল দেশীয়ে ধর্ম ও ব্যবহারের উপহাস ও তুচ্ছতা করিয়া থাকে তাহার উদাহরণ এই যে মোছলমানেরা এদেশ আক্রমণ করিলেক তাহারাও এইরূপ নানাবিধ ধর্মগ্লানি করিলেক। চঙ্গেশাহার সেনাপতিরা এদেশের পশ্চিমাংশকে যখন গ্রাস করিয়াছিল তখন যদ্যপিও তাহারা অনীশ্বরবাদী ও হিংস্রক পশুর ন্যায় ছিল তত্রাপি এদেশীয়দের ঈশ্বরনিষ্ঠা ও পরলোককে স্বীকার করা শুনিয়া আশ্চর্য ও উপহাস করিত। মগেরা যাহাদের প্রায় কোনো ধর্ম ছিল না তাহারাও বাঙ্গলার পূর্ব অঞ্চলকে আক্রমণ করিয়াছিল সর্বদা হিন্দুর ধর্মের ব্যাঘাত জন্মাইত। পূর্বকালে গ্রীকরা ও রোমীরা যাহারা অতি-নিকৃষ্ট পৌত্তলিক ও নানাবিধ অসৎ কর্মে বিব্রত ছিল তাহারাও আপন প্রজা ঈশ্বরপরায়ণ ইহুদির ধর্ম ও ব্যবহারের উপহাস করিত অতএব এদেশে অধিকারপ্রাপ্ত ইংরেজ মিসনরিরা এরূপ ধর্মঘটিত দৌরাত্ম্য ও উপহাস যাহা করেন তাহা অসম্ভাবনীয় নহে কিন্তু ইংরেজেরা সৌজন্য ও সুবিচারে উত্তমরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ন্যায় সেতুকে উল্লঙ্ঘন করেন না ইহাতে তাঁহারা পূর্ব পূর্ব অজ্ঞ দেশ আক্রমণকর্তাদের ন্যায় ধর্মঘটিত উপদ্রব করিলে তাঁহাদের প্রসিদ্ধ মহিমার ত্রুটি আছে যেহেতু নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা অথবা লোভ প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম সংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচারসহ হয় না তবে বিচারবলে হিন্দুর ধর্মের মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্মের উৎকৃষ্টত্ব ইহা স্থাপন করেন সুতরাং ইচ্ছাপূর্বক অনেকেই তাঁহাদের ধর্ম গ্রহণ করিবেক অথবা স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়েন এরূপ বৃথা ক্লেশ করা ও ক্লেশ দেওয়া হইতে ক্ষমাপন্ন হইবেন; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপজীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন যেহেতু সত্য ও ধর্ম সর্বদা ঐশ্বর্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম নহে।

'ব্রাহ্মণ সেবধি'। ১৮২১

সেকালের গৃহবধূ

রাসসুন্দরী দেবী

১৮১০ - ১৮৯৭

আমার শাশুড়ীঠাকুরাণীর মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যু হইলে ঘর একেবারে শূন্য হইল, ঘরে আমি একলা হইলাম। তখন ঐ সংসারের গৃহিণীর কর্মের ভার আমার উপর পড়িল। আমিও ভারি বিপদে পড়িলাম। তখন আমার চারিটি সন্তান হইয়াছে, আবার ঐ সংসারের গৃহিণীর কর্মের ভারটিও স্কন্ধে পড়িল। পূর্বের অবস্থা আর কিছু থাকিল না, সে সময় সমুদয় নূতন হইল। আমার নূতন বৌ নামটি পর্যন্ত পরিবর্তিত হইল। কেহ বলিত মা, কেহ বলিত মা ঠাকুরাণী, কেহ বলিত বউ, কেহ বলিত বউঠাকুরাণী, কেহ বলিত বাবুর মা, কেহ বলিত কর্তা মা, কেহ বলিত কর্তা ঠাকুরাণী। এই প্রকার অনেক নূতন নূতন নাম হইল। আমার পূর্বের বাল্যচিহ্ন আর কিছুই নাই। এককালে বাল্যভাব পরিবর্তিত হইয়া আমি একজন পুরাতন মানুষ হইলাম। পূর্বে আমার শরীরের অবস্থা এবং মনের ভাব যে প্রকার ছিল, এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আমি যেন এখন সে আমি নই, আমি যেন ভিন্ন আর একজন হইয়াছি। আমার মনের দুর্বলতা ঘুচিয়া কত বল এবং কত সাহস প্রাপ্তি হইল। আমার পুত্র-কন্যা, দাস-দাসী, প্রজা লোক ইত্যাদি নানা প্রকার সম্পদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া, আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, আমি এখন আচ্ছা একজন গৃহস্থ হইয়াছি, এ আবার কি কাণ্ড। এখন অধিকাংশ লোক আমাকে বলে কর্তা ঠাকুরাণী। দেখা যাউক, আরও কি হয়।

আমার তিনটি ননদ ছিলেন, তখন তাঁহারা বিধবা হইয়া আমার নিকটেই আসিলেন। তাঁহারা আমাকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিতেন, এবং অতিশয় যত্ন করিতেন। আমিও তাঁহাদিগকে বিগ্রহতুল্য সেবা করিতাম, তাঁহারা সম্পর্কে আমার ছোট ননদ ছিলেন, তথাপি আমার এত ভয় ছিল যে, আমি সর্বদা তাঁহাদিগের নিকট সশঙ্কচিত্তে যোড়করে থাকিতাম; তাঁহারাও আমাকে প্রাণতুল্য স্নেহ করিতেন। বাস্তবিক ননদে যে ভাইজকে এত স্নেহ করে, এ প্রকার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আমার চারি পাঁচটি সন্তান হইয়াছে, তথাপি এ পর্যন্ত আমি সেই ননদদিগের সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহিতাম না। ঐ সংসারের গৃহিণীর সমুদয় কাজ আমার করিতে হইত, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে

জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কর্ম করিতাম না। তাঁহারা সকল বিষয়ে বেশ উত্তম লোক ছিলেন।

আমি বার বৎসরের সময় পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া এই শ্বশুরবাটীতে আসিয়াছি। আর আমার বয়ঃক্রম যখন পঁচিশ বৎসর, তখন আমার মনের ভাব অনেক পরিবর্তিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন পর্যন্ত ছেলেমি ভাবটি কিছু কিছু ছিল। কিন্তু তখন তাহা বড় একটা প্রকাশ পাইত না। আমি যখন আট নয় বৎসরের ছিলাম, তখন আমাকে কত লোক পরিহাস করিয়া বলিত, তোমার মায়ের বিবাহ হয় নাই। আমার বুদ্ধি এমন ছিল, আমি সেই কথায় বিশ্বাস করিতাম। পরে যখন আমার পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম তখনও সেই বুদ্ধির শিকড় কিছু কিছু ছিল, কিন্তু লোকে বড় প্রকাশ পাইত না, গুপ্তভাবে থাকিত।

ঐ বাটীতে একটা ঘোড়া ছিল, তাহার নাম জয়হরি। এক দিবস আমার বড় ছেলেটিকে সেই ঘোড়ার উপর চড়াইয়া, বাটীর মধ্যে আমাকে দেখাইতে আনিল। তখন সকল লোক বলিল, এ ঘোড়াটি কর্তার। তখন আমাকে সকলে বলিতে লাগিল, দেখ দেখ! ছেলে কেমন ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছে, একবার দেখ! আমি ঘরে থাকিয়া শুনিলাম, ওটা কর্তার ঘোড়া, স্থতরাং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, যে কর্তার ঘোড়ার সম্মুখে আমি কেমন করিয়া যাই, ঘোড়া যদি আমাকে দেখে, তবে বড় লজ্জার কথা। আমি মনে মনে এই প্রকার ভাবিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া থাকিলাম। তখন সকলে বার বার বলিতে লাগিল, বাহিরে আসিয়া দেখ, ভয় কি? আমি ঘরের মধ্যে থাকিয়াই ভয়ে ভয়ে একটুক দেখিলাম।

ঐ বাটীর আঙ্গিনাতে রাশি রাশি ধান ঢালা থাকে। ঐ জয়হরি ঘোড়া প্রত্যহ আসিয়া ঐ ধান খাইত, পাছে ঐ ঘোড়া আমাকে দেখে, এই ভয়ে আমি যদি বাহিরে থাকিতাম, তবে তাহাকে দেখিবা মাত্র ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইতাম। এই প্রকারে কতক দিবস যায়, এক দিবস আমি পাকের ঘরে ছেলেদিগকে খাইতে দিয়া অন্য ঘরে আসিয়াছি, ইতিমধ্যে ঐ জয়হরি ঘোড়া আসিয়া ধান খাইতে আরম্ভ করিল। তখন আমি ভারি মুস্কিলে পড়িলাম। ছেলেদিগকে খাইতে দিয়াছি, তাহারাও মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিল, কেহ বা কাঁদিতে লাগিল। ঘোড়াও ধান খাইতে লাগিল, যায় না। আমি ভারি বিপদে পড়িয়া আগুয়ান পাছুয়ান করিতে লাগিলাম।

কি করি কর্তার ঘোড় পাছে আমাকে দেখে এই ভাবিয়া ঐ খানেই থাকিলাম। ইতিমধ্যে আমার বড় ছেলেটি আসিয়া বলিল, মা, ও ঘোড়া কিছু বলিবে না ও আমাদের জয়হরি ঘোড়া, ভয় নাই। তখন আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম, ছি ছি আমি কি মানুষ। আমি তো ঘোড়া দেখিয়া ভয় করি না, আমি যে লজ্জা করিয়া পলাইয়া থাকি। এতো মানুষ নহে, এ যে ঘোড়া ও আমাকে দেখিলে ক্ষতি কি। এই সকল কথা যদি অন্য কেহ শুনিতে পায়, তবে আমাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিবে। বাস্তবিক আমি যে ঘোড়া দেখিয়া লজ্জা করিয়া পলাইতাম, তাহা কেহ বুঝিত না। সকলে জানিত, আমি ঘোড়া দেখিয়া ভয়ে পলাইতাম। একথা আমি লজ্জায় আর কাহার নিকট প্রকাশ করিলাম না। কিন্তু সেই দিবস হইতে আমি আর ঘোড়া দেখিয়া পলাইতাম না। সে কথা সকলে জানিলে, বোধ হয় আমাকে কত বিদ্রূপ করিয়া হাসিত? বাস্তবিক আমার অতিশয় ভয় ছিল। এখনকার ছেলেপিলেরা এত ভয় করা দূরে থাকুক তাহাদিগকে বুড়া মানুষে ভয় করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, আমার নিজের বুদ্ধির দশা দেখিয়া মনে মনে ধিক্কার জন্মে। আমার কর্ম দেখিয়া অন্য লোক তো হাসিতেই পারে, আপন কথা মনে হইলে আপনারি হাসি আইসে।

তখন পর্যন্তও আমি পূর্বের মত বুক পর্যন্ত ঘোমটা দিয়া কাজ করিতাম, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, এখনও নূতন বউ হইয়া থাকিলে কোনমতে সংসারের কাজ চলিবে না। কাজের অনেক রকম ক্ষতি হইবে। তখন ঐ সকল চাকরাণীদিগের দুই-এক জনের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলাম। আমার ননদদিগের সঙ্গেও স্পষ্ট করিয়া কথা কহিতাম। আমি ঐ সংসারের সমুদয় কাজ একা করিতাম, আর গোপনে গোপনে বসিয়া চৈতন্যভাগবত পুস্তকও পড়িতাম। তখন যে আমি পুস্তক পড়িতে পারি, তাহা অন্য কেহ জানিত না, কেবল ঐ চাকরাণী কয়েকজন জানিত। আর আমার নিকটে ঐ গ্রামের যে কয়েকজন লোক সতত থাকিত, তাহারাই জানিত।

'আমার জীবন'। ১৩০৫ বঙ্গাব্দ

নদীবক্ষ

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮১৭ - ১৯০৫

উৎসাহ সহকারে আমরা ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। তখনকার সেই শ্রাবণ মাসের প্রবল স্রোত আমাদের বিপক্ষে; তাহার প্রতিকূলে, অতি কষ্টে, আস্তে আস্তে, চলিতে লাগিলাম। হুগলী আসিতেই তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। আর দুইদিন পরে কাল্‌নাতে আসিয়া মনে হইল, যেন কতদূরেই আসিয়াছি।

এইরূপে চলিতে চলিতে পাটুলি পশ্চাৎ করিয়া একদিন বেলা চারিটার সময় আমি রাজনারায়ণবাবুকে বলিলাম, 'আজ তোমার দৈনন্দিন লেখা শেষ করিয়া ফেল। আজ প্রকৃতির শোভা বড়ই দীপ্তি পাইতেছে; চল, আমরা বোটের ছাদের উপর গিয়া বসি।' তিনি বলিলেন যে, 'এখনও বেলার অনেক বাকী, ইহার মধ্যে আমার দৈনন্দিনের জন্য কত ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা কে জানে?'

এইরূপে তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় দেখি, পশ্চিমের আকাশে ঘটা করিয়া একটা মেঘ উঠিতেছে। তখন একটা ভারি ঝড়ের আশঙ্কা হইল। রাজনারায়ণবাবুকে বলিলাম, 'চল আমরা পিনিসে যাই; ঝড়ের সময় বোটে থাকা ভাল নয়।'

মাঝি পিনিসের সঙ্গে বোট লাগাইয়া দিল। আমি সিঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বোটের ছাদের উপর বসিয়া আছি, এবং দুইজন দাঁড়ী পিনিসের সঙ্গে মিলাইয়া বোট ধরিয়া আছে। অন্য একটা নৌকা গুণ টানিয়া যাইতেছিল, তাহাদের নৌকার গুণ আমাদের বোটের মাস্তুলের আগায় লাগিয়া গেল। সেই গুণ আমাদের একজন দাঁড়ী লগি দিয়া ছাড়াইতেছিল। আমি সেই গুণ ছাড়ান দেখিতেছি। যে দাঁড়ী গুণ ছাড়াইতেছিল, সে সেই বাঁশের লগির ভার সামলাইতে পারিল না। তাহার হাত হইতে লগি আমার মস্তকের উপর পড় পড় হইল। সামাল-সামাল রব পড়িয়া গেল, মহা গোল উঠিল। আমি তখনও সেই মাস্তুলের দিকে তাকাইয়া আছি। দাঁড়ী সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া আমার মস্তক বাঁচাইল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সামলাইতে পারিল না। লগির কোণ আসিয়া আমার চক্ষুর কোণে চশমার তারের উপর পড়িল। চক্ষুটা বাঁচিয়া গেল, কিন্তু চশমার তার

আমার নাসিকা কাটিয়া বসিয়া গেল। আমি টানিয়া চশমা তুলিয়া ফেলিলাম, আর দর দর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ছাদ হইতে নামিয়া তখন আমি নীচে বোটের কিনারায় বসিয়া রক্ত ধুইতে লাগিলাম।

ঝড়ের কথা মনে নাই, সকলেই একটু অসাবধান। দাঁড়ীরা পিনিস ধরিয়া আছে, এবং সেই অবস্থায় বোট লইয়া পিনিস চলিতেছে। এমন সময় একটা দমকা ঝড় আসিয়া পিনিসের মাস্তুলের একটি শাখা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সেই ভগ্ন মাস্তুলটি তাহার পাল দড়াদড়ি লইয়া বোটের মাস্তুলকে জড়াইয়া তাহার ছাদের উপর পড়িল; সেইখানে আমি পূর্বে বসিয়াছিলাম। এখন তাহা আমার মস্তকের উপর ঝুলিতে লাগিল। পিনিস অবশিষ্ট পাল-ভরে ঝড়ে ছুটিতে লাগিল, এবং বোটকে আকৃষ্ট করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিল। যে দুইজন দাঁড়ী পিনিস ধরিয়া আছে, তাহারা আর ঠিক রাখিতে পারে না। বোট পিনিসের টানে এক-কেতে হইয়া চলিল; সে দিকটা জলের সঙ্গে প্রায় মিশিয়াই পড়িল, কেবল এক আঙ্গুল মাত্র জল হইতে ছাড়া। মাস্তুলে জড়ান দড়ি কাটিয়া দিবার জন্য একটা গোল পড়িয়া গেল, 'আন্ দা' 'আন্ দা'; কিন্তু দা কেহ খুঁজিয়া পায় না। একখানা ভোঁতা দা লইয়া একজন মাস্তুলের উপর উঠিল। আঘাতের পর আঘাত, তারপরে আঘাত, কিন্তু এ ভোঁতা দা-য়ে দড়ি কাটে না। অনেক কষ্টে একটা দড়ি কাটিল, দুইটা কাটিল। তৃতীয়টা কাটিতেছে, আমি আর রাজনারায়ণবাবু স্তব্ধ হইয়া জলের দিকে তাকাইয়া আছি। এ নিমিষে আছি, পর নিমিষে আর নাই, জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি। রাজনারায়ণবাবুর চক্ষু স্থির, বাক্য স্তব্ধ, শরীর অসাড়। এদিকে দাঁড়ীরা দড়িই কাটিতেছে। আবার একটা ভারি দম্‌কা আইল। দাঁড়ীরা বলিয়া উঠিল, 'আবার তাই রে, তাই!' বলিতে বলিতে শেষ দড়িটা কাটিয়া ফেলিল। বোট নিষ্কৃতি পাইয়া তীরের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে ওপারে চলিয়া গেল এবং পাড়ের সঙ্গে সমান হইয়া দাঁড়াইল। আমি অমনি বোট হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া পড়িলাম; রাজনারায়ণবাবুকেও ধরাধরি করিয়া তুলিলাম।

এখন ডাঙ্গা পাইয়া আমাদের প্রাণ বাঁচিল, কিন্তু পিনিস তখনও দৌড়িতেছে। দাঁড়ীরা চেঁচাইতে লাগিল, 'থামা, থামা'। তখন সূর্য অস্ত গেল; মেঘের ছায়ার সঙ্গে সন্ধ্যার ছায়া মিশিয়া একটু ঘোর হইল; পিনিস থামিল কি না, অন্ধকারে ভাল দেখিতে পাইতেছি না। ওদিকে দেখি একটা ছোট নৌকা বেগে আমাদের বোটের দিকে আসিতেছে। দেখিতে

দেখিতে সেই নৌকা আমাদের বোটকে ধরিল। আমি বলিলাম, 'এ আবার কি? ডাকাতের নৌকা নাকি?' আমার ভয় হইল। সেই নৌকা হইতে লাফাইয়া একজন পাড়ের উপর উঠিল। দেখি যে, আমার বাড়ীর সেই স্বরূপ খানসামা। তাহার মুখ শুষ্ক। সে আমাকে একখানা চিঠি দিল। সেই অন্ধকারে অনেক চেষ্টা করিয়া যাহা পড়িলাম, তাহাতে বোধ হইল, ইহাতে আমার পিতার মৃত্যু সংবাদ আছে[১]। সে বলিল, 'কলিকাতা তোলপাড় হইয়া গিয়াছে। আপনার খোঁজে নৌকা করিয়া কত লোক বাহির হইয়াছে, কেহ আপনাকে ধরিতে পারে নাই। আমার এত কষ্ট সার্থক যে আমি আপনাকে ধরিলাম।'

এ সংবাদ হঠাৎ বজ্রপাতের ন্যায় আমার মস্তকে পড়িল। আমি স্তব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়া বোট লইয়া পিনিস ধরিতে গেলাম, এবং সেই পিনিস ধরিয়া তাহাতে উঠিলাম। সেখানে আলোতে পত্রখানা স্পষ্ট করিয়া পড়িলাম। এখন আর কি হইবে? তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ এখন আর কাহাকেও শুনাইলাম না।

পরদিন প্রাতঃকালেই কলিকাতা অভিমুখে ফিরিলাম। আমি যে বোটে ছিলাম, তাহা ১৪টা দাঁড়ের বোট। ইহার ভিতরকার দুই পার্শ্বে বেঞ্চের উপরে আঁটা তক্তা, তাহাতে দীর্ঘ ফরাস পাতা। আমি স্ত্রীপুত্রদিগকে তাহাতে লইলাম। রাজনারায়ণবাবুকে সমস্ত পিনিসের অধিকার দিয়া পশ্চাতে ধীরে ধীরে তাঁহাকে আসিতে বলিলাম। ভাদ্র মাসের গঙ্গার স্রোতে, দাঁড়ে পালে নক্ষত্রবেগে বোট ছুটিল; কিন্তু মন তাহার আগে ছুটিতেছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অনবরত বৃষ্টির ও বাতাসের কোলাহল। মধ্যপথে কালনাতে পঁহুছিবার কিছু পূর্বে, এক মাঠের ধারে এমন তুফান উঠিল যে, নৌকা ডুব ডুব হইয়া পড়িল। নৌকা কিনারা দিয়াই যাইতেছিল; মাঝিরা তৎক্ষণাৎ ডাঙ্গায় লাফাইয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি সম্মুখের একটা মুড়া গাছে তাহা বাঁধিয়া ফেলিল; বোট রক্ষিত হইল। তখন সেই মুড়া গাছটিকে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়

১ 'দেবেন্দ্রবাবু ঝিকিমিকি আলোকে চিঠি পড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা রহিয়াছে, Melancholy news from England; তাহাতেই তিনি বুঝিলেন, তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের তথায় মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতায় চব্বিশ ঘণ্টায় যাইতে হইবে, তাহা না হইলে বিষয়ের গোলযোগ উপস্থিত হইবে'।

এবং পরম বন্ধু বলিয়া আমার মনে হইল। পাঁচ মিনিট পরেই আবার আমার মনের আবেগে বোট খুলিয়া দিলাম। যখন বেলা প্রায় অবসান, তখন আমি মেঘের মধ্য দিয়া ক্ষীণপ্রভ সূর্যকে একবার দেখিতে পাইলাম। তখন আমি সুখসাগরে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। সূর্য যখন অস্ত হইল, তখন আমি ফরাসডাঙ্গায়। সেখানে দাঁড়ীদের হাত অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর আর তাহারা খাটিতে পারে না। আবার, জোয়ার আসিয়া পঁহুছিল; এ বিষম ব্যাঘাত। এখান হইতে পল্‌তায় আসিতে রাত্রি ৮টা হইল; এখানে আসিয়া বোট কাত হইয়া পড়িল। দিন দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রমাগত বৃষ্টি পড়িয়াছে। এক একবার দমকা বাতাসে দুই এক জায়গায় ভয়ে বোট থামাইতেও হইয়াছিল। দাঁড়ীরা বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া শীতে কাঁপিতেছে। পল্‌তায় পঁহুছিতেই কিনারা হইতে লোক আসিয়া সংবাদ দিল, এখানে গাড়ী প্রস্তুত আছে। এই কথা শুনিয়া আমার শরীরে প্রাণ আসিল।

আমি সেই যে বোটে বসিয়াছিলাম, একবারও তাহা হইতে উঠি নাই। এখন গাড়ীর কথা শুনিয়া সেখান হইতে উঠিয়া বোটের দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি যে, সেখানে আমার এক হাঁটু জল; নৌকার খোল জলে পূরিয়া গিয়া তাহার উপরে এক হাত পর্যন্ত জল দাঁড়াইয়াছে; সকলই বৃষ্টির জল; আমি তাহা পূর্বে জানিতেও পারি নাই[২]। যদি পল্‌তায় গাড়ী না থাকিত, যদি আমরা নৌকায় বরাবর কলিকাতার দিকে চলিতাম, তবে পথে জলভারে বোট নিশ্চয়ই ডুবিত; এ কথা আর কাহাকে বলিতেও পারিতাম না।

বোট হইতে নামিয়া গাড়ীতে চড়িলাম। রাস্তা জলময়; সেই জলের ভিতরে গাড়ীর চাকা অর্ধেক মগ্ন। অতি কষ্টে বাড়ী পঁহুছিলাম। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর; সকলেই নিদ্রিত, কাহারও সাড়া শব্দ নাই। বাড়ীর ভিতরে স্ত্রীপুত্রদিগকে প্রেরণ করিয়া আমি বৈঠকখানার তেতালায় উঠিলাম। সেখানে আমার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ব্রজবাবু আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাকে সেখানে একাকী অত রাত্রি পর্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করিতে দেখিয়া আমার মনে কেমন একটা আশঙ্কা উপস্থিত হইল! কেন তাহা জানি না।

'মহর্ষির আত্মজীবনী'। ১৮৯৮

২ নৌকার মধ্যভাগ বেঞ্চি সংলগ্ন তক্তায় ও ফরাসে ঢাকা ছিল।

পুরাতন লোকাচার

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৮২০ - ১৮৯১

অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা দান করিলে পিতামাতার গৌরীদান জন্য পুণ্যোদয় হয়, নবমবর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথ্বীদানের ফল লাভ হয়, দশমবর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পবিত্রলোকপ্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রপ্রতিপাদিত কল্পিত ফলমৃগ-তৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া পরিণাম বিবেচনা পরিশূন্য চিত্তে অস্মদ্দেশীয় মনুষ্য মাত্রেই বাল্যকালে পাণিপীড়নের প্রথা প্রচলন করিয়াছেন।

ইহাতে এপর্যন্ত যে কত দারুণ অনর্থ সঙ্ঘটন হইতেছে, তাহা কাহার না অনুভবগোচর আছে? শাস্ত্রকারকেরা এই বাল্যবিবাহ সংস্থাপনা নিমিত্ত এবং তারুণ্যাবস্থায় বিবাহ নিষেধার্থ স্ব স্ব বুদ্ধিকৌশলে এমত কঠিনতর অধর্মভাগিতার বিভীষিকা দর্শাইয়াছেন, যদ্যপি কোন কন্যা কন্যাদশাতেই পিতৃগৃহে স্ত্রীধর্মিণী হয়, তবে সেই কন্যা পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের কলঙ্কস্বরূপা হইয়া সপ্তপুরুষ পর্যন্তকে নিরয়গামী করে, এবং তাহার পিতা মাতা যাবজ্জীবন অশৌচগ্রস্ত হইয়া সমস্ত লোকসমাজে অশ্রদ্ধেয় ও আপাঙ্‌ক্তেয় হয়।

ইহাতে যদি কোন সুবোধ ব্যক্তির অন্তঃকরণে উক্ত বিধির প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মে, তথাপি তিনি চিরাচরিত লৌকিক ব্যবহারের পরতন্ত্র হইয়া স্বাভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হন না। তাঁহার আন্তরিক চিন্তা অন্তরে উদয় হইয়া ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণমাত্রেই অন্তরে বিলীন হইয়া যায়।

এইরূপে লোকাচার ও শাস্ত্রব্যবহারপাশে বদ্ধ হইয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা চিরকাল বাল্যবিবাহনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ও দুরপনেয় দুর্দশা ভোগ করিতেছি। বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয়, তাহা দম্পতিরা কখন আস্বাদ করিতে পায় না, সুতরাং পরস্পরের সপ্রণয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করণ বিষয়েও পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে, আর পরস্পরের অত্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহাও তদনুরূপ অপ্রশস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আর নব-বিবাহিত বালক-বালিকারা পরস্পরের চিত্তরঞ্জনার্থে রসালাপ, বিদগ্ধতা, বাক্‌চাতুরী, কামকলা-কৌশল প্রভৃতির অভ্যাসকরণে ও প্রকাশকরণে সর্বদা সযত্ন থাকে, এবং তত্তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপায়পরিপাটী পরিচিন্তনেও তৎপর থাকে, সুতরাং তাহাদিগের বিদ্যালোচনার বিষম ব্যাঘাত জন্মিবাতে সংসারের সারভূত

বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া কেবল মনুষ্যের আকারমাত্রধারী, বস্তুতঃ প্রকৃতরূপে মনুষ্যগণনায় পরিগণিত হয় না।

সকল সুখের মূল যে শারীরিক স্বাস্থ্য, তাহাও বাল্যপরিণয়প্রযুক্ত ক্ষয় পায়, ফলতঃ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যে নিতান্ত দরিদ্র হইয়াছে, কারণ অন্বেষণ করিলে পরিশেষে বাল্যবিবাহই ইহার মুখ্য কারণ নির্ধারিত হইবেক সন্দেহ নাই।

হায়! জগদীশ্বর আমাদিগকে এ দুরবস্থা হইতে কত দিনে উদ্ধার করিবেন। এবং সেই শুভ দিনই বা কত কালের পর উপস্থিত হইবে। যাহা হউক, অধুনা এতদ্বিষয় লইয়া যে আন্দোলন হইতেছে, ইহাও মঙ্গল। বোধহয়, কখন না কখন এতদ্দেশীয় লোকেরা সেই ভাবি শুভ দিনের শুভাগমনে সুখের অবস্থা ভোগ করিতে সমর্থ হইবেক।

এইরূপে অস্মদ্দেশীয় অন্যান্য অসদ্ব্যবহার বিষয়ে যদ্যপি সর্বদাই লিখন পঠন ও পর্যালোচনা হয়, অবশ্যই তন্নিরাকরণের কোন সদুপায়-স্থির হইবেক সন্দেহ নাই। অনবরত মৃত্তিকা খনন করিলে কত দিন বারি বিনির্গত না হইয়া রহিতে পারে? কাষ্ঠে কাষ্ঠে অনবরত সঙ্ঘর্ষণ করিলে কতক্ষণ হুতাশন বিনিঃসৃত না হইয়া থাকিতে পারে? এবং অনবরত সত্যের অনুসন্ধান করিলে কত দিনই বা তাহা প্রকাশিত না হইয়া মিথ্যাজালে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?

আমরা অন্তঃকরণমধ্যে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া বাল্যবিবাহের বিষয়ে যথাসাধ্য কিঞ্চিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সৃষ্টিকর্তার এই বিশ্বরচনামধ্যে সর্বজীবেরই স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি ও তদুভয়ের সংসৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টরূপের বিশ্বরূপে এই অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যে, স্ত্রীপুংজাতি কোনরূপ অপ্রতিবন্ধ সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ থাকিয়া ইতরেতর রক্ষণাবেক্ষণপূর্বক স্বজাতীয় জীবোৎপত্তিনিমিত্ত নিত্য যত্নশীল হয়। বিশেষতঃ মনুষ্যজাতীয়েরা এক স্ত্রী, এক পুরুষ, উভয়ে মিলিত হইয়া, পরস্পরের উপরোধানুরোধ রক্ষা করত সপ্রণয়ে উত্তম নিয়মানুসারে সংসারের নিয়ম রক্ষা করে।

জগৎসৃষ্টির কত কাল পরে মনুষ্য জাতির এই বিবাহসম্বন্ধের নিয়ম চলিত আত্মপরবিবেক হইয়াছে, যদ্যপি তদ্বিশেষ নির্দেশ করা অতি দুরূহ, তথাপি এই মাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে, যখন মনুষ্যমণ্ডলীতে বৈষয়িক জ্ঞানের কিঞ্চিৎ নির্মলতা ও রাজনীতির কিঞ্চিৎ প্রবলতা হইতে আরম্ভ হইল এবং যখন

আত্মপরবিবেক, স্নেহ, দয়া, বাৎসল্য, মমতাভিমান ব্যতিরেকে সংসারযাত্রার সুনির্বাহ হয় না, বিবাহসম্বন্ধই ঐ সকলের প্রধান কারণ, ইত্যাকার বোধ সকলের অন্তঃকরণে উদয় হইতে লাগিল, তখনি দাম্পত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ বিবাহের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

অনন্তর সর্বদেশে এই বিবাহের প্রথা পূর্বপূর্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অস্মদ্দেশে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং এমত নিকৃষ্ট হইয়াছে যে, যথার্থ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে; বর্তমান বিবাহ-নিয়মই অস্মদ্দেশের সর্বনাশের মূল কারণ।

এতদ্দেশে পিতামাতারা পুত্রী সম্প্রদানের নিমিত্ত স্বয়ং বা অন্য দ্বারা পাত্র অন্বেষণ করিয়া, কেবল অসার কৌলীন্যমর্যাদার অনুরোধে পাত্র মূর্খ ও অপ্রাপ্ত-বিবাহকাল এবং অযোগ্য হইলেও তাহাকে কন্যা দান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য বোধ করেন, উত্তরকালের কন্যার ভাবি সুখ দুঃখের প্রতি একবারও নেত্রপাত করেন না। এই সংসারে দাম্পত্যনিবন্ধন সুখই সর্বাপেক্ষা প্রধান সুখ। এতাদৃশ অকৃত্রিম সুখে বিড়ম্বনা ঘটিলে দম্পতির চিরকাল বিষাদে কালহরণ করিতে হয়। হায়, কি দুঃখের বিষয়! যে পতির প্রণয়ের উপর প্রণয়িনীর সমুদায় সুখ নির্ভর করে, এবং যাহার সচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন সুখী ও অসচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন দুঃখী হইতে হইবেক, পরিণয়কালে তাদৃশ পরিণেতার আচার ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে যদ্যপি কন্যার কোন সম্মতির প্রয়োজন না হইল, তবে সেই দম্পতির সুখের কি সম্ভাবনা রহিল।

মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্য ভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে। অস্মদ্দেশীয় বালদম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান পাইল না, আলাপ পরিচয় দ্বারা ইতরেতর চরিত্রপরিচয়ের কথা দূরে থাকুক; একবার অন্যোন্য নয়ন-সঙ্ঘটনও হইল না, কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতা মাতার যেরূপ অভিরুচি হয়, কন্যাপুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখ দুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল। এইজন্যই অস্মদ্দেশে দাম্পত্যনিবন্ধনে অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণয়ী ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে।

অপ্রমত্ত শরীরতত্ত্বাভিজ্ঞ বিজ্ঞ ভিষগ্বর্গেরা কহিয়াছেন, অনতীত-শৈশবে জায়া-পতি-সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহার গর্ভাবাসেই প্রায় বিপত্তি ঘটে, যদি প্রাণবিশিষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাকে আর ধাত্রীর অঙ্কশয্যাশায়ী হইতে না হইয়া অনতিবিলম্বেই ভূতধাত্রীর গর্ভশায়ী হইতে হয়। কথঞ্চিৎ যদি জনক জননীর ভাগ্যবলে সেই বালক লোকসংখ্যার অঙ্ক বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু স্বভাবতঃ শরীরের দৌর্বল্য ও সর্বদা পীড়ার প্রাবল্যযুক্ত সংসারযাত্রার অকিঞ্চিৎকর পাত্র হইয়া অল্পকালমধ্যেই পরত্র প্রস্থিত হয়। সুতরাং যে সন্তানোৎপত্তিফলনিমিত্ত দাম্পত্য সম্বন্ধের নির্বন্ধ হইয়াছে, বাল্যপরিণয় দ্বারা সেই ফলের এই প্রকার বিড়ম্বনা সঙ্ঘটন হইয়া থাকে।

অস্মদ্দেশীয়েরা ভূমণ্ডলমধ্যস্থিত প্রায় সর্বজাতি অপেক্ষা ভীরু ক্ষীণ দুর্বলস্বভাব এবং অল্প বয়সেই স্থবিরদশাপন্ন হইয়া অবসন্ন হয়, যদ্যপি এতদ্বিষয়ে অন্যান্য সামান্য কারণ অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, বাল্যবিবাহই এ সমুদায়ের মুখ্য কারণ হইয়াছে। পিতামাতা সবল ও দৃঢ়শরীর না হইলে সন্তানেরা কখন সবল হইতে পারে না, যেহেতু ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, দুর্বল কারণ হইতে সবল কার্যের উৎপত্তি কদাপি সম্ভবে না, যেমন অনুর্বরা ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ বপন এবং উর্বরা ক্ষেত্রে হীনবীর্য বীজ রোপণ করিলে উৎকৃষ্ট ফলোদয় হয় না, সেইরূপ অকাল বপনেও ইষ্টসিদ্ধির অসঙ্গতি হয়।

ভারতবর্ষে নিতান্তই যে বীর্যবন্ত বীরপুরুষের অসদ্ভাব ছিল, এমত নহে, যেহেতু পূর্বতন ক্ষত্রিয়সন্তানেরা এবং কোন কোন বিপ্রসন্তানেরা যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্যে প্রবল পরাক্রম ও অসীম সাহস প্রকাশ করিয়া এই ভূমণ্ডলে অবিনশ্বর কীর্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের তত্তচ্চরিত্র পৌরাণিক ইতিবৃত্তে প্রথিত আছে, সেই সকল বীরপুরুষ প্রসব করাতে এই ভারতভূমিও বীর-প্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এবং এক্ষণেও পশ্চিমপ্রদেশে ভূরি ভূরি পরাক্রান্ত পুরুষেরা অনেকানেক বিষয়ে সাহস ও শৌর্যগুণের কার্য দর্শাইয়া পূর্বপুরুষীয় পরাক্রমের দৃষ্টান্ত বহন করিতেছে। এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ সেই জাতি ও সেই বংশে উৎপন্ন হইয়া যে এতাদৃশ দুর্বলদশাগ্রস্ত হইয়াছে, বাল্যপরিণয় কি ইহার মুখ্য কারণ নয়? কেন না, পূর্বকালে প্রায় সর্বজাতি-মধ্যেই অধিক বয়সে দারক্রিয়া নিষ্পন্ন হইত। যদ্যপি তৎকালে অষ্টবিধ

আত্মপরবিবেক, স্নেহ, দয়া, বাৎসল্য, মমতাভিমান ব্যতিরেকে সংসারযাত্রার সুনির্বাহ হয় না, বিবাহসম্বন্ধই ঐ সকলের প্রধান কারণ, ইত্যাকার বোধ সকলের অন্তঃকরণে উদয় হইতে লাগিল, তখনি দাম্পত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ বিবাহের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

অনন্তর সর্বদেশে এই বিবাহের প্রথা পূর্বপূর্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অস্মদ্দেশে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং এমত নিকৃষ্ট হইয়াছে যে, যথার্থ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে; বর্তমান বিবাহ-নিয়মই অস্মদ্দেশের সর্বনাশের মূল কারণ।

এতদ্দেশে পিতামাতারা পুত্রী সম্প্রদানের নিমিত্ত স্বয়ং বা অন্য দ্বারা পাত্র অন্বেষণ করিয়া, কেবল অসার কৌলীন্যমর্যাদার অনুরোধে পাত্র মূর্খ ও অপ্রাপ্ত-বিবাহকাল এবং অযোগ্য হইলেও তাহাকে কন্যা দান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য বোধ করেন, উত্তরকালের কন্যার ভাবি সুখ দুঃখের প্রতি একবারও নেত্রপাত করেন না। এই সংসারে দাম্পত্যনিবন্ধন সুখই সর্বাপেক্ষা প্রধান সুখ। এতাদৃশ অকৃত্রিম সুখে বিড়ম্বনা ঘটিলে দম্পতির চিরকাল বিষাদে কালহরণ করিতে হয়। হায়, কি দুঃখের বিষয়! যে পতির প্রণয়ের উপর প্রণয়িনীর সমুদায় সুখ নির্ভর করে, এবং যাহার সচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন সুখী ও অসচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন দুঃখী হইতে হইবেক, পরিণয়কালে তাদৃশ পরিণেতার আচার ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে যদ্যপি কন্যার কোন সম্মতির প্রয়োজন না হইল, তবে সেই দম্পতির সুখের কি সম্ভাবনা রহিল।

মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্য ভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে। অস্মদ্দেশীয় বালদম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান পাইল না, আলাপ পরিচয় দ্বারা ইতরেতর চরিত্রপরিচয়ের কথা দূরে থাকুক; একবার অন্যোন্য নয়ন-সঙ্ঘটনও হইল না, কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতা মাতার যেরূপ অভিরুচি হয়, কন্যাপুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখ দুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল। এইজন্যই অস্মদ্দেশে দাম্পত্যনিবন্ধনে অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণয়ী ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে।

অপ্রমত্ত শরীরতত্ত্বাভিজ্ঞ বিজ্ঞ ভিষগ্বর্গেরা কহিয়াছেন, অনতীত-শৈশবে জায়া-পতি-সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহার গর্ভাবাসেই প্রায় বিপত্তি ঘটে, যদি প্রাণবিশিষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাকে আর ধাত্রীর অঙ্কশয্যাশায়ী হইতে না হইয়া অনতিবিলম্বেই ভূতধাত্রীর গর্ভশায়ী হইতে হয়। কথঞ্চিৎ যদি জনক জননীর ভাগ্যবলে সেই বালক লোকসংখ্যার অঙ্ক বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু স্বভাবতঃ শরীরের দৌর্বল্য ও সর্বদা পীড়ার প্রাবল্যযুক্ত সংসারযাত্রার অকিঞ্চিৎকর পাত্র হইয়া অল্পকালমধ্যেই পরত্র প্রস্থিত হয়। সুতরাং যে সন্তানোৎপত্তিফলনিমিত্ত দাম্পত্য সম্বন্ধের নির্বন্ধ হইয়াছে, বাল্যপরিণয় দ্বারা সেই ফলের এই প্রকার বিড়ম্বনা সঙ্ঘটন হইয়া থাকে।

অস্মদ্দেশীয়েরা ভূমণ্ডলমধ্যস্থিত প্রায় সর্বজাতি অপেক্ষা ভীরু ক্ষীণ দুর্বলস্বভাব এবং অল্প বয়সেই স্থবিরদশাপন্ন হইয়া অবসন্ন হয়, যদ্যপি এতদ্বিষয়ে অন্যান্য সামান্য কারণ অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, বাল্যবিবাহই এ সমুদায়ের মুখ্য কারণ হইয়াছে। পিতামাতা সবল ও দৃঢ়শরীর না হইলে সন্তানেরা কখন সবল হইতে পারে না, যেহেতু ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, দুর্বল কারণ হইতে সবল কার্যের উৎপত্তি কদাপি সম্ভবে না, যেমন অনুর্বরা ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ বপন এবং উর্বরা ক্ষেত্রে হীনবীর্য বীজ রোপণ করিলে উৎকৃষ্ট ফলোদয় হয় না, সেইরূপ অকাল বপনেও ইষ্টসিদ্ধির অসঙ্গতি হয়।

ভারতবর্ষে নিতান্তই যে বীর্যবন্ত বীরপুরুষের অসদ্ভাব ছিল, এমত নহে, যেহেতু পূর্বতন ক্ষত্রিয়সন্তানেরা এবং কোন কোন বিপ্রসন্তানেরা যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্যে প্রবল পরাক্রম ও অসীম সাহস প্রকাশ করিয়া এই ভূমণ্ডলে অবিনশ্বর কীর্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের তত্তচ্চরিত্র পৌরাণিক ইতিবৃত্তে প্রথিত আছে, সেই সকল বীরপুরুষ প্রসব করাতে এই ভারতভূমিও বীর-প্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এবং এক্ষণেও পশ্চিমপ্রদেশে ভূরি ভূরি পরাক্রান্ত পুরুষেরা অনেকানেক বিষয়ে সাহস ও শৌর্যগুণের কার্য দর্শাইয়া পূর্বপুরুষীয় পরাক্রমের দৃষ্টান্ত বহন করিতেছে। এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ সেই জাতি ও সেই বংশে উৎপন্ন হইয়া যে এতাদৃশ দুর্বলদশাগ্রস্ত হইয়াছে, বাল্যপরিণয় কি ইহার মুখ্য কারণ নয়? কেন না, পূর্বকালে প্রায় সর্বজাতি-মধ্যেই অধিক বয়সে দারক্রিয়া নিষ্পন্ন হইত। যদ্যপি তৎকালে অষ্টবিধ

বিবাহক্রিয়ার শাস্ত্র পাওয়া যায়, তথাপি অধিকবয়োনিষ্পন্ন গান্ধর্ব আসুর রাক্ষস পৈশাচ, এই বিবাহচতুষ্টয় অধিক প্রচলিত ছিল, ইহা ভিন্ন স্বয়ম্বর প্রথারও প্রচলন ছিল, এবং সেই সমুদায়প্রকার বিবাহক্রিয়া বরকন্যার অধিক বয়স ব্যতীত সম্ভবে না। আরো আমরা অনুসন্ধান দ্বারা পশ্চিমদেশীয় লোকমুখে জ্ঞাত আছি, তদ্দেশে অদ্যাপি প্রায় সর্বজাতিমধ্যে বরকন্যার অধিক বয়সে বিবাহকর্ম নির্বাহ হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্দেশে জনকজননীসদৃশ অপত্যোৎপত্তির কোন অসঙ্গতি না থাকাতে তাহারা প্রায় সকলেই পরাক্রমী ও সাহসী হইয়া আসিতেছে। ইহার প্রমাণ, পশ্চিমদেশীয়েরা যখন অন্যবিধ জীবিকার উপায় না পায়, তখনি রাজকীয় সৈন্যশ্রেণীতে ও অন্যান্য ধনাঢ্য লোকের দৌবারিকতাদি কর্মে নিযুক্ত হইয়া অক্লেশে আজীবন নির্বাহ করে। এতদ্দেশীয়েরা অন্যভাবে জঘন্য বৃত্তিও স্বীকার করে, তথাপি কোন সাহসের ও পরাক্রমের কার্যে প্রবৃত্ত হয় না। এইজন্যই রাজকীয় সৈন্যমধ্যে কখন বঙ্গদেশোৎপন্ন ব্যক্তিকে দেখা যায় নাই। উৎকলদেশীয়েরা আমারদিগের অপেক্ষাও ভীরু এবং দুর্বলস্বভাব, এ নিমিত্ত আমরাও তাহাদিগকে ভীত ও কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিয়া থাকি। জানা গিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যেও এতদ্দেশের ন্যায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। অতএব পাশ্চাত্ত্য লোকের সহিত আমাদিগের ও উৎকলদিগের সাহস ও পরাক্রম বিষয়ে এতাদৃশ গুরুতর ইতরবিশেষ দেখিয়া কাহার না স্পষ্ট বোধ হইবে যে, বাল্যপরিণয়ই এতাদৃশ বৈলক্ষণ্যের কারণ হইয়াছে, নতুবা কি হেতুক যে উভয় দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, তদ্দেশীয়েরাই দুর্বল ও সাহসবিহীন হয়, এবং যে প্রদেশে অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে, তদ্দেশীয়েরাই বা কেন সাহসী ও পরাক্রান্ত হইতেছে।

এতদ্দেশে যদ্যপি স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে অস্মদ্দেশীয় বালকবালিকারা মাতৃসন্নিধান হইতেও সদুপদেশ পাইয়া অল্প বয়সেই কৃতবিদ্য হইতে পারিত। সন্তানেরা শৈশবকালে যেরূপ স্ব স্ব প্রসূতির অনুগত থাকে, পিতা বা অন্য গুরুজনের নিকট তাদৃশ অনুগত হয় না। শিশুগণের নিকটে সস্নেহ মধুর বচন যাদৃশ অনুকূলরূপে অনুভূয়মান হয়, উপদেশকের হিতবচন তাদৃশ প্রীতিজনক নহে। এই নিমিত্তে বালকেরা স্ত্রীসমাজে অবস্থিতি করিয়া যাদৃশ সুখী হয়, পুরুষসমাজে থাকিয়া তাদৃশ সুখী ও সন্তুষ্ট হয় না। অতএব স্তন্যপান পরিত্যাগ করিয়াই যদি বালকেরা

মাতৃ-মুখ-চন্দ্রমণ্ডল হইতে সরস উপদেশসুধা স্বাদ করিতে পায়, তবে বাল্যকালেই বিদ্যার প্রতি দৃঢ়তর অনুরাগী হইয়া অনায়াসে কৃতবিদ্য হইতে পারে। কারণ, সন্তানের হৃদয়ে জননীর উপদেশ যেমন দৃঢ়রূপে সংসক্ত হয় ও তদ্দ্বারা যত শীঘ্র উপকার দর্শে, অন্য শিক্ষকের দ্বারা তাহার শতাংশেরও সম্ভাবনা নাই, জননীর উপদেশকতাশক্তি থাকাতেই ইউরোপীয়েরা অল্প বয়সেই বিচক্ষণ ও সভ্যলক্ষণসম্পন্ন হয়। অতএব যাবৎ অস্মদ্দেশ হইতে বাল্যবিবাহের নিয়ম দূরীভূত না হইবে, তাবৎ উক্তরূপ উপকার কদাচ ঘটিবে না। আমরা অবগত আছি, কোন কোন ভদ্রসন্তানেরা স্ব স্ব কন্যা-সন্তানদিগকেও পুত্রবৎ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই কন্যাদিগের বর্ণপরিচয় হইতে না হইতেই উদ্বাহের দিন উপস্থিত হয়। সুতরাং তাহার পাঠের প্রস্তাব সেই দিনেই অস্তগত হইয়া যায়। পরে গৃহবাসিনী হইয়া তাহাকে পরের অধীনে শ্বশ্রূ শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের ইচ্ছানুসারে গৃহসম্মার্জন, শয্যাসজ্জন, রন্ধন, পরিবেশন ও অন্যান্য পরিচর্যার পরিপাটী শিক্ষা করিতে হয়। পিতৃগৃহে যে কয়েকটি বর্ণের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই স্থালী কটাহ দর্বী প্রভৃতির সহিত নিয়ত সদালাপ হওয়াতে একেবারেই লোপ পাইয়া যায়। ফলতঃ সেই কন্যাদিগের পিতামাতা যদ্যপি এতদ্দেশীয় বিবাহনিয়মের বাধ্য হইয়া শিক্ষার উপক্রমেই কন্যাদিগে পাত্রসাৎ না করেন, তবে আর কিছুকাল শিক্ষা করিলেই তাঁহাদিগের সেই দুহিতৃগণ ভাবী সন্তানগণের উপদেশক্ষম হইয়া পিতামাতার অশেষ অভিলাষ সফল করিতে পারেন। অতএব অধুনাতন সভ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা স্ত্রীজাতির শিক্ষা দান বিষয়ে যেরূপ উদ্‌যোগ করিবেন, তদ্রূপ বাল্যবিবাহপ্রথার উচ্ছেদ করণেও যত্নশালী হউন, নচেৎ কদাচ অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারিবেন না।

বাল্যকালে বিবাহ করিলে আমরা সর্বতোভাবে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হই। কারণ, প্রথমতঃ বিবাহঘটিত আমোদপ্রমোদ ও কেলিকৌতুকে বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য কাল যে বাল্যকাল, তাহা বৃথা ব্যয় হইয়া যায়। অনন্তর উপার্জনক্ষমতার জন্ম না হইতেই সন্তানের জন্মদাতা হই। সুতরাং তখন নিত্যপ্রয়োজনীয় অর্থের নিমিত্তে অত্যন্ত ব্যাকুল হইতে হয়। কারণ, গৃহস্থ ব্যক্তির হস্তে ক্ষণেক অর্থ না থাকিলে চতুর্দশ ভুবন শূন্যময় প্রতীত হইতে থাকে। তৎকালে যদি অসৎ কর্ম করিয়াও অর্থলাভ সম্পন্ন হয়,

তাহাতেও নিতান্ত পরাঙ্মুখতা না হইয়া, বরং বারবার প্রবৃত্তি জন্মিতে থাকে। অনেক স্থলে এমতও দৃষ্ট হইয়াছে যে, বাস্তবিক সৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিরাও কতকগুলি অপোগণ্ড পরিবারে পরিবৃত হইয়া অগত্যা দুষ্ক্রিয়াকরণে সম্মত হইয়াছেন। আর ঐরূপ দুরবস্থাকালে পরম প্রীতির পাত্র পুত্রকলত্রাদি পরিবারবর্গ উপসর্গবৎ বোধ হয়। তখন কাজে কাজেই পিতৃসত্ত্বে তাঁহার অধীন, কখন বা সহোদরদিগের অনুগ্রহোপজীবী, কখন বা আত্মীয়বর্গের ভারস্বরূপ হইয়া স্বকীয় স্বাধীনতাসুখে বঞ্চিত ও জনপদে পদে পদে অপমানিত হইয়া অতিকষ্টে মনোদুঃখে জীবন ক্ষয় করিতে হয়। অতএব যে বাল্য-বিবাহ দ্বারা আমাদিগের এতাদৃশী দুর্দশা ঘটিয়া থাকে, সমূলে তাহার উচ্ছেদ করা কি সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর নহে ?

যদ্যপি কোন ব্যক্তি এমত আপত্তি উপস্থিত করেন যে, অস্মদ্দেশে বাল্যপরিণয়প্রথা না থাকিলে বালক বালিকাদিগের দুষ্কর্মাসক্ত হইবার সম্ভাবনা, একথায় আমরা একান্ত ঔদাস্য করিতে পারি না ; কিন্তু ইহা অবশ্যই বলিতে পারি, যদি বাল্যকালাবধি বিদ্যার অনুশীলনে সর্বদা মন নিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে কদাপি দুষ্ক্রিয়াপ্রবৃত্তির উপস্থিতিই হয় না। কারণ, বিদ্যা দ্বারা ধর্মাধর্মে ও সদাসৎ কর্মে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিচার জন্মে এবং বিবেশক্তির প্রাখর্য বৃদ্ধি হয়। তাহা হইলে অসদিচ্ছার উদয় হইবার অবসর কোথায় ? অতএব অপক্ষপাতী হইয়া বিবেচনা করিলে এতাদৃশ পূর্বপক্ষই উপস্থিত হইতে পারে না।

কত বয়সে মনুষ্যদিগের মৃত্যু ঘটনার অধিক সম্ভাবনা, যদি আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করি, তবে অবশ্যই প্রতীতি হইবে, মনুষ্যের জন্মকাল অবধি বিংশতি বর্ষ বয়স পর্যন্ত মৃত্যুর অধিক সম্ভাবনা। অতএব বিংশতি বর্ষ অতীত হইলে যদ্যপি উদ্বাহকর্ম নির্বাহ হয়, তবে বিধবার সংখ্যাও অধিক হইতে পারে না। এবং পিতামাতাদিগের তন্নিমিত্ত আশঙ্কার লাঘবও হইতে পারে। যেহেতু অস্মদ্দেশে বিধবা-বেদনের বিধি দৃঢ়তররূপে প্রতিষিদ্ধ হওয়াতে শাস্ত্রানুসারে বিধবাগণের যেরূপ কঠোর ব্রতানুষ্ঠান ও তজ্জন্য যে প্রকার দুঃখ সহন করিতে হয়, তাহা কাহার না অনুভবগোচর আছে ? বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার। এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যাকার। পতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত সুখ সাঙ্গ হইয়া যায়। এবং পতিবিয়োগ দুঃখের সহ সকল দুঃসহ দুঃখের সমাগম হয়। উপবাস

দিবসে পিপাসা নিবন্ধে কিম্বা সাংঘাতিক রোগানুবন্ধে যদি তাহার প্রাণাপচয় হইয়া যায়, তথাপি নির্দয় বিধি তাহার নিঃশেষ নীরস রসনাগ্রে গণ্ডূষমাত্র বারি বা ঔষধ দানেরও অনুমতি দেন না। অতএব যদি কোন বালিকা অনাথা হইয়া এইরূপ দারুণ দুরবস্থায় পতিতা হয়, যাহা বাল্যবিবাহে নিয়তই ঘটিতে পারে, তবে বিবেচনা কর, তাহার সমান দুঃখিনী ও যাতনাভাগিনী আর কে আছে? যে কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রতাচরণ পরিণত শরীর দ্বারাও নির্বাহকরণ দুষ্কর হয়, সেই দুশ্চর ব্রতে কোমলাঙ্গ বালিকাকে বাল্যাবধি ব্রতী হইতে হইলে তাহার সেই দুঃখদগ্ধ জীবন যে কত দুঃখেতে যাপিত হয়, বর্ণনা দ্বারা তাহার কি জানাইব। আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপ কত শত হতভাগা কুমারী উপবাসশর্বরীতে ক্ষুৎপিপাসায় ক্ষামোদরী শুষ্কতালু ম্লানমুখ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া যায়, তথাপি কোন কারুণিক ব্যক্তি তাহার তাদৃশ শোচনীয় অবস্থাতে করুণা দর্শাইয়া নিষ্ঠুর শাস্ত্রবিধি ও লোকাচার উল্লঙ্ঘনে সাহস করিতে চাহেন না। আর ঐ অভাগিনীগণেরও এমত সংস্কারে দৃঢ়তা জন্মে যে, যদি প্রাণবায়ুর প্রয়াণ হইয়া যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি জলবিন্দুমাত্র গলাধঃকরণ করিতে চায় না। অতএব যে সময়ে লালন-পালন শরীর সংস্কারাদি দ্বারা পিতামাতার সন্তানদিগকে পরিরক্ষণ করা উচিত, তৎকালে পরিণয়দ্বারা পরগৃহে বিসর্জন দিয়া এতাদৃশ অসীম দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করা নিতান্ত অন্যায্য কর্ম। আর ভদ্রকুলে বিধবা স্ত্রী থাকিলে যে কত প্রকার পাপের আশঙ্কা আছে, বিবেচনা করিলে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বিধবা নারী অজ্ঞানবশতঃ কখন কখন সতীত্ব ধর্মকেও বিস্মৃত হইয়া বিপথগামিনী হইতে পারে, এবং লোকাপবাদভয়ে ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি অতিবিগর্হিত পাপ কার্য সম্পাদনেও প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব অল্প বয়সে যে বৈধব্যদশা উপস্থিত হয়, বাল্যবিবাহই তাহার মুখ্য কারণ। সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম। অতএব আমরা বিনয়-বচনে স্বদেশীয় ভদ্র মহাশয়-দিগের সন্নিধানে নিবেদন করিতেছি, যাহাতে এই বাল্য পরিণয়রূপ দুর্নয় অস্মদ্দেশ হইতে অপনীত হয়, সকলে একমত হইয়া সতত এমত যত্নবান্ হউন।

'বিদ্যাসাগর রচনাবলী'। ১৮৫০

প্রাচীন বঙ্গের সংস্কৃতি

অক্ষয়কুমার দত্ত

১৮২০ - ১৮৮৬

যদিও এক্ষণে হিন্দুরা নিতান্ত নির্বীর্য ও নিরুদ্যম হইয়াছেন, এবং তদনুরূপ শাস্ত্র সকল কল্পিত হওয়াতে তাঁহাদের সমুদ্রগমন ও বিদেশযাত্রা রহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্বে তাঁহাদের কখনোই এরূপ শাস্ত্র বা ব্যবহার ছিল না। অতএব ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য বিষয়ক ইতিহাসের মধ্যে এ বিষয়ের বিবরণ করা কর্তব্য। পূর্বে যে হিন্দুদিগের দেশ-দেশান্তরে গমনাগমন ছিল, বেদ, রামায়ণ, মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা, কাব্য, নাটকাদি বিস্তর গ্রন্থে তাহার নিদর্শন আছে এবং যতই অনুসন্ধান করা যায়, ততই এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন ঋগ্‌বেদ সংহিতায় সমুদ্রযান ও সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ আছে, তখন অন্ততঃ তিন-চারি সহস্র বৎসরেরও পূর্বে আমাদিগের সমুদ্রপথে গমনাগমন আরব্ধ হইয়াছিল। মনু সামুদ্রিক ও দূরদেশবাসী বণিকদিগের বিষয়ে সাদর বচন উল্লেখ করিয়াছেন। রামায়ণের নানাস্থানে সমুদ্রযাত্রার নিদর্শন পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে কতিপয় পরম কৌতূহলজনক বচন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে এইরূপ আদেশ আছে যে, 'সমুদ্রান্তর্গত নগর ও পর্বত সমুদায়ে গমন করিবে' 'কোষাকারদিগের দেশে অর্থাৎ চীন দেশে যাত্রা করিবে' 'যবন দ্বীপ ও স্বুবর্ণ দ্বীপেও গমন করিবে এবং লোহিত সাগরেও গমন করিবে'। উপরোক্ত দুইটি দ্বীপ, ভারত সমুদ্রবর্তী যব ও স্বমিত্রা দ্বীপ বলিয়া অনুমান হয়।

বাল্মীকি রামায়ণে এই সকল দ্বীপের নাম ও তথায় গমন প্রসঙ্গ থাকাতে অতি পূর্বকালে তথায় হিন্দুদিগের গমনাগমন থাকা সূচিত হইতেছে। মহাভারতে অর্জুন ও নকুলের দিগ্বিজয়ার্থ সাগরান্তর্গত বহুতর দ্বীপ ও ভারত-বর্ষের বহির্ভূত অন্যান্য বিবিধ দেশ যাত্রা ও রঘুবংশে রঘু রাজার পারসীকাদি পশ্চিম রাজ্য জয় করিবার যে সকল বর্ণনা আছে, তথায় গমনাগমনের বিধি না থাকিলে তৎসমুদায় কাব্যগ্রন্থেও উল্লিখিত হইত না। বরাহ পুরাণে এইরূপ এক উপাখ্যান আছে যে, গোকর্ণ নামক নিঃসন্তান বণিক বাণিজ্যার্থ সমুদ্রে গমন করিয়াছিল, পথমধ্যে প্রচণ্ড ঝড় উপস্থিত হইয়া তাহার পোত ভগ্নপ্রায় হয়। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় সমুদ্রগামী বণিক্‌দিগের ঋণদানের ব্যবস্থা আছে। রত্নাবলী নাটকে সমুদ্রযাত্রা প্রসঙ্গ এবং সমুদ্র মধ্যে সিংহল-রাজপুত্রী রত্নাবলীর

পোতভঙ্গ ও কৌশাম্বী নগরবাসী বনিগ্ বিশেষের তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে তাহাকে আনয়ন করা, এই সমস্ত বর্ণনায় এ বিষয়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন লক্ষিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের অনেকানেক উপকথা মধ্যেও হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা থাকিবার বিস্তর চিহ্ন আছে; যথা— কথাসরিৎসাগরে অলঙ্কারবতী নামক নবম লম্বকের প্রথম তরঙ্গে পৃথ্বীরাজ ভূপাল ও তৎপ্রেরিত চিত্রকরের সমুদ্রপোত সহকারে মুক্তিপুর দ্বীপে গমন, দ্বিতীয় তরঙ্গে এক বণিকের বাণিজ্যার্থ ভার্যাসহ স্বর্ণভূমি দ্বীপে যাত্রা ও পথমধ্যে ঝঞ্ঝাবাতে তরণি-ভঙ্গ হইয়া তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটন, চতুর্থ তরঙ্গে সমুদ্রশূর ও অন্য এক বণিকের বাণিজ্যার্থ স্বর্ণ দ্বীপে যাত্রা ও নৌকা ভঙ্গ, ষষ্ঠ তরঙ্গে চন্দ্রস্বামীর স্বপুত্রানুসন্ধানার্থ অনেকানেক পোত-বণিকের সমুদ্র-যান আরোহণ করিয়া সিংহলাদি বহুতর দ্বীপে গমন, এবং চতুর্দাবিক নামক পঞ্চম লম্বকে শক্তি-দেবের উপাখ্যানে সমুদ্র মধ্যে এক পোত-বণিকের তরণিভঙ্গ, এক কাষ্ঠ ফলক অবলম্বন পূর্বক আর এক নৌকায় তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎকার ও সেই নৌকায় পিতাপুত্রের স্বদেশ প্রত্যাগমন, দশকুমার চরিতের পূর্বপীঠিকায় রত্নভব বণিকের কালযবন দ্বীপে গমন, এবং তথায় এক বণিক কন্যাকে বিবাহ করিয়া তৎসমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন কালে সমুদ্রগর্ভে তরণিপ্রবেশ, এবং তাহার উত্তরপীঠিকায় মিত্র গুপ্তের যবন পোত আরোহণ পূর্বক প্রবল বায়ুবেগে বিপথগামী হইয়া দীপান্তরে অবতরণ, আর কবিকঙ্কণোক্ত বঙ্গদেশীয় ধনপতি সওদাগর ও শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহলযাত্রা ও স্ত্রীলোকদের অমাবস্যা ব্রতের কথায় চাঁদ সওদাগরের উপাখ্যান, অভিজ্ঞান শকুন্তলা গ্রন্থে ধনবৃদ্ধি নামক বণিকের বিবরণ, হিতোপদেশে কন্দর্প কেতুর আখ্যান ও অনতিপ্রাচীন পুরাণ গ্রন্থে সমুদ্র যাত্রা নিষেধক বচন। এই সমস্ত বেদ, পুরাণ, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, সংহিতা, কথা ও উপকথাদির মধ্যে হিন্দুদিগের বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রার যথেষ্ট প্রমাণ-প্রসঙ্গপ্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

সুপ্রাচীন সুশ্রুতাদি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে জায়ফল জয়িত্রী দারুচিনি প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যের আবশ্যক হয়। ভারত সমুদ্রস্থিত কতিপয় দ্বীপ ঐ সকল দ্রব্যের উৎপত্তি স্থান। সুতরাং সমুদ্রযাত্রা স্বীকার না করিলে ঐ সকল ঔষধোপকরণ প্রাপ্ত হওয়া কথনই সম্ভব নহে।

ভারতসমুদ্রস্থ দ্বীপপুঞ্জের পুরাবৃত্তে হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বিদেশ গমনের নানা প্রকার প্রমাণ আছে। তাঁহারা ভারতসমুদ্র অতিক্রম পূর্বক বালী ও যবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তথায় হিন্দুশাস্ত্র হিন্দুধর্ম ও বিশেষতঃ শিবের উপাসনা প্রচার করেন। ঐ যবদ্বীপে ইদানীং মুসলমান ধর্ম প্রচলিত আছে বটে কিন্তু পূর্বে যে তথায় হিন্দুধর্ম প্রচারিত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি অখণ্ড নিদর্শন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় প্রম্বনন নামে একটি স্থান আছে, তাহার কোনো কোনো স্থলে দুইশত অপেক্ষা অধিক সংখ্যক দেবমন্দির এবং শিব দুর্গা গণেশ সূর্য প্রভৃতির পাষাণময়ী ও পিত্তলময়ী প্রতিমূর্তি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। মুসলমান হইয়াও অনেকে সেই সকল দেব প্রতিমূর্তিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। ঐ যবদ্বীপে যখন বৌদ্ধধর্ম প্রবল হইয়া উঠে, তখন তথাকার কতকগুলি হিন্দু বালী নামক একটি নিকটস্থ ক্ষুদ্র দ্বীপে গিয়া আশ্রয় লয়। তাহারা অদ্যাবধি সেই স্থানে অবস্থিত থাকিয়া হিন্দুধর্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। তাহারা প্রাচীন হিন্দুদিগের ন্যায় চারি বর্ণে বিভক্ত— ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষঃ হইতে ক্ষত্রিয়, নাভির অধোভাগ হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে, একথাটিও তথায় প্রচলিত আছে। সেখানে চণ্ডাল বর্ণও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহারা গ্রামের প্রান্তভাগে বাস করে, এবং চর্ম ও মদিরার ব্যবসায় প্রভৃতি হীনবৃত্তি দ্বারা সংসার নির্বাহ করিয়া থাকে।

ঐ বালী দ্বীপে অদ্যাপি হিন্দু রাজারা রাজত্ব করেন, এবং হিন্দুদিগের পূর্বকালীন রাজনীতি অনুসারে ব্রাহ্মণেরা বিচারকের কার্য করিয়া থাকেন। তবে ব্রাহ্মণ প্রাড়্‌বিবাকের সংখ্যা অধিক নয়; অন্য অন্য অনেক বর্ণকেও বিচারকের পদ দেওয়া হইয়া থাকে। তথাকার ব্রাহ্মণেরা নিরামিষভোজী; মৎস্য মাংস পরিত্যাগ পূর্বক কেবল যব তণ্ডুল ও ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া শরীর রক্ষা করেন। তথায় শবদাহ ও সহমরণের রীতিও প্রচলিত আছে। ভার্যা যদি স্বামীর চিতারোহণ করে, তবে তাহাকে 'সত্য' বলে। আর উপপত্নী বা দাসী অথবা পরিবারস্থ অন্য কোনো স্ত্রীলোক সহমৃতা হইলে তাহাকে 'বেল' বলিয়া থাকে। তথায় উদ্বাহ বিষয়ে এ দেশীয় স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থানুগত অনুলোম ও বিলোমের বিষয় বিবেচনা করা প্রচলিত আছে। উৎকৃষ্ট বর্ণের লোকে নিকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু নিকৃষ্ট বর্ণের লোকে উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যা গ্রহণে অধিকারী নয়। বাস্তবিক

যেন তথায় একদল সেকালের হিন্দু বর্তমান। এই বালী দ্বীপে বেদ পুরাণাদি হিন্দু শাস্ত্রও বিদ্যমান আছে। যবদ্বীপ ও বালীদ্বীপস্থ হিন্দুদিগের মধ্যে এইরূপ একটি জনশ্রুতি আছে এবং উহাদের গ্রন্থেও এইরূপ লিখিত আছে যে, তাহারা ভারতবর্ষের অন্তর্গত কলিঙ্গ দেশ হইতে তথায় আগমন করে। বোর্নিয়ো দ্বীপে সরাবকা নামে একটি প্রদেশ আছে, তথাকার লোকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারিবর্গে বিভক্ত। যদিও তাহারা হিন্দুধর্ম-বিরুদ্ধ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তথাপি তাহারা যে যথার্থ হিন্দু বা হিন্দুধর্মাবলম্বী তাহার আর সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেও বেদাবলম্বী হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রার বিস্তর বিবরণ আছে। মহাবংশ নামক সিংহলীয় ইতিহাসে প্রায় চব্বিশ শত বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশীয় বিজয় নামক রাজকুমারের ও তাঁহার বামাদিগের সিংহলাদি দ্বীপে গমনপূর্বক বসতিকরণ, সিংহল দ্বীপ হইতে দাক্ষিণাত্যে লোক প্রেরণ ও তত্রত রাজবংশীয় ও অন্যান্য ভদ্র-বংশজাত কন্যাদিগের সহিত তাঁহাদের ও উত্তরকালবর্তী অন্য অন্য ব্যক্তিদিগের পাণিগ্রহণ, ভারতবর্ষ হইতে বিজয় রাজার ভ্রাতা সুমিত্রকে সিংহলে লইয়া যাইবার জন্য দূত প্রেরণ ও সুমিত্রা-নন্দন পাণ্ডু বাসুদেবের তথায় গমনপূর্বক রাজ্যাভিষেক ইত্যাদি পরম কৌতূহলজনক ব্যাপার সমুদায়ের বিবরণ আছে। বৌদ্ধদিগের বিনয় শাস্ত্রে এই প্রকার একটি আখ্যান আছে যে, গৌতম বুদ্ধের সময়ে অর্থাৎ ন্যূনাধিক দুই সহস্র চারিশত বৎসর পূর্বে, পূর্ণ নামে এক হিন্দু বণিক ছয় বার সমুদ্রযাত্রা ও সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পন্ন করিয়া সপ্তমবারে শ্রাবস্তি নগরবাসী কতকগুলি বৌদ্ধমতাবলম্বী লোকের সমভিব্যাহারে সমুদ্রে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে প্রাতঃ ও সায়ংকালে তাঁহাদের শাস্ত্রপাঠাদি শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শ্রদ্ধাবিষ্ট হইলেন, এবং শ্রাবস্তি নগরে প্রত্যাগমনপূর্বক বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করিলেন। উক্ত বিনয় শাস্ত্রানুসারে পূর্ণ যতকাল হিন্দুধর্মাক্রান্ত ছিলেন, তন্মধ্যে সাতবার সমুদ্রযাত্রা স্বীকার করেন।

পূর্বে ভারতবর্ষের সহিত চীনরাজ্যের বাণিজ্য ও ধর্মঘটিত নানারূপ সংস্রব ছিল। পঁয়ষট্টি খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশাধিপতি সম্রাট মিংতির রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হয়। যদিও ঐ সময়ের পূর্বে চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হইয়াছিল, কিন্তু দেশীয় রাজ পরিবারসমূহ তৎকালে উহা স্বীকার করেন নাই। ধর্ম ও বাণিজ্যোপলক্ষে চীন ও ভারতবর্ষের লোকেরা যে

পরস্পরের দেশে গমনাগমন করিত তাহারও অল্পবিস্তর বিবরণ পাওয়া যায়। চীনভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত এদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব চীনগ্রন্থে স্থানীয় লোকদিগের সহিত হিন্দুদিগের কিরূপ ধর্ম ও বিষয় কার্য ঘটিত বিবরণ আছে তাহা জ্ঞাত হওয়া দুষ্কর। কিন্তু কোনো কোনো তত্ত্বপিপাসু পণ্ডিতবর উক্ত ভাষার দ্বারোদ্ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, লিখিত মর্ম প্রকাশ করিয়াছেন। আসিয়াটিক সোসাইটি নামক সভার ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীমান লেডলি চীনদেশীয় কৌফকি গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে যে, ফাহিয়ন্ নামে একজন চীনদেশীয় পরিব্রাজক তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি ধর্মশাস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য চীন তাতার ও তিব্বতাদি দেশে পর্যটন পূর্বক হিমালয়ের দক্ষিণ অংশে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তথা হইতে সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইয়া পাঞ্জাব দিল্লী মথুরা প্রয়াগ বৈসলি রোহিলখণ্ড অযোধ্যাদি নানা দেশ পরিদর্শন করিয়া মগধে আসিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তমলুক যাত্রা করেন, এবং তথায় প্রায় দুই বৎসর অবস্থিতি করিয়া বৌদ্ধ প্রতিমূর্তি ও বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ পূর্বক অর্ণবযান আরোহণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। চৌদ্দ দিন সমুদ্রোপরি অতিবাহিত হইলে, তিনি সিংহল রাজ্যে অবতীর্ণ হইলেন। তমলুকবাসী সহযাত্রীদিগের নিকট হইতে জ্ঞাত হইলেন যে, এই স্থান তাহাদের দেশ হইতে সাত শত যোজন দূরে অবস্থিত, এবং ইহা পূর্ব-পশ্চিমে পঞ্চাশ যোজন দীর্ঘ ও উত্তর-দক্ষিণে ত্রিশ যোজন প্রশস্ত। উহার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে এক শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদ্বীপ আছে। এইগুলি প্রধান উপদ্বীপের অধীন এবং তথায় মণিমুক্তাদি বিবিধ প্রকার রত্ন উৎপন্ন হয়। তিনি সিংহলেও প্রায় দুই বৎসর বাস করেন, এবং মিশশি প্রোক্ত গ্রন্থ ও দীর্ঘ আহন ও বহুবিধ আহন্ নামক পুস্তকও সংগ্রহ করেন।

'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য-বিস্তার'। ১৩০৮

কুনীতি ও সুনীতি

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

১৮২২ - ১৮৯১

সামান্য একটা উদ্ভট বাক্য আছে যে, কোনো ব্যক্তির বন্ধুর বিবরণ ব্যক্ত হইলে তাহার আচরণ অনায়াসে ব্যক্ত হয়। এই প্রবাদের অনুকরণে অনায়াসে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারে যে, কিপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুকে কাহার মন তৃপ্ত হয় জানিতে পারিলে তাহার স্বভাব অনায়াসে বিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। মল্লযুদ্ধ-দর্শনে যাহাদের প্রীতি জন্মে তাহারা যে স্বভাবতঃ যুদ্ধানুরাগী এবং নিদ্রাপরবশেরা যে অলস ইহা ব্যাখ্যা করাই বাহুল্য; সকলেই ইহার যাথার্থ্য অঙ্গীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। লঙ্কাধিপতি রাবণ বলবান ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন; অতএব তাঁহার পক্ষে কাল্পনিক যুদ্ধ চতুরঙ্গ খেলার সৃষ্টি করা বিশেষ সংলগ্ন বোধ হয়। এতদ্দেশীয় উৎসব-বিবরণে উক্ত কথার অনেক প্রমাণ দৃষ্ট হইবে। বঙ্গদেশীয়েরা যবনদিগের প্রথম আধিপত্য-সময়ে কিপ্রকার মনোবিনোদ করিতেন তাহার কোনো বিবরণ আমরা জ্ঞাত নহি। বোধ হয় তৎকালে পূর্ব-প্রসিদ্ধ নাটকের কথঞ্চিৎ অপভ্রংশ প্রচলিত ছিল। তদনন্তর ক্রমশঃ এতদ্দেশীয়েরা যবনদিগের দৌরাত্ম্যে ঐহিক সুখে একান্ত হতাশ হইলে তাঁহাদের মনে পারলৌকিক সুখের লালসা প্রবল হয়। সেই লালসা-বর্ধনে নিযুক্ত হইয়া মহাপ্রভু সংকীর্তনের সৃষ্টি করেন; এবং তাহাই দেশীয়দিগের মনোরঞ্জনের প্রধান উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকে। যাহারা বিষ্ণুভক্ত ছিল না তাহাদের পক্ষে সংকীর্তন সমাদরণীয় হইতে পারে না; সুতরাং তাহারা চণ্ডীর গান প্রভৃতি সংকীর্তনের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকারে দুই শত বৎসর অতিবাহিত হইলে সাধারণের মন অজ্ঞান দৌর্বল্য ও পরাধীনতায় নিমগ্ন হইলে তাহাদের কৌতুক-কলাপের পরিবর্তন হয়। সেই পরিবর্তনের আদিকারণ নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তিনি সুচতুর ও সুপণ্ডিত ছিলেন, ও তাঁহার নিকট গুণিগণের প্রচুর সমাদর ছিল; কিন্তু লাম্পট্য-দোষে তাঁহার সে সমুদায় গুণগরিমা কলুষিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রসাদে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহারই কুপ্রবৃত্তির প্রভাবে বিদ্যাসুন্দরে অশ্লীলতার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র বিদগ্ধতাগুণের সমাদরার্থে গোপাল ভাঁড়কে নিকটে রাখিয়াছিলেন, এবং বোধ হয় তাঁহার সহবাসে সেই সুচতুর মর্মভেদী প্রভুর সম্মোদনার্থে আপন উদ্ভট বাক্যে সর্বদা অশ্লীলতার প্রয়োগ করিত। সে যাহা

হউক, তাঁহারই উৎসাহে খেঁউড়ের বাহুল্য হয়, সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র বারো মাস বর্ণনে তাহার সম্যক্ প্রমাণ দিয়াছেন। ঐ খেঁউড় ও কবি যে কি পর্যন্ত জঘন্য ছিল তাহা ভব্যতা রক্ষা করিয়া বর্ণন করাও দুষ্কর; যাঁহারা তাহাতে প্রমোদিত হন তাঁহাদিগের মনের অবস্থা অনুধ্যান করিতে হইলে সহৃদয়দিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় সন্দেহ নাই। কথিত আছে, এই কবির রচনায় চুঁচুড়া-নিবাসী লালুনন্দ লাল বিখ্যাত ছিল। তাহার পর হুগলী-নিবাসী রামজী ও কলিকাতা-নিবাসী রঘু তাঁতী প্রসিদ্ধ হয়। রঘু তাঁতীর শিষ্য হরুঠাকুর এবং তাহার সমকালে কয়েক ব্যক্তি উত্তম কবি-গায়ক বলিয়া বিখ্যাত হয়।

ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে, কবি ও খেঁউড়ের সদৃশ অশ্লীল বিনোদ কদাপি বহুকাল ভদ্রসমাজে সমাদৃত থাকিতে পারে না; কালসহকারে অবশ্যই তাহার হ্রাস হয়। দেশের কোনো অত্যন্ত ধনী ও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অনেক মন্দ ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে; কিন্তু তাহার খ্যাতি হ্রাস হইলে ও জ্ঞানালোকের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাপ্তি হইলে অবশ্যই সে ব্যবহার দূষ্য-বোধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের প্রচলিত কবি ও খেঁউড় দশা শীঘ্র প্রাপ্ত হয় নাই। কলিকাতার সুবিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ ও তৎপর কয়েক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐ কদর্য বিনোদের উৎসাহী হন। তাঁহাদিগের অপমৃতির পর গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস হইয়াছে। তাহার ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব হইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। শিশুরাম অধিকারী নামা এক ব্যক্তি কেঁদুলী-গ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে। সংকীর্তন ও পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায় লোপ হইয়াছিল। শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল ও তৎপর পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছে। কিন্তু যে পর্যন্ত তাহা আপন আদিম নাটকের অবয়ব ধারণ না করে সে পর্যন্ত দেশের বিনোদন-ব্যাপার পরিশুদ্ধ হইবে না। বিদ্যার উৎসাহে এই অভীপ্সিত ব্যাপারের সূত্রপাত হইয়াছে। গত চারি বৎসরাবধি কলিকাতা-নগরে অনেক স্থানে প্রকৃত নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হইতেছে। তদ্দর্শনে ধনী সম্ভ্রান্ত বিদ্যানুরাগী সকলেই একত্র হইয়া থাকেন; ও অভিনয়ের নির্মল-রসে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই সরস বিনোদে দেশ ব্যাপ্ত হয়—প্রতি গ্রামে উহার অনুরাগ হয়—ইহার প্রাদুর্ভাব যাত্রা কবি খেঁউড় প্রভৃতি

দৃষ্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটে—ইহা কর্তৃক বঙ্গদেশে কুনীতির উৎসেদ ও নির্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়—ইহাই আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয় এবং তদর্থে আমরা দেশহিতৈষিদিগকে একান্ত চিত্তে অনুরোধ করিতেছি।

বিবিধার্থ সংগ্রহ। মাঘ ১৭৮০ শক
'নূতন গ্রন্থের সমালোচনা' : মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকের আলোচনার ভূমিকা

বাংলার ভাষা

রাজনারায়ণ বসু

১৮২৬ - ১৮৯৯

এ দেশে পঞ্চবিংশতি বৎসরাবধি যে ইংরাজী ভাষার অনুশীলন যত্নের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে কি ফল লব্ধ হইল? এমত কি আশাই বা সঞ্চার হইয়াছে যে ভবিষ্যতে এ দেশীয় লোক কেবল ইংলণ্ডীয় ভাষা দ্বারা জ্ঞানোপার্জনে সমর্থ হইবে? ইহা সত্য যে এতাবৎকাল পর্যন্ত ন্যূনাধিক দুই সহস্র ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছে, এবং বিদ্যার প্রভাবে তাঁহারদিগের সংস্কৃত চিত্ত অজ্ঞান ঘনাম্বুদোপরি উত্থিত হইয়া অতি প্রসারিত নির্মল জ্ঞানাকাশে বিচরণ করিতেছে; কিন্তু তাঁহারদিগেরও মধ্যে কয় ব্যক্তি সে ভাষাতে বিনা সংশয়ে রচনা করিতে পারেন? আর সমস্ত দেশস্থ লোকের তুলনায় সেই দুই সহস্র সংখ্যাই বা কত? বর্তমান কোনো পত্র সম্পাদক যথার্থ বলিয়াছেন যে আর পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে রাজধানী ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে না হয় এদেশস্থ পঞ্চ সহস্র ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় ভাষাতে পারদর্শী হইবে, কিন্তু এই পঞ্চ সহস্রই বা কত? এদেশীয় সমস্ত লোকের পঞ্চ সহস্র অংশের এক অংশও নহে।

ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোনো কোনো ব্যক্তির পরম প্রিয় বাসনা এই যে ইংলণ্ডীয় ভাষা এই মহাবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশভাষা হইবে, এবং এইক্ষণকার দেশভাষা সকল ঐ পর ভাষা বলে লুপ্ত হইবে। কিন্তু ইহার পর অলীক কথা আর নাই। যাঁহারা এ কথা কহেন তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে, ভারতবর্ষের তাবৎ ভূমি খনন করিয়া ইংলণ্ড-ভূমি দ্বারা পূর্ণ করিবেন। কোনো দেশের ভাষা যে এককালে উচ্ছিন্ন হয় ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, ইতিহাসেও ইহার উদাহরণ প্রাপ্ত হয় না। ইহা সত্য যে গ্রীক ও রোমান লোকেরা আপনারদিগের অধিকৃত দেশে আত্ম ভাষা প্রচারের যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কার্যে তাঁহারা কি পর্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছিলেন? এই সকল দেশের ভাষা উচ্ছেদ করিতে তাঁহারা কতদূর সমর্থ হইয়াছিলেন? স্বভাবতঃ অধিকারী জাতির অধিকার নাশের সহিত অধিকৃত দেশ হইতে তাহারদিগের ভাষা লুপ্ত হইতে থাকে।

মিশর দেশে রোমানদিগের অধিকার চ্যুত হইলে গ্রীক ভাষার ব্যবহার লুপ্ত হইল, কিন্তু তাহার দেশভাষা যে কপটিক তাহা এইক্ষণকার দুই শত

বর্ষ পূর্বে পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ফ্রান্স ও স্পেন দেশেও তাদৃশ ঘটনা হয়। সীরিয়া দেশে গ্রীকদিগের অধিকারকালে যে সকল নগর গ্রীকনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পুনর্বার দেশভাষার প্রাচীন নামে খ্যাত হইল। বাস্তবিক জয়ী লোকেরা যদি পরাজিত দেশে বহু সংখ্যাতে পুরুষানুক্রমে বসতি করেন, এবং পুরবাসিদিগের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা মিশ্রিত হয়েন, তবে উভয়ের সংস্রবে এক নূতন সংকীর্ণ ভাষা উৎপন্ন হয়। হিন্দুস্থানী ও পারসিক এবং ফ্রেঞ্চ ও স্পানিষ প্রভৃতি ভাষার এইরূপ উদ্ভব হইয়াছে। যদি জয়বান্ জাতি স্বাধিকৃত দেশে বাহুল্যরূপে বসতি না করেন, এবং বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা তাহারদিগের সহিত এক জাতিভূত না হয়েন, তবে সে দেশীয় ভাষার বিশেষ অন্যথা হওয়া সম্ভব নহে। আরবেরা যে ইটালী ও সিসিলি দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল, তাহার কি নিদর্শন এইক্ষণে প্রাপ্ত হয়? জয়ী লোক যদি পরাজিত লোককে তাহারদিগের স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আপনারা তাহাতে বাস করেন, তবে সেখানে তাঁহারা আপনারদিগের ভাষা আপনারাই ব্যবহার করেন, তাহাতে সে দেশীয় লোকের ভাষার কি অন্যথা হইল? অতএব যে পক্ষে বিচার করুন, ভারতবর্ষের দেশভাষা-সকল উচ্ছিন্ন হইয়া তৎপরিবর্তে যে ইংরাজী ভাষা স্থাপিত হইবে, ইহা কেহ যেন মনেও স্থান দেন না— নিঃসংশয়ে এই ভবিষ্যৎ কথা ব্যক্ত করিতেছি যে কাহারও এ মনস্কামনা কদাপি সিদ্ধ হইবে না।

আমারদিগের দেশভাষার অনুষ্ঠানের প্রতি যে সকল ইংলণ্ডীয় লোক পূর্ব পক্ষ করেন, তাঁহারদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্ত পূর্বোক্ত চুক্তি সকল প্রয়োগ করা উচিত, কিন্তু ব্যক্ত করিতে লজ্জা উপস্থিত হইতেছে যে আমার-দিগের স্বদেশস্থ ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কতিপয় যুবা পুরুষ অম্লান বদনে কহিয়া থাকেন যে, 'সেই বাঞ্ছিতকাল কোন্ দিন আগমন করিবে যখন কেবল ইংরাজী ভাষা এই দেশের জাতীয় ভাষা হইবে।' হা! ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যাভ্যাসে ছাত্রদিগের বুদ্ধির প্রাখর্য হইতেছে বটে, কিন্তু কি বিষময় বিপরীত ফলেরও উৎপত্তি হইতেছে। তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই অন্য অন্য বিদ্যা শিক্ষার সহিত স্বদেশের ভাষা, স্বদেশের বিদ্যা ও স্বদেশের লোককে তুচ্ছ করিতে নিয়মিত শিক্ষা করেন। যেরূপ কেহ কেহ আপনার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জানাইবার জন্য অনবরত ইংরাজী কথনাদি দ্বারা এইরূপ ছল করেন যে ইংরাজী সংস্কারে বঙ্গভাষা এককালে বিস্মৃত হইয়াছেন, তদ্রূপ

অনেকে আপনার বিদ্যাভিমানে প্রমত্ত হইয়া স্বদেশের কোনো পদার্থই সমাদরযোগ্য বোধ করেন না—হিন্দু নাম তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। বিদেশীয় পণ্ডিতেরা চিত্তপ্রমোদকারিণী সুমধুর সংস্কৃত ভাষার ললিত গুণে মোহিত রহিয়াছেন, আর আমারদিগের ইংরাজী ভাষার বহু ছাত্র তাহা পাঠ্য বোধ করেন না।—সে যে কি দুর্লভ অমূল্য রত্নাকর, তাহার অনুসন্ধান করাও উচিত বোধ করেন না। দেখ, ইঁহারদিগের কি বিপরীত ব্যবহার। ইঁহারা পরদেশের ইতিহাস যথোচিত অভ্যাস করেন, কিন্তু স্বদেশের পুরাবৃত্ত সন্ধান করা আবশ্যক বোধ করেন না। ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতি কোন্ দেশের কোন্ স্থানে কি নগর? কোন্ বৎসরে তাহা নির্মিত হইয়াছে? তদবধি সেখানে কি কি বিষয়ের ঘটনা হইয়াছে? তাহা তাঁহারদিগের সুসূক্ষ্মরূপে জ্ঞাত হইতেই হইবে; কিন্তু আপনারদিগের এই জন্মভূমির তদ্রূপ বিবরণ জানিবার জন্য কয় ব্যক্তি সচেষ্ট হয়েন? এই কলিকাতা নগরীর বিংশতি ক্রোশ দূরে কোন্ স্থান তাহা অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ জ্ঞাত নহেন। পূর্বকালে ইংরাজদিগের কি প্রকার স্বভাব ছিল? কি প্রকার ক্রমানুসারে এতাদৃশ সদবস্থা হইল? তাঁহারদিগের কোন্ বংশের কোন্ রাজা কোন্ দিবস রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কোন্ দিন কি কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং কয় বৎসর কয় মাস পর্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়াছেন? এতাদৃশ সকল বৃত্তান্তের অতি সূক্ষ্ম অঙ্গ পর্যন্ত তাঁহারা বিশেষ পরিশ্রম পূর্বক শিক্ষা করেন; কিন্তু আপনারদিগের কি মূল? পূর্বে কোন্ সময়ে আমারদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল? কিরূপ ধর্ম ছিল? কি কি বিদ্যা প্রচার ছিল? এতাদৃশ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত কি পর্যন্ত সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনাও আছে? কি আক্ষেপের বিষয়, ইহাও জানিবার জন্য কেহ অনুরাগী নহেন। গ্রীক, রোম, ফ্রান্স, জার্মাণ প্রভৃতি ইউরোপস্থ সমস্ত দেশের প্রাচীন বা আধুনিক ইতিহাস সামান্যত কণ্ঠাগতই আছে, তথাপি কোন্ দিন কোন্ গ্রন্থকর্তা তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কি নূতন ব্যাপার প্রকাশ করিলেন, ইহা জানিবার জন্য তাঁহারা কত উৎসাহী! নেবোরের রোমান্ ইতিহাস ও থরল্ ওয়ালের গ্রীক ইতিহাস পাঠের নিমিত্তে কত ব্যগ্র। কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত জানিবার জন্য কে অভিলাষ করে? এসিয়াটিক রিসার্চ ও এসিয়াটিক সমাজের জর্নেল গ্রন্থ কে পাঠ করে? তদ্বিষয়ে এইক্ষণে এসিয়া ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে যে কত চেষ্টা হইতেছে, তাহার সন্ধান কে রাখে?

যাঁহারদিগের এইরূপ অস্বাভাবিক ও বিপরীত রীতি হইল, আত্মভাষার উচ্ছেদ মানস করা তাঁহারদিগের পক্ষে আশ্চর্য নহে। আপাততঃ তাঁহারদিগের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় ভেদ হইয়াছে বটে, যাঁহারা মৌখিক বলেন যে দেশভাষার অনুশীলন করা অতি আবশ্যক কর্ম। কিন্তু ইহা কি তাঁহারদিগের আন্তরিক বাসনা? ইহা কি তাঁহারদিগের এমত স্নেহের বিষয় যে তাহা সিদ্ধ না হইলে মনেতে অসহ্য বেদনা বোধ হইবে? ইহা যদি হইবে তবে তাঁহারা ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কোনো মিত্রকে প্রাপ্ত হইলে কেবল ইংরাজী কথোপকথনেই মনের দ্বার কেন উদ্‌ঘাটন করেন? বাঙ্গালীর সভাতে ইংরাজী ও ইংরাজী বক্তৃতা কেন করিয়া থাকেন? যাহা হউক এ সকল ব্যবহার জন্মভূমির প্রতি প্রেমের চিহ্ন নহে, জন্মভূমির নাম উচ্চারণ করিলে কি অনির্বচনীয় স্নেহ পাত্র সকল মনেতে উদয় হয়— প্রেমামৃত রসসাগরে চিত্ত প্লাবিত হয়। যে স্থানে আমরা শৈশব কালে স্নেহমিশ্রিত যত্ন দ্বারা লালিত হইয়াছি, যে স্থানে বাল্যক্রীড়া দ্বারা আহ্লাদের সহিত বাল্যকাল যাপন করিয়াছি, যে স্থানে যৌবনের প্রারম্ভাবধি সহযোগী মিত্রদের প্রীতি দ্বারা সতত আনন্দপ্রাপ্ত হইয়াছি, যে স্থানে আমারদিগের বয়োবৃদ্ধি সহিত সুহৃদ্মণ্ডলীর সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং যে স্থানের প্রসাদে ধন মান বিদ্যা বুদ্ধি যশ সম্পদ যাহা কিছু সকলই আমারদিগের লব্ধ হইয়াছে, সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাবসিদ্ধ নহে? স্বদেশ এ প্রকার প্রিয় পদার্থ যে তাহার নদী পর্বত মৃত্তিকা পর্যন্ত আমারদিগের প্রণয় আকর্ষণ ও আহ্লাদ সঞ্চার করে। জন্মভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তুর নাম উচ্চারণ করা হয় যাহার অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ পৃথিবীতে আর নাই —যে নাম চিন্তামাত্র পিতা মাতা ভ্রাতা ভার্যা পুত্র কন্যা সুহৃদ বান্ধবের প্রেমার্দ্র আনন সকল মনেতে জাগ্রত হইয়া উঠে। যিনি প্রবাসী হইয়া দূর হইতে আপনার দেশ স্মরণ করিয়াছেন, তিনিই স্বদেশের মর্ম জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই জানেন যে জন্মভূমি মনুষ্যের দৃষ্টিতে কি রমণীয় বেশ ধারণ করে! 'কাশ্মীরের নির্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান, কিম্বা শিরাজের সুচারু গুলাব পুষ্পের উপবন' কিছুতেই তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট রাখিতে সমর্থ হয় না। তিনি বালুময় মরুভূমিবাসী হইলেও সেই স্বদেশ সন্দর্শন পিপাসায় ব্যাকুল থাকেন। এমত সুখের আকর যে জন্মভূমি তাহার প্রতি যাহার প্রীতি না থাকে, সে কি মনুষ্য? পূর্বে আমারদিগের স্বজাতীয়

লোকের এরূপ ব্যবহার কখনোই ছিল না। অদ্যাপি কাহার মুখে এই রমণীয় শ্লোকার্ধ শ্রুত না হয় যে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'? বীর্যবান্ গ্রীক জাতি ও জয়পিপাসু রোমান জাতির চরিত্র পাঠে আহ্লাদ সঞ্চার হয়, কিন্তু অমরকীর্তি পাণ্ডুপুত্র ও যুদ্ধদুর্মদ রাজপুত্রদিগের নামোচ্চারণ মাত্র চিত্ত হর্ষোন্মত্ত হইয়া কি উৎসাহে উল্লম্ফন করিতে থাকে। সেক্‌সপিয়ার স্তুতিযোগ্য এবং নিউটন অতিবরণীয় বটে, কিন্তু আমারদিগের কালিদাস ও আমারদিগের আর্যভট্টের স্মরণে অন্তঃকরণ কি অপার প্রেমার্ণবে সন্তরণ করে। হোমর ও বর্জিল অতি প্রসিদ্ধ মহাকবি, কিন্তু বিশাল মহাভারত ও হৃদয়রঞ্জন রামায়ণ এ সকল আমাদের! প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন, এবং আধুনিক আরবী ও পারসীক বা ইংরাজী ও জর্মাণ, অবনীর সকল ভাষা এক দিকে, আর অন্য দিকে সুচারু সুমধুর শব্দরত্নাকর মহাভাষা সংস্কৃতকে পরিমাণ করিলে আমারদিগের সংস্কৃতই সকল অপেক্ষা গুরুতর হইবে। হিন্দু নাম অতি মনোরম শব্দ! হিন্দু হইয়া হিন্দু নাম লোপ করিবার বাসনা, ইহার পর যাতনার বিষয় আর কি আছে? জন্মভূমির হীন অবস্থা মোচনে যত্ন না করিয়া তাহার প্রতি অনাদর করা— জননীর জীর্ণ শরীর সুস্থ না করিয়া তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা করা, ইহার অপেক্ষা হৃদয় বিদীর্ণকারী ব্যাপার আর কি আছে?

যদিও এই লিপিপ্রকরণের পৃথক উদ্দেশ্য; তথাপি ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ অনেক যুবকের প্রবোধার্থে অনুষঙ্গাধীন স্বদেশের প্রীতি-প্রসঙ্গ স্বভাবত উদয় হইল। এখন বিবেচনা কর, যে স্থানের নদী-পর্বত-মৃত্তিকা পর্যন্ত আমার-দিগের প্রীতিপাত্র সে স্থানের ভাষা, যে ভাষাতে আমরা মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া শৈশবকালের অর্ধস্ফুট মধুর বাক্য ভাষণে মাতা পিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম, সে ভাষা প্রতি প্রীতি না হওয়া মনুষ্য স্বভাবের যোগ্য নহে। জননীর স্তনদুগ্ধ যদ্রূপ অন্য সকল দুগ্ধ অপেক্ষা বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ জন্মভূমির ভাষা অন্য সকল ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্য প্রকাশ করে। এই প্রকরণ লেখকের কোনো মান্য মিত্র অনেক উদাহরণ সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে পর-ভাষার আলোচনায় মনের শক্তি স্ফূর্তি হয় না, এবং আত্ম-ভাষার অনুশীলন বিনা কোনো দেশে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তার উদয় হয় নাই। দেখ ভারতবর্ষের সমীপবর্তী পারসিক দেশে যে পর্যন্ত কেবল আরবী ভাষার আলোচনা বিশিষ্ট রূপে প্রচার ছিল, সে পর্যন্ত সে দেশে কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তার উদয় হয় নাই। তৎপরে মহাকবি ফেরদোষী আত্মভাষাতে

শাহনামা গ্রন্থ রচনা করিলে কত কাব্যামৃত রসপূর্ণ গ্রন্থ সকল প্রকাশ হইতে লাগিল! তখন সাদি আপনার সুকোমল মধুরস্ফীত উপদেশ পুস্তকের সহিত উদয় হইলেন। তখন হাফেজ চিত্তপ্রমোদকারী অতি রমণীয় সঙ্গীত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। রোমানেরা অনেক দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, ও সে সকল দেশে আপনারদিগের ভাষা ও বিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশ ইটালী ব্যতীত তাঁহারদিগের অধীন অন্য অন্য দেশে প্রায় কোনো ব্যক্তি সুযশস্বী গ্রন্থকর্তারূপে বিদিত হয়েন নাই। সুবিখ্যাত বর্জিল ও হোরেস, এবং লিবি ও সিসিরো ইহারা সকলেই ইটালী ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জর্মণি দেশেতে কীর্তিমান ফ্রেডারিক রাজার রাজত্বকাল পর্যন্ত ফ্রেঞ্চ ভাষার বহু সমাদর ছিল, তত্রস্থ বিদ্বান লোকেরা সেই ভাষারই অনুষ্ঠান করিতেন, এবং তাহাতেই রাজকার্য সম্পন্ন হইত, তথাপি তৎকাল পর্যন্ত সে দেশে কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই। পরে যখন গোএথি নামক মহাকবি স্বকৃত ললিত কবিতাদ্বারা আপনার দেশভাষা উজ্জ্বল করিলেন, তদবধি সে দেশীয় অন্য মহা মহা গ্রন্থকর্তা আপনারদিগের অসাধারণ মানসিক বীর্যোদ্ভব রচনাসকল প্রকাশ করিয়া মানবজাতিকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড দেশে যতদিন নর্মাণ ফ্রেঞ্চ নামক ভাষার আলোচনা ছিল, ততদিন সে দেশে কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই, পরে যখন বিখ্যাত কবি চাসর স্বদেশীয় ভাষাতে আপনার কবিতাসকল প্রকাশ করিলেন, তদবধি কত মহত্তম মধুরতম গ্রন্থসকলের উদয় হইতে লাগিল। সামান্যত দেখ ইওরোপখণ্ডে যে পর্যন্ত লাটিন ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত ছিল, সে পর্যন্ত সেখানে বিদ্যার স্ফূর্তি হয় নাই, ও উত্তম উত্তম গ্রন্থসকলও প্রকাশ হয় নাই; তৎখণ্ডের লোক সেই কালের অনূকাল সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরে ইটালী স্পেন পোর্টুগেল ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা যখন স্বস্ব দেশভাষার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তদবধি ইওরোপখণ্ড গ্রন্থকারদিগের যশেতে আমোদিত ও জ্ঞান-জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইতে লাগিল। ইহা কি সুখের চিন্তা যে, যদি এই মহাত্মাদিগের ন্যায় আমরা আত্মভাষাতে সুশোভিত করিতে পারি এবং তাহাতে যদি স্বরচিত গ্রন্থসকল প্রকাশ হয়, তবে আমারদিগের অতি অনুপম আত্মসন্তোষ লব্ধ হইবে, ভবিষ্যৎ পুরাবৃত্তবেত্তারা আত্মভাষাপ্রেমিক পূর্বোক্ত জাতিদিগের মধ্যে আমাদিগকেও গণ্য করিবেন, এবং পরজাতীয়

লোকেরা আমারদিগের সুচারু রচিত প্রস্তাব সকল পাঠের নিমিত্তে আমারদিগের ভাষা অধ্যয়ন করিবেন। আমারদিগের দেশভাষা যে এমত সুললিত হইবে ইহা সম্যক সম্ভব, কারণ তাহার বর্তমান আকর যে রত্নাকর সংস্কৃত, তাহার ন্যায় সুশোভন সর্বার্থ প্রতিপাদক মহাভাষা এই ভূমণ্ডলে কদাপি আর বিরাজমান হয় নাই।—

More perfect than the Greek, more copious than the Latin and more exquisitely refined than either.

—Sir W. Jones' Worsk

অতএব হে স্বদেশস্থ বিজ্ঞ যুবকগণ! আমারদিগের দেশভাষা অনুষ্ঠানের বিপক্ষে পরদেশীয় কোনো লোক যাহা বলুক, কিন্তু তাহারদিগের হাস্যাস্পদ হওয়া উচিত নহে! পরন্তু অনেক ইংরেজেরও এই একান্ত মত যে সামান্য প্রকার বিদ্যাভ্যাস করা যাহারদিগের প্রয়োজন, তাহারদিগের আপন ভাষা শিক্ষাই কর্তব্য। কিন্তু আমরা কি ইহাতেই তৃপ্ত থাকিব? আমারদিগের উচিত যে সর্বস্থানের সমস্ত বিদ্যা আপন ভাষাতে সংগ্রহ করি, বেকন ও লাক, টিউটন ও লাপ্‌লাস, কুবিয়র ও হম্বোল্‌ট প্রভৃতি সর্ববিধ শাস্ত্র প্রকাশকদিগের গ্রন্থ আত্মভাষাতে ভাষিত করি, যাহাতে অতি উৎকৃষ্ট গুরুতম বিদ্যাসকলও স্বদেশীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা করা যায়। যদিও সর্ববিবেচনাতে দেশভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজীর অনুশীলন রহিত করা কদাপি মত নহে। যাহারদিগের সময় আছে ও উপায় আছে, তাহারদিগের ইংরাজী ভাষা উপার্জন করা অতি প্রয়োজনীয় ও মহোপকারী হইয়াছে। বরঞ্চ বর্তমান কালে ইউরোপ খণ্ড যে সমস্ত বিবিধ বিদ্যার আধার হইয়াছে, সেই ইউরোপীয় ভাষাসকল শিক্ষা ব্যতীত তাহা কদাপি সম্যকরূপে উপার্জিত হইবার নহে; আমারদিগের মূল ভাষা সংস্কৃত এ দেশীয় সকল শাস্ত্র ও সকল বিদ্যার আধার ও বর্তমান দেশভাষা সকলেরও আধারস্বরূপ হইয়াছে; এবং আরবী ও পারসীক ভাষা কাব্যামৃতের সমুদ্র, অতএব দেশভাষার পাঠশালা ব্যতীত স্থানবিশেষে এমত মহাবিদ্যাগার প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন যেখানে বিদ্যার্থীরা ইংরাজী ফ্রেঞ্চ ও জার্মাণ এবং সংস্কৃত, আরবী ও পারসীক ভাষা সুন্দররূপে অভ্যাস করিতে পারে। এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার যত বিলম্ব থাকুক, কিন্তু উৎকৃষ্ট নিয়মে দেশভাষার পাঠশালা সকল স্থাপন করা আরও

প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কিন্তু কি প্রকারে এই বৃহৎ কার্য সাধন হইতে পারে? ইহা বলা বাহুল্য যে গবর্ণমেণ্টের ইহাতে উৎসাহের সহিত সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত কর্তব্য, কারণ প্রজাদিগকে বিদ্যাদান রাজকার্যের অঙ্গ হইয়াছে। সাধারণ প্রজারা বিদ্যার আচ্ছাদন প্রাপ্ত না হইলে অন্যকে বিদ্যা বিতরণে কিরূপে তাহারদিগের প্রবৃত্তি হইবে— জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে পিতার মন বিশুদ্ধ না হইলে পুত্রের বুদ্ধি-সংস্কারে তাহার কেন যত্ন হইবে? বিশেষতঃ রাজার এক আজ্ঞাতে যা হইবে, সহস্র সহস্র প্রজার যুগপৎ চেষ্টাতেও তাহা সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। রাজা যদি এই নিয়ম বলবৎ রাখেন যে সমস্ত রাজকার্য দেশভাষাতে সম্পন্ন হইবে, আপনা হইতেই কত লোক আত্মভাষা শিক্ষাতে সযত্ন হয়েন। যদি বল গবর্ণমেণ্ট এ উপায় অগ্রেই করিয়াছেন— অগ্রেই তাঁহারা শাখা নগরস্থ বিচারালয়ের কার্যে দেশভাষা ব্যবহারে অনুমতি দিয়াছেন, এবং বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে এক শত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহা নিরর্থক হইয়াছে। এই উভয় বিষয়েই তাহারদিগের যদ্রূপ অবহেলা তাহাকে সকলে অনায়াসে মনে করিতে পারেন যে, তাঁহারা কেবল এ বিষয়ে আপনারদিগের অনুৎসাহ গোপন করিবার নিমিত্তে এই উভয় নিয়ম প্রচার করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় বিচারালয়ে সকলে বঙ্গভাষা ব্যবহারের নিয়ম প্রচার করিয়া তাহা সফল করিবার জন্য কি উপযুক্ত উপায় চেষ্টা করিয়াছেন? তাঁহারা কি তৎপরে অনুসন্ধান করিয়াছেন যে সেই নিয়ম বলবৎ হইতেছে কি না? এই ক্ষণে যে ভাষাতে সেসকল বিচারালয়ের কার্য নির্বাহ হয় সে ভাষা বাঙ্গালা নহে, ইংরাজী নহে, হিন্দি নহে, পারসীক নহে— কিন্তু তাহা এই সমুদয় ভাষার সন্নিপাতস্বরূপ হইয়াছে। বিচারালয়ের কোনো লিপি এ পর্যন্ত শুদ্ধ দেখি নাই, যাহারা কোনো কালে ভাষা রচনা শিক্ষা করে নাই, তাহারাই বিচারালয়ের লিপি-কর্মচারী! জ্ঞানাপন্ন রাজাদিগের রাজকার্যের যে এইরূপ বিকৃতি হয় ইহা অতি দুঃখের বিষয়। নিয়ম আছে অথচ তদনুযায়ী কর্মানুষ্ঠান হয় না, ইহা কদাপি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যোগ্য নহে। পূর্বোক্ত এক শত বিদ্যালয়ের কথা কি কহিব? তাহার দুরবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট বোধ হয় যে সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের লেশমাত্রেও যত্ন নাই, তাহার প্রয়োজন সিদ্ধি করা তাঁহারদিগের অভিপ্রায় নহে। এই সকল পাঠশালা অপেক্ষা ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহারদিগের যেরূপ উৎসাহ, তাহা চিন্তা করিলেই তাঁহারদিগের আন্তরিক অভিপ্রায় সুন্দর প্রকাশ

পায়। তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিমিত্ত প্রচুর ধন ব্যয় করেন, তাহার তত্ত্বাবধারণ বিষয়ে বহু মনোযোগ করেন, উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য পৃথক্ বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু পূর্বোক্ত ঐ এক শত বাংলা পাঠশালার প্রতি তাঁহারদিগের যত্নের কি চিহ্ন প্রকাশ হইয়াছে? গ্রন্থ নাই শিক্ষা নাই এবং তাহার তত্ত্বাবধারণেরও নিয়ম নাই, অথচ তাহার কার্য সফল হইবেক, ইহা অপেক্ষা অলীক কথা আর কি হইতে পারে? একজন সাহেব যথার্থ কহিয়াছেন যে ইংরাজী পাঠশালা যখন গবর্ণমেন্টের আপন সন্তান, আর বাংলা পাঠশালা সকল সপত্নী সন্তান। আত্ম-সন্তানের ন্যায় সপত্নী সন্তানকে কে স্নেহ করিয়া থাকে? অতএব এ দেশে দেশভাষা প্রচারের জন্য গবর্ণমেন্টের যে চেষ্টা সে কেবল নামমাত্র। ইংরাজ রাজা যদি এদেশীয় প্রজাদিগের কিঞ্চিৎ উপকার করিতে স্বীকৃত হয়েন— আমারদিগের সর্বস্বের পরিবর্তে যদি কিঞ্চিৎ বিদ্যাদান করা উচিত বোধ করেন, তবে ভারতবর্ষের সর্বস্থানে পাঠশালা সকল স্থাপন করিয়া উৎকৃষ্ট উপায়ে শিক্ষা দান করুন। অনুরাগ উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত ইহাতে সচেষ্ট হউন। অনুরাগশূন্য হইয়া ইহাতে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা এককালে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। গুরু কার্যের গুরু উপায় আবশ্যক; উপযুক্ত উপায় অনুষ্ঠিত হইলে অবশ্য সে কার্য সিদ্ধ হইবেক। ইউরোপীয় ভাষা হইতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সকল অনুবাদ করা এবং দেশভাষার উপযুক্ত শিক্ষকসকল প্রস্তুত করা এ বিষয়ের মূল সাধন হইয়াছে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রজ্বলিত উৎসাহের সহিত এই উভয় অঙ্গ সুসম্পন্ন করুন এবং সম্যক যত্নপূর্বক সমূহ পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া তাহার কর্ম সুসম্পাদন জন্য সুনিপুণ অধ্যক্ষ সকল নিযুক্ত করুন, তখন তাঁহারা দিন দিন কৃতকার্য হইবেন, দিন দিন প্রজাদিগের উন্নতি দৃষ্ট হইবেক; এবং দেশ-ভাষা অনুষ্ঠানের প্রতি যত বাক্য বিরোধ আছে তখন তাহা কার্য দ্বারা খণ্ডিত হইয়া চতুর্দিকে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ হইবেক।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। শ্রাবণ ১৭৭০ শক

ইংরাজী-প্রভাব

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

১৮২৭ - ১৮৯৪

হিন্দু সমাজের প্রকৃতি শান্তি-প্রবণতা, ইংরাজ সমাজের প্রকৃতি ভোগ-সুখানুসন্ধানে কার্যতৎপরতা। হিন্দু সমাজ প্রধানতঃ কৃষ্যুপজীবী, ইংরাজ প্রধানতঃ শিল্প এবং বাণিজ্যোপজীবী; হিন্দু সমাজ মিলিত স্বত্ব এবং মিলিত স্বত্বাধিকার স্বীকার করে, ইংরাজ জ্যেষ্ঠাধিকার মানে এবং পৃথক্ স্বত্বের একান্ত পক্ষপাতী। হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, ইংরাজ সমাজে বয়োধিক বিবাহই নিয়মিত। হিন্দু সামাজিক অন্তঃশাসনের পক্ষপাতী, ইংরাজ অধিকার পালনে রাজশাসনকেই সর্বক্ষম করিতে উন্মুখ। —ভারতবর্ষে এই দুইটি পরস্পর ভিন্নধর্মী সমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজ কার্য-তৎপর, কার্যকুশল, অহঙ্কারী এবং লোভী; হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ, নম্রস্বভাব এবং সন্তুষ্টচেতা। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ইংরাজের স্থানে হিন্দুকে কার্যকুশলতা শিখিতে হয়, আর কিছুই শিখিতে হয় না, প্রত্যুত আর কিছু 'না শিখলেই ভাল হয়'!

কিন্তু তাহা হয় না। শিক্ষাকার্যের সর্বপ্রধান অবলম্বন অনুকরণ। অনুকরণ করিতে গেলে, দোষ এবং গুণ দুইই অনুকৃত হইয়া যায়। তবে দোষের অনুকরণই সহজ। এই জন্য হিন্দু ইংরাজের স্থানে সাহঙ্কার ব্যবহার শিখিতেছে, এবং আপনার জাতি-সুলভ নম্রতা পরিত্যাগ করিতেছে। হিন্দুর সন্তুষ্টচিত্ততাও তিরোহিত হইয়া ইংরাজ-সাহচর্যে লোভ-পারবশ্য জন্মিতেছে। হিন্দুর হৃদয়ে পরার্থ-জীবনতা যতদূর উঠিয়াছিল, পৃথিবীর অপর কোন জাতির হৃদয়ে উহা ততদূর উঠে নাই, ইংরাজের হৃদয়ে স্বার্থপরতা যেমন বলবান পৃথিবীতে আর কোন জাতির হৃদয়ে তত প্রবল নয়; আবার বলি, এরূপ দুইটি সমাজের পরস্পর সংশ্রবে হিন্দুর স্বভাবে পরিবর্তন না ঘটিয়া যদি ইংরাজের স্বভাবেই পরিবর্তন ঘটিত তাহা হইলেই ভাল হইত।

কিন্তু তাহার কোন চিহ্নই এ পর্যন্ত লক্ষিত হইতেছে না। ক্রমে ক্রমে পরার্থচিন্তা তিরোহিত হইয়া ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দুর হৃদয় স্বার্থচিন্তায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। আমি ইংরাজী কলেজে শিক্ষিত কোন যুবাকে বলিতে শুনিয়াছি, "মহাশয়! অমুক কার্যটিতে আমার স্বার্থ আছে, তবে আমি 'ঐ' কার্যটি করিব না কেন?"..."করিবে না এই জন্যই যে, ঐ

কাজটি করায় পরার্থ নষ্ট হয়।”…“পরার্থ রক্ষা করিয়া চলায় আমার ইষ্ট কি?”…“ঐ পরার্থ রক্ষাই তোমার ইষ্ট।”…“পরার্থ রক্ষায় পরের ইষ্ট, তাহাতে আমার ইষ্টসিদ্ধি নাই।” বিচার ফুরাইল। বুঝিলাম, এতকাল ধরিয়া পবিত্র শাস্ত্র শিক্ষার মহিমায় হিন্দুর হৃদয়ে যে পরার্থ জীবনের ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সে ভাব ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এক পুরুষেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর-এক দিন একটি নব্য উকীলের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে, তাঁহারা যে একজন অযোগ্য ব্যক্তিকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে একটু তর্ক উপস্থিত হইল। উকীলবাবু স্বীকার করিলেন যে পাত্রটি অভিনন্দনের যোগ্য নহে। অনন্তর, বলিলেন, “আমরা ত সত্যসত্যই তাঁহার প্রতি ভক্তি-প্রণোদিত হইয়া অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিতেছি না। উঁহাকে তুষ্ট করিলে আমাদের একটি স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে— তাই এ কার্য করিতেছি।” এ স্থলেও বিচার ফুরাইল।

বর্ষ কতিপয় গত হইল, কোন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একটা সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সভাতে ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ দুই প্রকারের লোকই উপস্থিত ছিলেন। একজন সভাসদ প্রস্তাব করিলেন—“সভার কার্য-বিবরণ বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিত হউক।” অমনি একজন ‘কৃতবিদ্য’ গাত্রোত্থান করিয়া ঘৃণাসূচক হাস্য সহকারে ঐ কথার প্রতিবাদ পূর্বক ইংরাজীতে বলিলেন—“বাঙ্গালা ব্যবহার প্রবৃত্ত করিলে, দেশটি দুই সহস্র বর্ষ পাছু হইয়া যাইবে।” ভাবিলাম, এখনকার দুই সহস্র বর্ষ পূর্বে ত সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সন্নিহিত সময়— সে সময়ে পঁহুছিলে দেশটি পাছু যায়, না, আগু হয়? কৃতবিদ্য মহাশয়ের অগ্রপশ্চাৎ বোধটি বড় সুপরিস্ফুট হয় নাই।

কোন জিলায় একটি ‘কৃতবিদ্য’ মুনসিফ হইয়া আসিয়া তথাকার জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সাহেব এবং ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, সকলেরই বাটী বাটী গিয়া তাঁহাদিগের সম্মান রক্ষা ও বন্দনা করিয়াছিলেন। কেবল ঐ নগরে যে একটি মহারাজা থাকিতেন, তাঁহার নিকট গমন করেন নাই, প্রত্যুত দেশীয় কোন বড় লোকেরই নিকট গমন করেন নাই। নিজেই অপ্রাসঙ্গিকরূপে ঐ কথার উত্থাপন করিলে, ওরূপ করিলে কেন জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—“রাজা বেটা কী করতে পারে? আর দেশীয় লোকে

কেই বা কি করিতে পারে?”—‘কৃতবিদ্য’টির সাম্যজ্ঞান এবং সৌজন্যবোধের মূলেই যে কুঠারাঘাত হইয়া গিয়াছে তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম।

ইংরাজী শিক্ষিত অনেকানেক যুবার মন যে স্বার্থপ্রবণ, বুদ্ধি অগ্রপশ্চাৎ-বোধশূন্য, চিত্তবৃত্তি সাম্য এবং সৌজন্যবোধ -বিরহিত এবং ব্যবহার অবিনীত হয়, তাহার কারণ কি, ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক। ইংরাজী শিক্ষিতেরা মুখে যাহাই বলুন, আর মনে মনে আপনাদের মন বুঝিতে না পারিয়া যাহা ভাবুন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা অপরিসীম ইংরাজভক্ত। তাঁহাদিগের ভক্তিটি মুখের ভক্তি নহে— অন্তরের অন্তস্তলভাগের ভক্তি। এরূ হওয়া বিচিত্র নয়। রোমজাতীয় বাগ্মীপ্রধান সিসিরো কোন সময়ে সিলিসিয়া নামক একটি প্রদেশের শাসনকার্য নির্বাহিত করিয়া রোমনগরে ফিরিয়া গেলে, তাঁহার কোন বিপক্ষ ব্যক্তি সেনেট সভায় বলিয়াছিলেন যে, সিসিরো একটি প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব পাইয়া কোন কাজই করিতে পারেন নাই, একটি যুদ্ধও জয় করেন নাই, একটি শত্রুও বিনাশ করেন নাই। সিসিরো তাহার প্রত্যুত্তরে বলেন—“আমি সিলিসিয়া প্রদেশে রোমীয় অধিকার বদ্ধমূল করিয়াছি। আমি যাহা করিয়াছি, তাহাতে ঐ প্রদেশবাসীরা চিরকালের জন্য রোমের দাসানুদাস হইয়া থাকিবে। আমি রোমীয় ভাষা (লাটিন) শিক্ষার নিমিত্ত এক শত চল্লিশটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছি। ঐ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা একেবারে রোমীয় মন্ত্রে দীক্ষিতের ন্যায় হইবে, কখনও রোমীয় ভিন্ন অপর কাহাকেও আপনাদের আদর্শস্থলীয় মনে করিতে পারিবে না।” সেনেট সভা সিসিরোর বাক্যগুলির সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছিলেন। অতএব কেবলমাত্র ইংরাজীতে শিক্ষিত হইলে যে ইংরাজই হিন্দুজাতীয় যুবকদিগের আদর্শস্থলীয় হইয়া উঠিবে, ইহা সাধারণ-মনুষ্যস্বভাবসিদ্ধ। কয়েক বর্ষ গত হইল ইংরাজীতে অতি ব্যুৎপন্ন কোন বন্ধুবরের বিরচিত ‘হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা’ নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে তখনও লেখকের ইংরাজী কলেজের সকল বিষ নামে নাই। ইংরাজী কলেজের বিষ এই যে, উহা ইংরাজকে আমাদিগের আদর্শস্থলাভিষিক্ত করে। গ্রন্থকার হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা কিরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন? এই মাত্র দেখাইয়াছেন যে, উহা ইংরাজদিগের ধর্মের সহিত মিলে। গ্রন্থকর্তার মনের মানদণ্ড ইংরাজ। অতএব ইংরাজী শিক্ষার ফলে যে ইংরাজ আমাদিগের আদর্শ পুরুষ হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী বলিলেও বলা

যায়। ইংরাজী শিক্ষার বিষ হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাইবার উপায় কিছুই নাই বলিয়াই বোধ হয়। তবে বাল্যকাল হইতে যদি ইংরাজীর সহিত সংস্কৃতেরও শিক্ষা হয় তাহা হইলে কতকটা বিষ কম লাগিতেও পারে। আমি দেখিয়াছি আজকাল কোন কোন সুবোধ ব্যক্তি আপনাদিগের পুত্র-কন্যার শিক্ষায় ঐ পথ অবলম্বন করিতেছেন— উহাদিগকে ইংরাজী পড়াইবার পূর্ব হইতে কিছু কিছু সংস্কৃত পড়াইয়া লয়েন, এবং সংস্কৃতের চর্চা ইংরাজী শিক্ষার সহিত বরাবর প্রচলৎ রাখেন।

'সামাজিক প্রবন্ধ'। ১৮৯২

বঙ্গের ভূগোল

রামগতি ন্যায়রত্ন

১৮৩১ - ১৮৯৪

ভারতবর্ষের পূর্ব-দক্ষিণ ভাগের নাম বাঙ্গালা দেশ। এই দেশের ১. উত্তরে নেপাল, সিকম ও ভূটান, ২. পূর্বে আসাম ও মণিপুর পাহাড়, ৩. দক্ষিণে বঙ্গসাগর ও উড়িষ্যা, ৪. পশ্চিমে জঙ্গলপ্রদেশ ও বিহারদেশ। ইহার সর্বস্থানে লোকদিগের কথাবার্তা ও লেখাপড়া বাঙ্গলাভাষায় প্রচলিত। ন্যূনাধিক তিন কোটি লোক এই দেশে বাস করে।

বাঙ্গালা দেশের প্রাচীনকালের ইতিবৃত্ত অতিশয় অস্পষ্ট। কোন্ সময়ে যে হিন্দুধর্মের চর্চা এদেশে আরম্ভ হয়, তাহা স্থির বলা যায় না। বোধ হয়, হিন্দুরা এদেশের আদিমনিবাসী নহেন; পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল পার্বতীয় জাতি আছে, তাহাদিগের পূর্বপুরুষেরাই এদেশের আদিমনিবাসী ছিল। অনেকে অনুমান করেন, হিন্দু জাতি ইরান্ দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশীয় অসভ্য লোকদিগকে পরাজিত ও দূরীকৃত করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন।

বাঙ্গালা ভাষা যে সময়ে হইয়াছে, তাহারও নির্ণয় করিতে পারা যায় না। এই ভাষাতে এমন কতকগুলি কথা আছে যে তাহারা না সংস্কৃত, না আরবী, না পারসী। অতএব অনুমান হয়, এ স্থানে অন্য এক ভাষা ছিল, এদেশের আদিমনিবাসীরা ঐ ভাষা ব্যবহার করিত, কালক্রমে তাহার লোপ হইয়াছে এবং ঐ লুপ্ত ভাষার কতকগুলি কথা বাঙ্গালা ভাষাতে মিলিত হইয়া গিয়াছে।

গৌড় নগর বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল। এই নগর আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে নির্মিত হয়। ইহার নামানুসারে কখনো কখনো সমুদায় বাঙ্গালা দেশকেও গৌড়দেশ বলিয়া থাকে। গৌড় বাঙ্গালার উত্তরাংশে অবস্থিত।

সুবর্ণগ্রাম, বাঙ্গালার পূর্ব প্রদেশের রাজধানী ছিল। এই নগর ঢাকার চারি ক্রোশ পূর্বে। অতি প্রাচীনকাল অবধি এই প্রদেশ অত্যুত্তম কার্পাস-বস্ত্র প্রস্তুত হইবার স্থান বলিয়া বিখ্যাত আছে। আঠার শ বৎসর পূর্বে এই প্রদেশীয় বস্ত্রসকল ইউরোপের রোম নগরে নীত হইয়া বহুমূল্যে বিক্রীত হইত। রোমকেরা ঐ সকল বস্ত্রকে 'কার্পাস' বলিত। এই বাণিজ্যের

নিমিত্ত জাহাজ সকল সমুদ্র হইতে পদ্মা নদীর মুখ দিয়া স্বর্ণগ্রামে উপস্থিত হইত এবং তথা হইতে পুনর্বার ঐ স্থান দিয়া নির্গত হইয়া যাইত।

বাঙ্গালার পশ্চিম প্রদেশেও সপ্তগ্রাম নামক একটি প্রধান নগর ছিল। এই নগর হুগলীর কিঞ্চিৎ উত্তর, এক্ষণে সাতগাঁ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা বাঙ্গালার একটি প্রধান বন্দর ছিল। অতি পূর্বকাল অবধি ইউরোপীয়েরা জাহাজ লইয়া এই স্থানে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। গৌড়, স্বর্ণগ্রাম ও সপ্তগ্রাম এই তিন প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরই এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে।

পনর শ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালাদেশ মগধসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং পাটলিপুত্র ঐ রাজ্যের রাজধানী ছিল। এক্ষণে মগধদেশের নাম দক্ষিণবিহার ও পাটলিপুত্রের নাম পাটনা হইয়াছে। মগধরাজ্যের উচ্ছেদের পর, পালবংশ-জাত কতিপয় ভূপাল এই প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালার সকল দেশ আপনাদিগের অধিকারে রাখিয়াছিলেন কি না, তাহার কোনো স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঐ বংশীয় কোনও রাজা দিনাজপুর প্রদেশে মহীপালদীঘি নামক এক বিস্তীর্ণ সরোবর খনন করাইয়া আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন; ঐ সরোবর অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। পাল-বংশীয়েরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন।

বোধহয়, পালবংশের পরই বৈদ্যবংশীয় রাজারা এদেশে আধিপত্য করেন। ইহারা হিন্দুজাতির শেষ রাজা। এই রাজাদিগের ইতিহাস নানাবিধ কাল্পনিক উপাখ্যানের সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। হিন্দুদিগের মতানুসারে আদিশূর বৈদ্যবংশের প্রথম রাজা। প্রায় আট শত বৎসর গত হইল তিনি রাজ্য করিয়া গিয়াছেন। সকলে কহিয়া থাকে যে, এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রোক্ত কর্মকাণ্ডসকল ভালরূপে জানিতেন না, এজন্য আদিশূর কোনো যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত কুজ-রাজ বীরসিংহের নিকট শ্রুতি-স্মৃতি-বিশারদ পাঁচ জন ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঐ পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আপন আপন ভৃত্য সমভিব্যাহারে এদেশে আসিয়া আদিশূর রাজার যজ্ঞকর্মে ব্রতী হয়েন। যজ্ঞসমাপনান্তে স্বদেশে প্রতিগমন করিলে, তাঁহাদের জ্ঞাতিকুটুম্বসকল শূদ্রের কর্ম করিয়া পতিত হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাদিগের সহিত আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করেন। সুতরাং তাঁহারা পুনর্বার ফিরিয়া আসিয়া রাজার অনুমতিক্রমে এই দেশেই বাস করিতে লাগিলেন।

বৈদ্যবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে বল্লালসেন অতিশয় বিখ্যাত। ইঁহার জন্মবৃত্তান্ত বিষয়ে নানারূপ কথা আছে। হিন্দুদিগের প্রাচীন-পরম্পরায় প্রতীতি আছে যে, ব্রহ্মপুত্র নদ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া বল্লাল সেনকে জন্ম দিয়াছিলেন; অনেকে বলিয়া থাকেন বল্লাল সেন আদিশূর রাজার পুত্র, আইন আকবরি নামক মুসলমান গ্রন্থে লেখে যে, শুক সেন বল্লালের পিতা ছিলেন, কিন্তু কয়েক বৎসর গত হইল বাঙ্গালার পূর্ব অঞ্চলে সুন্দরবনের ভূমির মধ্যে একখান তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। হিন্দু রাজাদিগের ব্যবহার ছিল এই যে, কাহাকেও স্থাবর সম্পত্তি দান করিবার সময়ে এক তাম্রফলকে দাতা প্রতিগ্রহীতা উভয়-পক্ষীয় পূর্ব-পুরুষের নামধেয় প্রভৃতি খুদিয়া উহা সনন্দ-স্বরূপ প্রতিগ্রহীতাকে প্রদত্ত হইত। ঐ তাম্রশাসনও সেইরূপ এক সনন্দপত্র। উহা রাজা লক্ষ্মণ সেনের প্রদত্ত। উহাতে লিখিত আছে, বল্লাল সেন বিজয় সেনের পুত্র। সেই লিখিত প্রমাণ অবলম্বন করিয়া বিজয় সেনই যে বল্লাল সেনের পিতা, ইহা অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

বল্লাল সেন প্রভূত ক্ষমতা সহকারে পঞ্চাশ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। তিনি সচরাচর সুবর্ণগ্রামেই বাস করিতেন, প্রয়োজন হইলে কখনো গৌড় নগরেও আসিয়া থাকিতেন। এই নগর তৎকালে সমুদয় বাঙ্গালাদেশের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত ছিল। বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের কৌলীন্যপ্রথা সংস্থাপন করেন। তৎকালে যে ব্রাহ্মণেরা নবগুণ-বিশিষ্ট ছিলেন, এবং যে কায়স্থেরা ঐ ব্রাহ্মণদিগের নিতান্ত অনুগত ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকেই বংশানুক্রমে কুলীন করিয়া যান।

তাঁহার অধিকার-সময়ে বাঙ্গালাদেশ নিম্নলিখিতরূপ পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত ছিল—

১. বরেন্দ্রভূমি॥ এই দেশের পশ্চিমে মহানন্দা নদী, দক্ষিণে পদ্মা, পূর্বে করতোয়া, উত্তরে অন্যান্য রাজাদিগের অধিকার;

২. বঙ্গ॥ এই দেশ করতোয়া নদীর পূর্ব হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ, সুবর্ণগ্রাম এই দেশের মধ্যেই অবস্থিত ছিল;

৩. বগ্‌ড়ী॥ এই দেশ ত্রিকোণ, সমন্তাৎ জল দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া ইহাকে দ্বীপও বলিত। ইহার পশ্চিমে ভাগীরথী, পূর্বে পদ্মা ও দক্ষিণে সমুদ্র;

৪. রাঢ়॥ এই দেশের উত্তর ও পূর্বে ভাগীরথী ও পদ্মা নদী, পশ্চিমে ও দক্ষিণে অন্যান্য রাজাদিগের অধিকার।

৫. মিথিলা॥ মহানন্দা ও গৌড়নগর এই দেশের পূর্ব। ইহার দক্ষিণে ভাগীরথী, উত্তরে ও পশ্চিমে অন্যান্য রাজাদিগের অধিকার।

বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন ১১১৬ খৃঃ অব্দে পিতার সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েন। এরূপ প্রবাদ আছে, এই রাজা গৌড়নগর অত্যন্ত সুশোভিত করিয়া আপনার নামানুসারে উহার নাম লক্ষ্মণাবতী রাখিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের পরলোক হইলে মধু সেন, কেশব সেন, শুক সেন, নবজ সেন, ও লক্ষ্মণ্য সেন যথাক্রমে আপন আপন পিতার উত্তরাধিকারী হইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১২০৩ খৃঃ অব্দে যখন মুসলমানেরা প্রথমে এই দেশ আক্রমণ করে, তৎকালে এই সর্বশেষোক্ত রাজা এদেশের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। নবদ্বীপ তাঁহার রাজধানী ছিল।

'বাঙ্গালার ইতিহাস' : প্রথম ভাগ। ১৮৪৮ ?

বাঙ্গালা ভাষা

কেশবচন্দ্র সেন

১৮৩৮ - ১৮৮৪

আজকাল সকলেই পণ্ডিত, কেউ কলেজ চালাচ্ছেন, কেউ বই ছাপাচ্ছেন, কেউ বক্তৃতা ঝাড়ছেন, কেউ পদ্যে, কেউ গদ্যে, কেউ নাটকে, কেউ নভেলে, বিধি মতে পাঁচজনে পড়ে যেন মা-সরস্বতীকে ভাগাড়ে ফেলে ছেঁড়া-ছিঁড়ি করে খাচ্ছেন। এসব দেখেশুনে আমরাই বা চুপ করে থাকি কেন? আমরাও কলম-রূপ নখর বাহির করিয়া দুই চারিটা আঁচড় পেঁচড় কাটি। একজন চালাক বলিয়া গিয়াছেন যে— বাঙ্গালা ভাষা আর বেওয়ারিষী লুচির ময়দা দুই সমান, যার যা ইচ্ছা সে তাই করে। কিন্তু লুচির ময়দা সকল লোকে ব্যবহার করিতে পায় না, ইহা অপেক্ষা বালামের খবর অধিক লোকে রাখে। হে বালাম! বঙ্গ দুহিতে, বাখরগঞ্জেশ্বরী চাল-হাণ্ডিকাবিলাসিনী! তুমি কত বেশে, কত বাহনে, আশ্রিত বাঙ্গালীর নয়ন-মন আকর্ষণ কর, গৃহস্থের ঘরে কদলীপত্রে, তুমি শেতাঙ্গ ঢালিয়া শয়ন কর; মাঝিরা নৌকাতে কৃষ্ণবর্ণ শানকে তুমিই লোহিত মূর্তি ধারণ কর; ঘোড়ার আস্তাবলে অঙ্গে হরিদ্রা মাখিয়া, পলাণ্ডু সঙ্গে তুমি সহিসদিগের চীৎকারজীবি রসনার রসাকর্ষণ কর; টেবিলে আরোহণ করিয়া টেবিল-রাইস নামে তুমি শাসনকর্তাদিগের উদরের সংবাদ লও। সমুদ্রপোত সাজাইয়া শ্রীমন্ত সওদাগরের ন্যায় তুমি দেশ-বিদেশে ভ্রমণ কর; দেশভেদ ও কালভেদে তোমার কতই গুণ, কতই অবস্থা, কিন্তু কে তোমাকে ছাড়িতে পারে? আহারপ্রিয় বাঙ্গালী, প্রহার-প্রিয় ইংরাজ, নেমাজ ও কলহপ্রিয় মুসলমান, উকীল, সিভিলিয়ান, ভট্টাচার্য, মিসনরি, কাজী, বৈষ্ণব— সকলেরই ভার তুমি গ্রহণ করিয়া থাক।

এই বালাম চাউলের অবস্থা যেমন, বাঙ্গালা ভাষার অবস্থাও তেমনি। দেখ বাঙ্গালা ভাষা না কয় কে, না জানে কে, না লেখে কে? বৈঠকখানা-নিবাসী যোহানীস সাহেবের অমানিশারূপিণী 'অর্দ্ধঙ্গ' আপনার বিশাল বপু ক্ষুদ্র মোড়ার উপরে সংস্থাপন করিয়া দস্তার গুড়গুড়ীতে তামাক খাইতে খাইতে ইয়ারীং শোভিত গোলাকার তালফল নিভানন হইতে প্রতিবাসিনীর সঙ্গে যখন বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় আলাপ করেন, তখন নিকটে দাঁড়াইয়া শুনিলে কি আমাদিগের কিছু শিখিবার থাকিবে না? শ্রীরামপুরের সুধার্মিক পাদরী মহাশয়েরা কি বাঙ্গালা ভাষার জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের রচিত ও চাটিম

রম্ভাহারী ভট্টাচার্য শোধিত যীশুখৃষ্ট বিষয়ক পুস্তকগুলির মলাট দেখিবামাত্র প্রাণ কেমন করিয়া উঠে। অক্ষরগুলি সুন্দর, কাগজগুলি পরিষ্কার, মলাটগুলিতে সাহেবী সাহেবী গন্ধ, কিন্তু ভিতরে ভাষার কি পারিপাট্য পদসাধনের, কি কৌশল, রূপকের কি ছটা! 'মথি-লিখিত-সুসমাচার' হইতে 'ফুলমণি ও করুণা'র অপরূপ বৃত্তান্ত পর্যন্ত এমনি অপূর্ব বাঙ্গালায় পরিপূর্ণ যে, সাহেব এবং মেম লোকেরা যখন ভাব-গদগদ হইয়া বিলাতী উচ্চারণে তাহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন, তখন ইচ্ছা হয় যে পৃথিবী যদি দুই ভাগ হয় তাহা হইলে মাতৃভাষার সহিত তাহার মধ্যে প্রবেশ করি। সিভিলিয়ান হুজুর দুর্ভাগ্য আসামী ফরিয়াদীর সহিত যখন বাঙ্গালাতে সওয়াল জবাব করেন, কিংবা ইণ্টরপ্রেটর সাহেব যখন তাহা বুঝাইয়া দেন, তখন কি ষোল আনা সূক্ষ্ম বিচারই হয়! সাহেব বাদী প্রতিবাদীর কথাও যেমন বুঝিতে পারেন, তাহারাও সাহেবের কথা তেমনি বুঝে; মধ্য হইতে কেবল উকীল মোক্তারেরা চোখ টেপাটেপী করে, এবং বিচারার্থী লোক মনে করে যে মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিজের সর্বনাশ উপস্থিত। কিন্তু কিছু বলিবার যো নাই। হুজুর বাঙ্গালা ভাষার নিপুণতার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে গত বৎসরে ২০০০৲ টাকা পারিতোষিক পাইয়াছেন; বাঙ্গালাতে ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা লইবার জন্য নিযুক্ত হইয়া আগামী বৎসরে আরও ২০০০৲ টাকা পাইবেন; বাঙ্গালা ভাষাতে এক ডিক্সনারি পত্তন দিয়াছেন। কে বলিবে হুজুর বাঙ্গালা ভাষার সাক্ষাৎ কল্কী-অবতার নহেন? তাহাতে আবার আজকাল আইন খারাপ। সাহেব বাঙ্গালা জানেন না, রোজ এজলাসে বসিয়া বঙ্গভাষার বাপের শ্রাদ্ধ করেন একথা বলিলে পাছে পিনাল কোড অনুসারে কণ্টেমট্ অফ কোর্ট হইয়া উঠে, এই ভয়েতে কেউ কোন কথা বলিতে পারে না। কিন্তু কিরূপেই বা বঙ্গভূমে এত ব্যাকরণ বধের পাতক সহ্য হইবে। হুজুরের বিশেষ অপরাধ নাই তাহা আমরা জানি; যে মহাত্মারা মধ্যে মধ্যে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে বাঙ্গালাতে পাণ্ডিত্য করেন, তাহা দেখিয়া কোন্ আনাড়ির বাঙ্গাল কহিতে ও লিখিতে সাহস না হইবে? যেমন গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা ভ্রূণহত্যা ইত্যাদির শাস্তি আছে তেমনি ভাষাহত্যার কোন শাস্তি থাকা উচিত। অতএব রেলওয়ে টাইম টেবল, পুলিসের হুটীস, সরীফসেলের বিজ্ঞাপন, পিনাল কোডের প্রকরণ ইত্যাদি দোষে যাঁহারা লিপ্ত থাকেন, থাকিয়াছেন,

কি থাকিবেন, তাঁহাদিগের প্রায়শ্চিত্তের জন্য শীঘ্র এক পঞ্চায়েত নিযুক্ত হয়, এই এই আমাদিগের প্রস্তাব।

আশ্চর্য এই যে, যাঁহারা অন্যের দোষের শাস্তি বিধান করিবার জন্য সর্বদা তৎপর তাঁহারাই স্বেচ্ছাপূর্বক রোজ রোজ এই সর্বনাশ করিতেছেন, তবে কি না তাঁহারা ইংরাজ, এ দেশ জয় করিয়াছেন, দেশের ধন মান রীতিনীতি লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, আমরা ও আমাদিগের সম্পত্তি ও আমাদিগের মাতৃভাষা তাঁহাদের হস্তে ছাগ মেষ মাত্র, তাঁহারা যদি তাঁহাদিগের ছাগল ল্যাজের দিকে কাটেন বাহিরের লোক কথা কইবার কে? তবে আমাদিগের চিৎকার করিবার অধিকার আছে, সেইজন্য অদ্যকার প্রস্তাব। ভাল, তাঁহারা যেন ইংরাজ, তাঁহাদিগের বাঙ্গালা ভাষাকে হাড়কাঠে বন্ধ করা সাজে। কিন্তু দেশীয় ভায়াদিগের উত্তর কি? যেমন ভাষাতে তেমনি বর্ণশুদ্ধিতে তেমনি মনের ভাব প্রকাশে। কখন ফার্সী ও বাঙ্গালাকে খই-মুড়কির ন্যায় একত্র মিশাইতেছেন, তাহার মধ্যে দুই-চারটে পগেয়া ইংরাজীর বুকনী ছাড়িতেছেন। কখন 'এ'র অঙ্গে আকার লাগাইতেছেন, কখন 'ঋ'র লাঙ্গুলে র-ফলা বাঁধিয়া দিতেছেন, এব আরও শ্রুতিমধুর করিবার জন্য তার মস্তকে রেফ্ দিয়া সুখী হইতেছেন, দেখিয়া শুনিয়া চক্ষে জল আইসে। বাবুরা ইংরাজীতে ধনুর্ধর; কেউ কলেজ চালান, কাহারও হস্তে বড় বড় সভার ভার, কেউ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া পৃথিবীকে সরাখানা বোধ করিতেছেন; কিন্তু সামলা, চাপকান, হ্যাট-কোটের ভিতর সন্ধান করিলে সেই পুরাতন হলহলে 'হ' এবং পেটকাটা 'র' ভিন্ন আর কিছু খুঁজিয়া পাওয়া ভার। ইংরাজী ভিন্ন কথা কন না, পত্র লিখেন না; পাছে বাঙ্গালা লইয়া নাড়াচাড়া করিলে 'ভৃগুপদচিহ্ন' বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু আর আমরা অধিক বলিব কি? এই মিনতি করি যে আদালতে অফিসে এবং সমুদয় প্রকাশ্য বিষয়ে যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার একটু কম অবমাননা হয় ক্যাম্বেল সাহেব তাহাই করুন।

'সুলভ সমাচার'। ১৮ বৈশাখ ১২৮০

ঐতিহাসিক স্মৃতি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৮ - ১৮৯৪

যে জাতির পূর্ব মাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্য রক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। ক্রেসী ও আজিন্‌কুরের স্মৃতির ফল ব্লেনহিম্ ও ওয়াটর্লু—ইতালি অধঃপতিত হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়াছে; বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে চায়,—হায়! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই?

বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে, মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্বপুরুষ চিরকাল দুর্বল—অসার, আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাঁহারা দুর্বল অসার গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করেনা— চেষ্টা করেনা। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।

কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার; চৈতন্যের ধর্ম; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়; জয়দেব বিদ্যাপতি মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আসিল? দুর্বল অসার গৌরবশূন্য আরও ত জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্ দুর্বল অসার গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপে অবিনশ্বর কীর্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে? বোধ হয় না কি যে বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার কথা আছে?

সেই সার কথা কোথা পাইব? বাঙ্গালার ইতিহাসে আছে কি? সাহেবেরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। স্টুয়ার্ট সাহেবের বই এত বড় ভারী বই যে ছুঁড়িয়া মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শ্‌মান্ লেথ্‌ব্রিজ প্রভৃতি চুটকিতালে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখে অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন।

কিন্তু এ সকলে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক কোন কথা আছে কি? আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরাজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে

সকলে যদি কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গালার বাদশাহ, বাঙ্গালার সুবাদার ইত্যাদি নিরর্থক উপাধিধারণ করিয়া নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদিগের জন্ম মৃত্যু গৃহবিবাদ এবং খিচুড়ীভোজন মাত্র। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নয়, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অংশও নয়।

বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধও নাই। বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই। যে বাঙ্গালী এ সকলকে বাঙ্গালার ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়। আত্মজাতিগৌরবান্ধ মিথ্যাবাদী হিন্দুদ্বেষী মুসলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়।

সতের জন অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রমাণ কি? মিন্হাজ্ উদ্দীন বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন। আমি যদি আজ বলি যে, কাল রাত্রে আমি ভূত দেখিয়াছি, তোমরা তাহা কেহ বিশ্বাস কর না। কেন না অসম্ভব কথা। আর মিন্হাজ উদ্দীন তাহা অপেক্ষাও অসম্ভব কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তোমরা অম্লান বদনে বিশ্বাস কর। আমি জীবিত লোক, তোমাদের কাছে পরিচিত, আমার কথা বিশ্বাস কর না, কিন্তু সে সাত শত বৎসর মরিয়া গিয়াছে, সে বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী কিছুই জান না, তথাপি তুমি তাহার কথায় বিশ্বাস কর। আমি বলিতেছি, আমি নিজে ভূত দেখিয়াছি, আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না, অথচ ভূত আমার প্রত্যক্ষদৃষ্ট বলিয়া বলিতেছি। আর মিন্হাজ উদ্দীনের প্রত্যক্ষদৃষ্ট নহে, জনশ্রুতি মাত্র। জনশ্রুতি কি স্বকপোলকল্পিত, তাহাতেও অনেক সন্দেহ। আমার প্রতক্ষ্যদৃষ্টিতে তোমার বিশ্বাস নাই, কিন্তু সেই গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর মুসলমানের স্বকপোলকল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই, কেবল এইমাত্র কারণ যে, সাহেবেরা সেই মিন্হাজ উদ্দীনের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে লিখিয়াছেন। তাহা পড়িলে চাকরী হয়। বিশ্বাস না করিবে কেন?

তুমি বলিবে যে, তোমার ভূতের গল্প বিশ্বাস করি না, তাহার কারণ এই যে, ভূত প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ। আরিস্টটল্ হইতে মিল্ পর্যন্ত সকলে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ভাই বাঙ্গালি! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, সতের জন লোকে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে

বিজিত করিল, এইটাই ঠিক প্রাকৃতিক নিয়মের অনুমত। যদি তাহা না হয়, তবে হে চাকরীপ্রিয়! তুমি কেন এ কথায় বিশ্বাস কর।

বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করেন নাই, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক, বখ্‌তিয়ার খিলিজি বহুতর সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই। বখ্‌তিয়ার খিলিজির পর সেন-বংশীয় রাজগণ পূর্ব-বাঙ্গালায় বিরাজ করিয়া অর্দ্ধেক বাঙ্গালা শাসন করিয়া আসিলেন। তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। উত্তর-বাঙ্গালা দক্ষিণ-বাঙ্গালা, কোন অংশই বখ্‌তিয়ার খিলিজি জয় করিতে পারেন নাই। লক্ষ্মণাবতী নগরী এবং তাহার পরিপার্শ্বস্থ প্রদেশ ভিন্ন বখ্‌তিয়ার খিলিজি সমস্ত সৈন্য লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন, এ কথা যে বাঙ্গালী বিশ্বাস করে সে কুলাঙ্গার।

বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এইরূপ সর্বত্র। ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশির যুদ্ধে জন দুই চারি ইংরেজ ও তৈলঙ্গ সেনা সহস্র সহস্র দেশী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভুত রণজয় করিল। কথাটি উপন্যাস মাত্র। পলাশিতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ-তামাসা হইয়াছিল। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর মুসলমানের লিখিত স-এর মুতাখ্‌খরীন্ নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখ।

নীতিকথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছিল। চিত্রে লেখা আছে, মনুষ্য সিংহকে জুতা মারিতেছে। চিত্রকর মনুষ্য এক সিংহকে ডাকিয়া সেই চিত্র দেখাইল। সিংহ বলিল, সিংহেরা যদি চিত্র করিতে জানিত, তাহা হইলে চিত্র ভিন্ন প্রকার হইত। বাঙ্গালীরা কখন ইতিহাস লেখে নাই। তাই বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক চিত্রের এ দশা হইয়াছে।

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবন-চরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে?

তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ।

আর এই আমাদিগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই ?

আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের সন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর করুক ; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।

অনেকে না বুঝিলে না বুঝিতে পারেন যে কোথায় কোন্ পথে, অনুসন্ধান করিতে হইবে। অতএব আমরা তাহার দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

বাঙ্গালী জাতি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? অনেকে মুখে বলেন, বাঙ্গালীরা আর্যজাতি। কিন্তু সকল বাঙ্গালীই কি আর্য? ব্রাহ্মণাদি আর্যজাতি বটে, কিন্তু হাড়ি ডোম মুচি কাওরা ইহারাও কি আর্যজাতি? যদি না হয়, তবে ইহারা কোথা হইতে আসিল? আর্যেরা আগে, না, অনার্যেরা আগে? আর্যেরা কবে বাঙ্গালায় আসিল? কোন্ গ্রন্থে কোন্ সময়ে আর্যদিগের প্রাথমিক উল্লেখ আছে? পুরাণ ইতিহাস খুঁজিয়া বঙ্গ মৎস্য তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি প্রদেশের অনেক উল্লেখ পাইবে। কিন্তু কোথাও এমন পাইবে না যে, আদিশূরের পূর্বে বাঙ্গালায় বিশিষ্ট পরিমাণে আর্যাধিকার হইয়াছিল। কেবল কোথাও আর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা, কোথাও আর্যবংশীয় ব্রাহ্মণ, তাহার পুরোহিত। আদিশূরের পূর্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ প্রণীত কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদি এমন কোন প্রমাণ পাও যে, আদিশূরের পূর্বে বাঙ্গালায় আর্যাধিকার হইয়াছিল, প্রকাশ কর। নাহলে বাঙ্গালী আধুনিক জাতি।

মধ্যকালে অর্থাৎ আদিশূরের কিছু পূর্বে, বাঙ্গালা যে খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তাহা চৈনিক পরিব্রাজকদিগের গ্রন্থের দ্বারা এক প্রকার প্রমাণীকৃত হইতেছে। কয়টি রাজ্য ছিল, কোন্ কোন্ রাজ্য, প্রজারা কোন্ জাতীয়, তাহাদিগের অবস্থা কি, মগধের সঙ্গে তাহাদিগের সম্বন্ধ কি, রাজা কে ?

মুসলমানদিগের সমাগমের পূর্বে পালরাজ্য ও সেনরাজ্য যে একীকৃত হইয়াছিল, তাহা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র একপ্রকার প্রমাণ করিয়াছেন। সন্ধান কর, কি প্রকারে দুই রাজ্য একীকৃত হইল। একীকৃত হইলে পর, মুসলমান কর্তৃক জয় পর্যন্ত এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল। রাজ্যশাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল? শান্তি রক্ষা কিরূপ হইত। রাজসৈন্য কত ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদিগের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি? রাজস্ব

কি প্রকার আদায় করিত, কে আদায় করিত, কি প্রকারে ব্যয়িত হইত, কে হিসাব রাখিত? কত প্রকার রাজকর্মচারী ছিল, কে কোন্ কার্য করিত? কি প্রকারে বেতন পাইত, কোন্ রূপে কার্য সমাধা করিত? কে বিচার করিত, বিচারের নিয়ম কি ছিল, বিচারের সার্থকতা কিরূপ ছিল, দণ্ডের পরিমাণ কিরূপ ছিল, প্রজার সুখ কিরূপ ছিল? ধান্য কিরূপ হইত, রাজা কি লইতেন, মধ্যবর্তীরা কি লইতেন, প্রজারা কি পাইত, তাহাদিগের সুখ দুঃখ কিরূপ ছিল? চৌর্য পূর্ত স্বাস্থ্য, এ সকল কিরূপ ছিল? কোন্ কোন্ ধর্ম প্রচলিত ছিল—বৈদিক বৌদ্ধ পৌরাণিক চার্বাক বৈষ্ণব শৈব আচার্য, কোন্ ধর্ম কতদূর প্রচলিত ছিল? শিক্ষা, শাস্ত্রালোচনা, কতদূর প্রবল ছিল? কোন্ কোন্ কবি, কে কে দার্শনিক—স্মার্ত, নৈয়ায়িক, জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কি কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন? তাঁহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত কি? তাঁহাদিগের গ্রন্থের দোষগুণ কি কি? তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কি শুভাশুভ ফল জন্মিয়াছে? বাঙালীর চরিত্র কি প্রকারে তদ্দ্বারা পরিবর্তিত হইয়াছে? তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কিরূপ? সমাজভয় কিরূপ? ধর্মভয় কিরূপ? ধনাঢ্যের অশনপ্রথা বসনপ্রথা শয়নপ্রথা কিরূপ? বিবাহ, জাতিভেদ কিরূপ? বাণিজ্য কিরূপ, কি কি শিল্পকার্যে পারিপাট্য ছিল? কোন্ কোন্ দেশোৎপন্ন শিল্প কোন্ কোন্ দেশে পাঠাইত? বিদেশে যাত্রার পদ্ধতি কিরূপ ছিল? সমুদ্রপথে বিদেশে যাইত কি? যদি যাইত, তবে জাহাজ বা নৌকার আকারপ্রকার কিরূপ ছিল? কোন্ প্রদেশীয় লোকেরা নাবিক হইত?

তারপর মুসলমান আসিল। সপ্তদশ অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা যে জয় করিয়াছিল, তাহা ত মিথ্যা কথা সহজেই দেখা যাইতেছে। বখতিয়ার খিলিজি কতটুকু বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, কি প্রকারে জয় করিয়াছিল? লক্ষ্মণাবতী জয়ের পর বাঙ্গালার অবশিষ্টাংশ কি অবস্থায় ছিল? সে সকল দেশে কে রাজা ছিল? অবশিষ্ট অংশের কি প্রকারে স্বাধীনতা লুপ্ত হইল? কবে লুপ্ত হইল?

পরে স্বাধীন পাঠান-সাম্রাজ্য। পাঠানেরা কতটুকু বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন? যেটুকু অধিকার করিয়াছিলেন, সেটুকুর সঙ্গে তাহাদিগের কি সম্বন্ধ ছিল? সেটুকু কি প্রকারে শাসন করিতেন? আমি যতদূর ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে আমার এই বিশ্বাস আছে যে, পাঠানেরা

কস্মিন্‌কালে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা অধিকার করেন নাই। স্থানে স্থানে তাঁহারা সৈনিক উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া উপনিবেশের পার্শ্ববর্তী স্থান সকল শাসন করিতেন মাত্র। তাঁহাদিগের আমলে বাঙ্গালীই বাঙ্গালা শাসন করিত। হিন্দুরাজগণের অধিকার-সময় হইতে ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজগণ বাঙ্গালা দেশ অধিকার করিত; যেমন বিষ্ণুপুরের রাজা, বর্ধমানের রাজা, বীরভূমের রাজা, ইত্যাদি। ইহারাই দীন দুনিয়ার মালিক ছিলেন। ইহারাই রাজস্ব আদায় করিতেন, শান্তিরক্ষা করিতেন, দণ্ডবিধান করিতেন, এবং সর্বপ্রকার রাজ্যশাসন করিতেন। মুসলমান সম্রাটেরা বড় বড় লড়াই পড়িলে লড়াই করিতেন। অথবা করিতেন না। অধীনস্থ রাজগণের নিকট কর লইতেন অথবা পাইতেন না। ইউরোপের মধ্যকালে ফ্রান্স রাজ্যের রাজার সহিত বরগুণ্ডী, আঁজু প্রবেন্স্ প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক প্রদেশের রাজগণের যে সম্বন্ধ, মুসলমানের সহিত বাঙ্গালার রাজগণের সেই সম্বন্ধ ছিল। অর্থাৎ তাহারা একজন Suzerain মানিত, কখন কখন মানিত না। তদ্ভিন্ন স্বাধীন ছিল। এ বিষয়ে যতদূর সন্ধান করিতে পার, কর। কোন্ রাজবংশ কোন্ কোন্ প্রদেশে কতকাল শাসন করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান কর। তাঁহাদিগের সুবিস্তৃত ইতিহাস লেখ।

ইউরোপ সভ্য কতদিন? পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারি শত বৎসর পূর্বে ইউরোপ আমাদিগের অপেক্ষাও অসভ্য ছিল। একটি ঘটনায় ইউরোপ সভ্য হইয়া গেল। অকস্মাৎ বিনষ্ট বিস্মৃত অপরিজ্ঞাত গ্রীক সাহিত্য ইউরোপ ফিরিয়া পাইল। ফিরিয়া পাইয়া যেমন বর্ষার জলে শীর্ণা স্রোতস্বতী কূল-পরিপ্লাবনী হয়, যেমন মুমূর্ষু রোগী দৈব ঔষধে যৌবনের বলপ্রাপ্ত হয়, ইউরোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল। আজ পেত্রার্ক্, কাল লুথর, আজ গেলিলিও, কাল বেকন্; ইউরোপের এইরূপ অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছ্বাস হইল। আমাদিগেরও একবার সেইদিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয়, তারপর রূপ সনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। এদিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন, এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্যের পূর্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরিবর্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা, অপরিমেয় তেজস্বিনী জগতে অতুলনীয়া; সে কোথা হইতে?

আমাদের এই renaissance কোথা হইতে? কোথা হইতে সহসা এই জাতির এ মানসিক উদ্দীপ্তি হইল? এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল? ধর্মবেত্তা কে? শাস্ত্রবেত্তা কে? দর্শনবেত্তা কে? ন্যায়বেত্তা কে? কে কবে জন্মিয়াছিল? কে কি লিখিয়াছিল? কাহার জীবন-চরিত কি? কাহার লেখায় কি ফল? এ আলোক নিবিল কেন? নিবিল বুঝি মোগলের শাসনে। হিন্দুরাজা তোড়লমল্লের আমলে তুমার আমার দোষে। সকল কথা প্রমাণ কর।

প্রমাণ করিবার আগে বল যে, যে বাঙ্গালা ভাষা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস গোবিন্দদাসের কবিতায় এ ভাস্বতী কিরণমালা বিকীর্ণ করিয়াছিল, এ বাঙ্গালা ভাষা কোথা হইতে আসিল। বাঙ্গালা ভাষা আত্মপ্রসূতা নহে। সকলে শুনিয়াছি, তিনি সংস্কৃতের কন্যা; কুললক্ষণ কথায় কথায় পরিস্ফুট। কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃতের দৌহিত্রী মাত্র। প্রাকৃতই এঁর মাতা। কথাটায় আমার বড় সন্দেহ আছে। হিন্দী মারহাট্টা প্রভৃতি সংস্কৃতের দৌহিত্রী হইলে হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা যেন সংস্কৃতের কন্যা বলিয়া বোধ হয়। প্রাকৃতে কার্যের স্থানে কজ্জ বলিত। আমাদের চাষার মেয়েরাও কার্যের স্থানে কায্যি বলে। বিদ্যুতের স্থলে বিজ্জুলও বলি না, বিজুলিও বলি না। চাষার মেয়েরাও বিদ্যুৎ বলে। অধিকাংশ শব্দই প্রাকৃতের অননুগামী। অতএব বিচার করা আবশ্যক—প্রথম, বাঙ্গালার অনার্য ভাষা কি ছিল? দ্বিতীয়, কি প্রকারে তাহা সংস্কৃতমূলক ভাষার দ্বারা কতদূর স্থানচ্যুত হইল। তৃতীয়, সংস্কৃতমূলক যে ভাষা, তাহা একেবারে সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, না, প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত? বোধ হয় খুঁজিয়া ইহাই পাইবে যে, কিয়দংশ সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, কিয়দংশ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত। চতুর্থ, সেই সংস্কৃতমূলক ভাষার সঙ্গে অনার্য ভাষা কতদূর মিশ্রিত হইয়াছে। ঢেঁকি কুলো ইত্যাদি শব্দ কোথা হইতে আসিল? পঞ্চম, ফরাসী আরবী ইংরেজী কোন্ সময়ে কতদূর মিশিয়াছে?

মোগল বাঙ্গালা জয় করিয়া শাসন একটু কঠিনতর করিয়াছিল। সেটুকু কতদূর? রাজ্যও একটু অধিকতর বিস্তৃত করিয়াছিল, সেটুকুই বা কতদূর? তোড়লমল্লের রাজস্ব-বন্দোবস্ত ব্যাপারটা কি? তাহার আগে কি ছিল? তোড়লমল্লের রাজস্ব-বন্দোবস্তের ফল কি হইল? মুরশীদ্ কুলি খাঁ তাহার উপর কি উন্নতি বা অবনতি করিয়াছিল? জমিদারদিগের উৎপত্তি কবে?

কিসে উৎপত্তি হইল? মোগল-সাম্রাজের সময় তাহাদিগের কি প্রকার অবস্থা ছিল? মোগল-সাম্রাজ্যের সময় বাঙ্গালার রাজস্ব কিরূপ ছিল? কোন্ সময়ে কি প্রকারে বৃদ্ধি পাইল? মুসলমানেরা দেশের রাজা ছিল, কিন্তু জমিদার সকল তাহাদিগের করগত না হইয়া হিন্দুদিগের করগত হইল কি প্রকারে? জমিদারদিগের কি ক্ষমতা ছিল? তখনকার জমিদারদিগের সঙ্গে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময়ের জমিদারদিগের এবং বর্তমান জমিদারদিগের কি প্রভেদ?

মোগলজয়ের পরে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছিল। বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না থাকিয়া দিল্লীর পথে গিয়াছিল। বাঙ্গালা স্বাধীন প্রদেশ না হইয়া পরাধীন বিভাগমাত্র হইয়াছিল। কিন্তু উভয় সময়ের সামাজিক চিত্র চাই। সামাজিক চিত্রের মধ্যে প্রথম তত্ত্ব ধর্মবল। এখন ত দেখিতে পাই, বাঙ্গালার অর্ধেক লোক মুসলমান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্নদেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেননা, ইহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক— কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে আর প্রজার বংশাবলীর উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহা অসম্ভব। দ্বিতীয়, অল্পসংখ্যক রাজানুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্পসময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতিলাভ করিবে ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় লোকের অর্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধর্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন্ জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই।

বঙ্গদর্শন। ১২৮৭ অগ্রহায়ণ

বাংলার সাহিত্য

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৪০ - ১৯২৬

দুই বৎসরকাল আমি আপনাদের সাদর আহ্বানের আকর্ষণ এড়াইতে না পারিয়া সাহসে ভর করিয়া ভয়ে ভয়ে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। আমার ভয়ের কারণ এই যে, এর পূর্বে সভাপতির কার্য আমি আমার বয়সে কখনো করি নাই; কাজেই, সে কার্য সুনির্বাহ করিতে হইলে যে সকল উচ্চ অঙ্গের বশীকরণ গুণ আবশ্যক, তাহার কিছুই আমার ভিতরে নাই। আমি একপ্রকার খো'য়ে বন্ধনে আটক পড়িয়া গিয়াছি। খই হ'চ্চে আশার প্রলোভন, আর থাম হ'চ্চে সভাপতির আসন। কোনো গতিকে যদি দেশীয় সাহিত্য-সেবকদিগের কাহারো কোনো উপকারে আসিতে পারি —এ ছার আশার মায়াও আমাকে ছাড়িতেছে না; আর উপকার কাহারো কিছু করিতে পারিব না, লাভের মধ্যে হইবে কেবল— কাহারও বা কৌতুক-দৃষ্টির, কাহারও বা বিষদৃষ্টির, কাহারও বা কৃপাদৃষ্টির লক্ষ্যস্থান; এ ছাড় দুঃস্বপ্নের বিভীষিকাও আমাকে ছাড়িতেছে না। আমার ভয়ের কারণ কি তাহা বলিলাম। সাহসের কারণ কি তাহাও বলি। সাহসের কারণ এই যে, বঙ্গ-সাহিত্যের আমি একজন পুরাতন পরিচারক। দশোন অর্ধ-শতাব্দী প্রতিদিন আমি তাঁহার চরমকালে বিবিধবর্ণের পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আসিতেছি; আর সেই উপলক্ষ্যে তাঁহার দেবালয়ের সন্নিহিত নিবিড় বনাকীর্ণ প্রদেশের পথঘাট এবং অন্ধি-সন্ধি কতক কতক আমার জানা হইয়াছে। সেই আরণ্যক পতিত ভূমিতে কোথাও বা ফুলের মালঞ্চ, কোথাও বা সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবনের ছায়াময়ী বীথিকা, কোথাও বা ফুলের উদ্যান উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার বিহিত প্রণালী-পদ্ধতি কতক বা আমি দেখিয়া শিখিয়াছি, কতক বা ঠেকিয়া শিখিয়াছি, কতক বা হাতে-কলমে করিয়া-কম্মিয়া শিখিয়াছি, আর তা যাহা শিখিয়াছি তাহাতে জো-শো করিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে কাজ চালানো যাইতে না পারে এমন নহে। তা ছাড়া, আমার সাহসের আর-একটি কারণ আছে— সেটিই প্রবল কারণ; তাহা এই যে, সাহিত্য-পরিষদের শিরোভূষণ স্বরূপে তিন-চার জন সম্মানাস্পদ মহোদয় আমাকে এই বলিয়া অভয় প্রদান করিলেন যে, আমার কার্যপটুতার অভাব, তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা দ্বারা পূরণ

করিয়া লইবেন। ইঁহাদের অটল পৃষ্ঠপোষকতা এবং অকৃত্রিম উৎসাহ প্রদানের বলে এযাবৎকাল সভাপত্য-কার্য কথঞ্চিৎরূপে নির্বাহ করিয়া আসিতে পারিয়াছি। সত্য বলিতে কি, কার্যভার আমাকে ততটা বহন করিতে হয় নাই— যতটা উঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা-ভার। বিশেষতঃ বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, যেমন সুপণ্ডিত তেমনি সুযোগ্য ; যেমন সুযোগ্য, তেমনি পরিশ্রমী ; যেমন পরিশ্রমী, তেমনি ধীর, সহৃদয় এবং বিনয়সম্পন্ন, আর, সেই কারণে সভাসুদ্ধ লোকের পরম প্রীতিভাজন, এইরূপ সহস্রের মধ্যে এক যিনি আমাদের সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, তাঁহার শ্লাঘনীয় গুণরাশি আজীবন আমার স্মরণ-পটে মুদ্রিত থাকিবে।

দুই বৎসর কালের পরীক্ষার তোলা-পাড়ায় পরিষদের অবলম্বনীয় কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে আমি মোটামুটি একটি সার কথা বুঝিয়াছি। সে কথা এই যে, প্রথম নেপোলিয়ান যখন গোলান্দাজি সেনাবিভাগে অধ্যক্ষতায় নিয়োজিত হইয়া লাইয়ন্স নগরের প্রত্যভিমুখে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি দেখিলেন—এলাহি কারখানা—নবাবী রকমের বন্দোবস্ত—অনুষ্ঠানের কিছু মাত্র ত্রুটি নাই ; গোলাগুলি অস্ত্রশস্ত্র সাজসজ্জা কিছুরই অপ্রতুল নাই। 'পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্বে মুর্খে দোষাহি কেবলং' এই চাণক্য শ্লোকার্ধটির অনুবাদ একজন পাঠশালার ছাত্র এরূপ করিয়াছিল যে, পণ্ডিতের সবই গুণ—দোষের মধ্যে কেবল তিনি মুর্খ। নেপোলিয়ন তেমনি দেখিলেন যে, সবই অতি পরিপাটী বন্দোবস্ত, দোষের মধ্যে কেবল, গোলা তপ্ত করিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে ক্রোশ-খানেক অন্তরে, তপ্ত করিয়া তাহাকে কার্যস্থানে আনিতে না আনিতেই পথিমধ্যে তাহা ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে ; গোলা নিক্ষেপ করা হইতেছে দুর্গের প্রতি, পড়িতেছে তাহা দুর্গে না পৌঁছিয়া মাঝখানকার ফাঁকা স্থানে। আক্রমণ করা উচিত জাহাজের বন্দরে, আক্রমণের চেষ্টা নগরের সুরক্ষিত বক্ষঃস্থলের উপরেই বিফলে ক্ষপিত হইতেছে। আমি তাই বলি যে, এইরূপ বৃথা পণ্ডশ্রমের তুমুল কাণ্ডকারখানা হইতে পরিষদের হস্ত যত অলগ্ থাকে ততই ভাল। কেননা ওরূপ কাণ্ডকারখানা হইতে ফল যাহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে তাহা উহার গায়ে লেখা রহিয়াছে— কী ? না, বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া ! এখনো সমস্ত হাত ছাড়া হয় নাই ;—পরিষদ্ যদি সুবুদ্ধির পরামর্শ শোনেন, তবে এই বেলা তিনি সিরাজদ্দৌলাদিগের নিকট হইতে শেখা অকেজো নবাবী চাল দূরে বিসর্জন করিয়া ক্লাইভ এবং তাঁহার

তুখোড় বুদ্ধিমান চেলাদিগের নিকট হইতে কার্যনির্বাহক্ষম পাকা চাল শিক্ষা করুন; কিরূপে প্রথমে সহজসাধ্য আশ-পাশের ছোট ছোট কার্যগুলা হস্ত হইতে নিঃশেষে চুকাইয়া ফেলিতে হয়, তাহার পরে কিরূপ আটঘাট-বাঁধিয়া দৃঢ়তার সহিত নিঃশব্দে ধীরে ধীরে পা বাড়াইতে হয়; তাহার পরে কিরূপ সম্যক্ যোগাড়যন্ত্র করিয়া আয়াসসাধ্য বড় বড় কার্যগুলা একে একে মুঠার মধ্যে আনিতে হয়; সংক্ষেপে, কিরূপে ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইয়া বাহির হইতে হয় তাহার সুবিজ্ঞ প্রণালী-পদ্ধতি বিধিমত প্রকারে শিক্ষা করুন; শিক্ষা করিয়া তদনুসারে তৎপরতার সহিত স্বকার্যে প্রবৃত্ত হউন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্র— ইংরাজীতে যাহাকে বলে petty intrigues— সেই সকল কর্মনাশা জঞ্জালগুলা সমূলে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া ঘর পরিষ্কার করুন, ঘর পরিষ্কার করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে মূলমন্ত্র (অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে cause সেই মূলমন্ত্র) জপ করুন; এবং সেই মূলমন্ত্রকে (cause-কে) সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া ও তাঁহার অধীনে সুবিনীত সৈন্যদলের ন্যায় যন্ত্রবদ্ধ হইয়া—সকলের সহিত সকলে একাত্মা হইয়া—কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগুন। এখনও যদি পরিষদ্ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া এইরূপ সুবিহিত প্রণালীতে কার্যারম্ভ করেন, তবে যাহা তিনি পঞ্চাশ বৎসরে দেখিতে পাইবেন বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাহা দশ বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহার আনন্দোৎফুল্ল নয়নযুগলের সম্মুখে আপনা হইতে আসিয়া বিরাজমান হইবে। সে যাহা বিরাজমান হইবে তাহা কী? তাহা 'সিদ্ধি'দেবীর প্রসন্নবদন যাহার দর্শন-লাভ বাঙ্গালীর পক্ষে ঘটে কদাচ— ঘটে না কেবল তাহার আপনার দোষে।

সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য যেমন মহৎ এবং উদ্যম যেমন প্রশংসনীয়— তাহার কার্যনির্বাহের প্রণালী-পদ্ধতি তেমনি প্রকৃষ্টরূপে ফলদায়ক হওয়া চাই; নহিলে তাঁহার উপক্রমণিকার সহিত উপসংহারের দেখা-সাক্ষাতের পথে কাঁটা পড়িবে; অর্থাৎ গোড়ায় কথা হইয়াছিল একপ্রকার—ফল দাঁড়াইবে আর-এক-প্রকার।

সাহিত্য-পরিষদের পৃথক পৃথক উদ্দেশ্যের পৃথক পৃথক সাধনাপ্রণালী আমার বুদ্ধিতে আমি যাহা সুসঙ্গত বিবেচনা করি তাহা একে একে আপনাদের দৃষ্টিগোচরে আনয়ন করিতেছি। আমার মন্তব্য কথাগুলির প্রতি আপনাদের বড়জোর ঘণ্টা দুয়েকের মনোযোগ যাজ্ঞা করিতেছি—এই সামান্য ভিক্ষাটি আজ আপনারা আমাকে প্রদান করিতে ভার বোধ করিলে চলিবে না।

সাহিত্য-পরিষদের প্রথম উদ্দেশ্য—বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন। স্বদেশীয় সাহিত্যানুরাগী কৃতবিদ্য মহোদয়েরা অনেক সময় এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, আজ পর্যন্ত দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র হইতে বঙ্গভাষার একখানিও সন্তোষজনক ব্যাকরণ বাহির হইল না। ইঁহাদের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য সাহিত্য-পরিষদ্ যদি বঙ্গভাষার একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ গড়িয়া তুলিতে পারেন তবে একটা কাজের মত কাজ হয়। ব্যাকরণ বলিতে সচরাচর আমরা যাহা বুঝি তাহা স্বতন্ত্র, এবং সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ যাহা আমি বলিতেছি হইলে ভাল হয়, তাহা স্বতন্ত্র। যেরূপ ধরণের বঙ্গীয় ব্যাকরণ সচরাচর মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হইতে দেখা যায়, তাহা সাহিত্য-সেবকদিগের কাহারো কোনো উপকারে আসিতে পারে না; উপকারে আসা দূরে থাকুক —তাহার সকল কথা বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিলে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়। কিরূপ হিতে বিপরীত হয়, তাহার আমি অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। আপনারা ভীত হইবেন না, আজ আমি কেবল আমার ঐ মন্তব্য কথাটির একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াই ভালোয় ভালোয় ক্ষান্ত হইতেছি।

বলিতে কি—না পড়িয়া পণ্ডিতকে, সংক্ষেপে N. P. P.-কে, তত আমি ডরাই না—যত আমি ডরাই পুঁথি কণ্ঠস্থ করিয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিতকে, P. K. D. P.-কে। শেষোক্ত শ্রেণীর কোন ব্যাকরণ-দিগ্‌গজ বলিতে পারেন যে, ইংরাজেরাই বলে 'Do this কর এই'—আমরা বলি 'এই কর this do'; অতএব সাবধান! বাঙ্গলা লিখিবার সময় ক্রিয়াকারকের পরে কর্মকারক বসাইও না—যেহেতু বাঙ্গলা ব্যাকরণের বিধান-মতে তাহা নিষিদ্ধ। বাঙ্গলা ব্যাকরণের বিধান এই যে, আগে কর্মকারক—পরে ক্রিয়াকারক—নিবেশীতব্য। ভট্টাচার্য মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া তাঁহার একটি বাল্যকালের সহাধ্যায়ী বন্ধু তাঁহার শিখা ধরিয়া টান দিলেন; টান প্রাপ্তে ভট্টাচার্য মহাশয় রাগত হইয়া বলিয়া উঠিলেন 'কর কি'—'কি কর' না বলিয়া বলিলেন 'কর কি'! এইরূপে যখন তিনি মুখে বলিলেন "ক্রিয়াকারকের পরে কর্মকারক বসাইতে নাই' অথচ কাজে তিনি অম্লান বদনে 'ক্রিয়াকারকের পরে কর্মকারক বসাইয়া দিলেন 'কর কি' তখন তাহার বাল্যকালের সহাধ্যায়ী বন্ধুটি জো পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন 'বল্লে এক—কল্লে আর'! ভট্টমহাশয়ও যেমন উদ্‌ভট্ট-মহাশয়ও তেমনি! যেমন গুরু যেমনি চেলা! ভট্টমহাশয়ও ক্রিয়ার পরে

কর্ম বসাইয়া বলিলেন—'কর কি'? উদ্‌ভট্টমহাশয়ও ক্রিয়ার পরে কর্ম বসাইয়া বলিলেন—'বলিলে এক করিলে আর'। অতএব ভট্টমশায়ের হার উদ্‌ভট্টমহাশয়ের জিত। তবেই হইতেছে যে, ভাষার প্রচলিত প্রথার উপরে বৈয়াকরণিক পণ্ডিতদের পুঁথিগত বিদ্যার তর্জনগর্জন খাটে না। প্রচলিত প্রথাটিকে আপনারা কম লোক ঠাওরাইবেন না। প্রচলিত প্রথা ব্যাকরণকেও ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে পারে! কে বলে যে, প্রচলিত প্রথা ব্যাকরণ মানে না? ব্যাকরণ খুবই মানে। কিন্তু সে ব্যাকরণ যাহা সে মানে, তাহা তোমার আমার প্রণীত ভট্টাচার্য-ব্যাকরণ নহে; তাহা মা-সরস্বতীর সার্বভৌমিক ব্যাকরণ! এই সার্বভৌমিক ব্যাকরণের অমুক অধ্যায়ের অমুক সূত্রে আছে যে, যে স্থানে কারকের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক সেই স্থানে সেই কারক সর্বাগ্রে উচ্চারিতব্য। সার্বভৌমিক ব্যাকরণের এই প্রশস্ত বিধানটি আমাদের কানে আজ পুরাতন ঠেকিতে পারে, কিন্তু কাজে চিরকালই আমরা ইহার অধীনে গ্রীবা অবনত করিয়া আসিতেছি। যখন কর্ম অপেক্ষা ক্রিয়ার উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক হয়, তখন আমরা 'কি করিলাম' বলি না—তখন বলি 'করিলাম কি'। যখন কর্তা অপেক্ষা কর্মের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক হয় তখন আমরা 'আমি তোমাকে ডাকি নাই' বলি না—তখন বলি 'তোমাকে আমি ডাকি নাই'। যখন কর্তা অপেক্ষা ক্রিয়ার উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক হয়, তখন আমরা 'সে যাক্ যেখানে তার ইচ্ছা' বলি না—তখন বলি 'যাক্ সে যেখানে তার ইচ্ছা'। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, সার্বভৌমিক ব্যাকরণের কাছে ভট্টাচার্য ব্যাকরণের[১] দম্ভ আস্ফালন খাটে না। সার্বভৌমিক

---

১ এখানে ভট্টাচার্যের অর্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নহে। পুঁথিগত বিদ্যাই যাঁহার সর্বস্ব তাঁহাকেই ভট্টাচার্য উপাধি প্রদান করা হইতেছে। যিনি স্থানাস্থান কালাকাল পাত্রাপাত্র নির্বিচারে সর্বতাতেই পুঁথিগত বিদ্যা খাটাইতে তৎপর, তিনিই এখানে ভট্টাচার্য; তিনি ইংরাজ হইলেও ভট্টাচার্য, বাঙ্গালী হইলেও ভট্টাচার্য, শূদ্র হইলেও ভট্টাচার্য, যবন হইলেও ভট্টাচার্য। তেমনি আবার, কোন্ বিদ্যা কোথায় খাটে, কোথায় খাটে না, যেখানে খাটে সেখানে কিভাবে খাটে, কি ভাবে খাটে না, কোন্ পাত্রে খাটে কোন পাত্রে খাটে না, যে পাত্রে খাটে সে পাত্রের কোন্ অবস্থায় খাটে কোন্ অবস্থায় খাটে না, এই সকল বিষয় যাঁহার জানা আছে, এককথায়—যাঁহার স্থানাস্থান কালাকাল পাত্রাপাত্র বোধ আছে, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও—জাগ্রত জীবন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও—প্রত্যহ নিয়মিতরূপে সন্ধ্যাবন্দনা এবং

ব্যাকরণের শাসনাধিকার (jurisdiction) কেবল আমাদের এই ক্ষুদ্র বঙ্গভূমিতেই আবদ্ধ নহে, তাহার দৌড় পৃথিবীর এ মুড়া হইতে ও মুড়া পর্যন্ত। সার্বভৌমিক-ব্যাকরণের ঐ যে একটি সূত্র—যে যেস্থানে যে কারকের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক সেই স্থানে সেই কারক সর্বাগ্রে উচ্চারিতব্য, এই সূত্রটির একটি অতি পরিপাটি উদাহরণ শেক্স্পিয়ারের জুলিয়স্ সীজারের প্রথম পংক্তিতেই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। রোম নগরের ইতর শ্রেণী কারিকরেরা সীজারের বিজয়-মাহাত্ম্য-ঘটা দর্শনার্থে দঙ্গল বাঁধিয়া রাজপথে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া রোমের একজন মাথালো ব্যক্তি তাহাদিগকে সীজারের পক্ষপাতিতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার মানসে তাহাদিগকে ধম্কাইয়া বলিলেন 'Hence home you idle creatures, get you home'! 'Hence! home' এই ল্যাজামুড়া-বিহীন, ক্রিয়াকারকের উল্লেখবিহীন খণ্ড-বচনটি নাটকের শিরোভাগে সন্নিবেশিত দেখিয়া ভট্টাচার্য-ব্যাকরণ অবাক্! ভট্টাচার্য-ব্যাকরণের মনোগত কথা এই যে, পংক্তিটির শিরোভাগে hence home কথাটি অনর্থক জায়গা জুড়িয়া থাকে কেন? অবিলম্বে সমালোচক ডাকাইয়া আনিয়া ক্ষৌরীকরণ দ্বারা পংক্তিটির মস্তক মুণ্ডন করানো হোক; তাহা হইলে মুখমণ্ডলে দিব্য বৈয়াকরণিক শ্রী ফুটিয়া বাহির হইবে! তাহা হইলে নাটকের মস্তকটি শুধু কেবল 'You idle creatures get you home' এইরূপ চাঁচা-ছোলা মূর্তিধারণ করিবে! প্রকৃত কথা এই যে, 'Hence flee to your home' অথবা 'hence get you home' বলিলে মাঝে ক্রিয়া কারকের ব্যবধান গতিকে hence শব্দ হইতে home শব্দ দূরে পড়িয়া যায়; কিন্তু রোমান বক্তার মনের বেগ hence হইতে home-এর সেরূপ বাচনিক দূরবর্তিতাও সহ্য করিতে পারে না; রোমান বক্তার মনের বেগ শ্রোতাবর্গকে চকিতের মধ্যে স্ব স্ব ঘরে পুরিতে পারিলে তবেই

গঙ্গাস্নানাদি করিলেও—এখনকার শাস্ত্র অনুসারে ভট্টাচার্য উপাধি তাঁহাতে বর্তিতে পারে না। ভট্টাচার্য শব্দের অর্থ আর কিছু না—ইংরাজীতে যাহাকে বলে Pedant। ভট্টাচার্য ব্যাকরণ কি? না, যে ব্যাকরণ ছাত্রদিগকে Pedantry শিক্ষা দেয়। ভট্টাচার্য উচ্চারণ কি? না, যে উচ্চারণ না বিশুদ্ধ বাঙ্গলা না বিশুদ্ধ সংস্কৃত, পরন্তু উভয়ের মাঝামাঝি অশুদ্ধ সংস্কৃত। 'একই' এই শব্দের ভট্টাচার্য উচ্চারণ 'এৈক' প্রকৃত উচ্চারণ 'অ্যাকি'। 'দেখ' এই শব্দের ভট্টাচার্য উচ্চারণ Dekhaw প্রকৃত উচ্চারণ 'দ্যাখো'।

শান্তি মানে। যে কথা মনের বেগ হইতে বাহির হয় সেই কথাতেই বেশী ঝোঁক পড়ে; আর, যে কথাতে বেশী ঝোঁক পড়ে, সেই কথাই সর্বাগ্রে বক্তার মুখ দিয়া বাহির হয়। কাজেই Hence home এই খণ্ডবচনটি সর্বপ্রথমে উচ্চারিত হইল। নাটকের এই পংক্তিটি দুই অংশে বিভক্ত; Hence home you idle creaures এইটি প্রথম অংশ। এবং Get you home এইটি দ্বিতীয় অংশ। প্রথম অংশে hence home-এর উপর ঝোঁক পড়িয়াছে—দ্বিতীয় অংশে get you-র উপরে ঝোঁক পড়িয়াছে। দুই অংশের কথার উপরে ঝোঁক পড়িবার বিশিষ্টরূপ কারণও আছে, সেই কারণ এই—

আমরা যখন কোনো অভীষ্ট কার্যের সাধনে কৃতসংকল্প হই, তখন প্রথমেই আমরা তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি ঝোঁক দিয়া তাহাকে মনশ্চক্ষের সম্মুখে মূর্তিমান কবির; তার সাক্ষী—সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলীতে প্রথমেই রহিয়াছে 'সভার উদ্দেশ্য' এই কথাটি বড় অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত, তাহার পরে আমরা উদ্দেশ্যসাধনের উপায়ের প্রতি ঝোঁক দিয়া অবলম্বনীয় কার্য-প্রণালীর একটা সুব্যবস্থা ফাঁদি। রোমান বক্তার উদ্দেশ্যে এই যে, শ্রোতা এ স্থানে না থাকুক এবং বাড়ীতে থাকুক; তাই তিনি পরিহর্তব্য স্থান এবং গন্তব্য স্থান এই দুই স্থানের উপর ঝোঁক দিয়া পংক্তিটির প্রথম অংশের প্রথমেই বলিলেন 'Hence home।' তাহার পরে পথ অতিবাহনের উপায়ের প্রতি ঝোঁক দিয়া দ্বিতীয়াংশে প্রথমেই বলিলেন 'Get you যাও তোমরা।' আর একটি কথা এই যে, শ্রোতৃবর্গ নিতান্তই নগণ্য শ্রেণীর লোক বলিয়া সম্বোধন-কারকের উপর ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল না; তাই You idle creatures এই সম্বোধন-কারকটি প্রথমাংশের প্রথমে না বসিয়া শেষে বসিল। পক্ষান্তরে ব্রুটাস্ যখন রোমানদিগকে সম্বোধন করিতেছেন তখন সম্বোধন-কারকের উপর রীতিমত ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক হওয়াতে সর্বাগ্রেই 'Romans, Countrymen and lovers' এইরূপ সম্বোধন-কারকের ধারাবর্ষণ হইল।

সার্বভৌমিক-ব্যাকরণের কারক-বিন্যাস-ব্যবস্থা-অধ্যায়ের মূল সূত্র এই, যা আমি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম, ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, বৈয়াকরণিক চূড়ামণিদিগের মত লইয়া কর্তা কর্ম ক্রিয়া যথাস্থানে বসাইতে হইবে, এরূপ বিধান প্রবর্তনা একপ্রকার প্লেগের আইন জারি। তাহার উদ্দেশ্য অতীব

প্রসংশনীয় কী? না, ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন! কিন্তু শ্রীবৃদ্ধি হয় কই? হইবার মধ্যে হয় কেবল ভাষার স্বাভাবিক শ্রী ঘুচিয়া গিয়া উন্টা শ্রীর উৎপত্তি!

আমাদের দেশে বৈয়াকরণিক এবং নৈয়ায়িকদিগের প্রখর বুদ্ধির প্রতাপে মা-সরস্বতী সর্বদাই ভয়ে জড়োসড়। ব্যাকরণ না থাকিতেই এই। একখানি তৈয়ারী ব্যাকরণ হাতে পাইলে খুনী সমালোচকেরা গ্রন্থকারদিগের হাতে মাথা কাটিবেন। সেটা বড় সর্বনেশে ব্যাপার। মহাসমালোচক বল্‌টেয়ার শেকস্‌পিয়ারকে একেবারেই নস্যাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ড নব্য-সাহিত্যের উঠন্তি সময়ে (অর্থাৎ এলিজাবেথের আমলে) যদি French Academy এবং Voltaire-এর ন্যায়সমজদার সমালোচকেরা Shakespeare-কে ঘিরিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে Shakespeare বেচারী Pope এবং Dryden-এর ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিত না। আমি তাই বলি যে French Academy-তে কাজ নাই—বঙ্গভাষা আরো কিছুদিন খেলাধূলা করিয়া স্বাধীন স্ফূর্তিতে বিচরণ করুক। দশম বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতেই বঙ্গভাষা বেচারী অকাল-প্রবীণা বি. এ, এম্. এ. হইয়া চশমা ধরিলে, তিনি নিখিল বিদ্বজ্জনের বিভীষিকা হইবেন—দূর হইতে নমস্কার্যা হইবেন, কেহই তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে পারতপক্ষে এগোবে না।

ব্যাকরণ যদি একখানি গড়িয়া তুলিতেই হয়, তবে একদিকে সার্বভৌমিক-ব্যাকরণ, আর একদিকে দেশীয় চাষাভূষা এবং অন্তঃপুর মহলের ব্যাকরণ সংক্ষেপে বঙ্গীয় প্রাকৃত ব্যাকরণ, আর একদিকে খাস সংস্কৃত ব্যাকরণ, এই তিন ব্যাকরণের ত্রিবেণীসঙ্গমকে আদর্শ করিয়া একখানি সুপাঠ্য এবং সমীচীন ব্যাকরণ গড়িয়া তোলা হইলে খুবই ভাল হয়, কিন্তু তাহা যতক্ষণ না হইতেছে, ততক্ষণ বঙ্গভাষা বিনা ব্যাকরণে যেমন চলিতেছে, তেমনই আরও কিছুদিন চলুক। উঠন্তি ভাষার কচি বয়সে তাহাকে ভীমার্জুনের পাঁচো হাতিয়ার পরাইয়া ভূতলে পাড়িয়া ফেলা পরামর্শসিদ্ধ নহে। এস্থলে কেহ যদি বলেন যে নেই-মামা অপেক্ষা কানা-মামা ভাল, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি যে, দুর্দান্ত বলদ অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল। ছাত্রদিগের প্রাণবধকারী একটা যা'তা' ব্যাকরণ হওয়া অপেক্ষা, না হওয়া ভাল।

অভিধান সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের সুযোগ্য পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অভিধানের যেরূপ নমুনা আমাদিগকে দেখাইয়াছেন; তাহা অতীব আশাপ্রদ।

এখন বিশ্বকোষকে অভিধান বলিব কি Encyclopedia বলিব সেইটেই হচ্ছে কথা। আমার বিবেচনায় বিশ্বকোষ Encyclopedia-রই সামিল। অভিধানের আকার প্রকার এবং সংগঠনপ্রণালী স্বতন্ত্র। রামকমল ভট্টাচার্য -প্রণীত প্রকৃতিবাদ অভিধানখানি তাহারই মধ্যে দেখিতে শুনিতে ভাল; কিন্তু তাহাতেও আমাদের আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না। আমরা চাই ওয়েব্‌স্টারের মত একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর অভিধান। প্রকৃতিবাদের শব্দ-ভাণ্ডার পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখিলাম যে, চলিতভাষার অনেকগুলি শব্দ তাহাতে নাই। টেঁকন নাই; অথচ আমরা বলি যে বিলাতি-ধুতি বেশী দিন টেঁকে না। চোঁচ শব্দ আছে কিন্তু চোঁচা শব্দ নাই। অথচ আমরা বলি 'চোঁচা দৌড়্'। তাড়ন শব্দ আছে কিন্তু তাড়স শব্দ নাই; অথচ আমরা বলি 'ফাঁড়ার তাড়সে জ্বর হইয়াছে।' চোঙ্গা আছে কিন্তু ঠোঙ্গা নাই। থিতনও নাই। অথচ আমরা বলি 'নদীর জল থিতিয়ে তাহার তলায় পাঁক জমিয়াছে'। থেতনো নাই। ভোঁ নাই অথচ আমরা বলি 'নেশায় ভোঁ হইয়া বসিয়া আছে।' ঠিকরানো নাই; আমরা বলি 'লাবণ্য ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।' ঠ্যাঙ আছে কিন্তু ঠ্যাঙ্গাও নেই, ঠ্যাঙ্গানোও নাই। দমকাও নাই; অথচ বলি 'দমকা বাতাস।' জটলা নাই। যোটক আছে কিন্তু জোটবন্দী নাই—যোগপাট নাই। যোগাড় আছে কিন্তু যোগাড়যন্ত্র নাই। তা ছাড়া, অনেকগুলি শব্দের অনেকগুলি অর্থ মাঠে মারা গিয়াছে। টঙ্ক শব্দের অর্থ দেখিলাম 'পাথর-কাটা অস্ত্র' প্রভৃতি অনেকগুলি অর্থ লিখিত রহিয়াছে, কিন্তু 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি টঙ্ক' এখানে টঙ্ক শব্দের অর্থ কি তাহার কোন উল্লেখ দেখিলাম না। প্রকৃত কথা এই যে, প্রকৃতিবাদ অভিধানখানি নেহাৎ ভট্টাচার্য-অভিধান, তাহা উইল্‌সন্ সাহেবের সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানের একপ্রকারের বাঙ্গালা অনুবাদ। প্রকৃতিবাদের বিশেষ গুণ হচ্ছে সাধু-ভাষার মান্য-গণ্য শব্দগুলির প্রতি যথেষ্ট যত্নসমাদর, আর তাহার মহৎ দোষ হচ্ছে—চলিত কথোপকথনের ব্যবহারোপযোগী দীনহীন শব্দগুলির প্রতি হতশ্রদ্ধা। প্রকৃতিবাদের ঐ বিশেষ গুণটির জন্য উইল্‌সন্ সাহেব আমাদের নিকট বিশিষ্টরূপ ধন্যবাদের পাত্র। আর তাহার ঐ মহৎ দোষটির জন্য তাহার লোকান্তরিত প্রণেতা রামকমল ভট্টাচার্য একাকী দায়ী। প্রকৃতিবাদের ঐ মহৎ দোষটির যদি তাহার পরবর্তী সংস্করণে খণ্ডাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা বঙ্গভাষার দিব্য একটি সর্বাঙ্গসুন্দর অভিধান হয়।

অতঃপর আসিতেছে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাষার পরিভাষা সঙ্কলন। সাহিত্য-পরিষদের এ সঙ্কল্পটি অতি উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু উহাকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে রীতিমত যোগাড়-যন্ত্র আবশ্যক। সাহিত্য পরিষদে আমি একটি বিষয়ের অভাব বড্ড দেখিতেছি—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণীর লোকের অভাব। সংস্কৃত কলেজ আছে, ভাটপাড়া আছে, নবদ্বীপ আছে, বিক্রমপুর আছে। এই সকল পুরাতন খনিতে অনেক প্রশান্ত স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল রত্ন ('Many a jem of purest ray serene') খুঁজিলে হয়ত পাওয়া যাইতে পারে; সে সকল রত্ন খুঁজিয়া পাতিয়া আনিয়া পরিষদের উষ্ণীষে বসানো হয় না কেন? তবে, এটা ঠিক যে, সভার শোভার জন্য রত্নের তেমন আমাদের প্রয়োজন নাই, যেমন সভার কাজের জন্য যত্নের আমাদের প্রয়োজন। মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে কে গুরু কে লঘু, তাহা তৌল করিয়া দেখিবার ক্ষমতা আমাদের নাই; আর, তাহা তৌল করিয়া দেখিবার প্রয়োজনও আমাদের নাই। তাঁহাদের শ্রেণীস্থ কোন সদাশয় ব্যক্তি সাহিত্যসভার কোন্ কাজে লাগিতে পারেন এবং কি হইলে তিনি সে কার্যের নির্বাহ্ পক্ষে বিধিমতে সহায়তা করিতে পারেন, তাহাই কেবল আমাদের জানিবার প্রয়োজন। উহাদের মধ্যেকার দুইটি অভিজাত রত্নের সহিত আমার বহুকালের সৌহার্দ আছে; দুই জনেরই সম্বন্ধে আমি মুক্তকণ্ঠে এবং মুক্তপ্রাণে বলিতে পারি যে, তাঁহারা সাহিত্য-পরিষদের সম্মানিত সভ্য হইলে পরিভাষা-সমিতির এবং আর আর শাখা-সমিতির উপকারে আসিতে পারেন। উভয়েই তাঁহারা সংস্কৃতের অগম্য কৈলাস-শিখর হইতে বাঙ্গালার আসরে নামিয়াছেন; আর সেইটিই তাঁহাদের বিশেষত্ব। এ সম্বন্ধে যদি আপনাদের মধ্যে কাহারও মনোমধ্যে কোনো প্রকার কিন্তু বা সন্দেহ থাকে, তবে তাঁহাদের দুজনের নাম করিলেই সে সন্দেহ তদ্দণ্ডেই তিরোহিত হইয়া যাইবে। একজন হচ্ছেন দর্শনশাস্ত্রের অনুবাদক শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় আর একজন হচ্ছেন রামায়ণের অনুবাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়। এই দুই মহাত্মা নামে শুধু নয় কিন্তু কাজে আমাদের নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছেন, কেননা, উভয়েরই আপন আপন নির্দিষ্ট অধিকার-ক্ষেত্রে বঙ্গভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন।

পারিভাষিক সমিতির যদি রীতিমত কার্য করিবার ইচ্ছা থাকে তবে তাঁহার নিতান্ত কর্তব্য যে, তিনি সুবিধামতে মাঝে মাঝে দিন স্থির করিয়া

সেইদিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সভা আহ্বান পূর্বক তাঁহাদের মধ্যে যিনি যেবিষয়ে বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি-শালী সেই বিষয়ের অধিকারভুক্ত শব্দাদি আয়োজনের ভার তাঁহার হস্তে বিন্যস্ত করেন।

প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহজসাধ্য বিষয় হইতে কার্যারম্ভ করা হোক্—বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বলা হোক্ যে, ভরত যখন সমস্ত পুরবাসী সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন, তখন বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর কারিকর বিশেষ বিশেষ কার্যে ব্যাপৃত হইয়াছিল—এটা তাঁহার অবিদিত নাই; এটাও তাঁহার অবিদিত নাই যে, ঐ সময়ে একদল কারিকর ভরতের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিয়াছিল, আর একদল কারিকর তাঁহার আগে আগে রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার করিতে চলিয়াছিল। সেই সকল বিভিন্ন কারিকর শ্রেণীর ব্যবসায় এবং যন্ত্র-তন্ত্রাদি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ পূর্বক তিনি তাহা বিশদরূপে বিবৃত করিয়া লিখিয়া নির্দিষ্ট দিবসের মধ্যে সমিতির অবগতির জন্য প্রেরণ করুন।

স্মার্তবাগীশ মহাশয়কে বলা হোক যে, মনুর স্মৃতিতে যত-প্রকার ব্যবসায় বাণিজ্য ও সামাজিক কর্মবিভাগের উল্লেখ আছে তাহার তিনি একটা বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া নির্দিষ্ট দিবসের মধ্যে সমিতির জন্য প্রেরণ করুন।

বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে বলা হোক্ যে, প্রত্যক্ষের এবং অনুমানের প্রণালীপদ্ধতি কোন্ দর্শনের মতে কিরূপ; ভাবনা, ভাব, চেতনা, চিত্ত, অনুভূতি, বেদনা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, প্রত্যয়— এই শব্দগুলির তথৈবচ গুণ লক্ষণ ধর্মোপাধি, এই শব্দগুলির বিশেষ বিশেষ দার্শনিক অর্থ কতরূপ? উহাদের লৌকিক এবং দার্শনিক অর্থের মধ্যে ভেদাভেদই বা কতরূপ? কোন কোন স্থলে কাহারই বা কিরূপ প্রয়োগপদ্ধতি? এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর তিনি বিশদরূপে বিবৃত করিয়া লিখিয়া নির্দিষ্ট দিবসের মধ্যে সমিতির অবগতির জন্য প্রেরণ করুন।

ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এইরূপ একটা ষড়যন্ত্রের ঘূর্ণীচক্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার আকর্ষণ বলে নানাদিক দিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশ-কাল-পাত্রের ব্যবহারোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন শব্দের আমদানী হইতে থাকিলে, পারিভাষিক সমিতি সেই সকল কাঁচা সামগ্রীগুলা (raw material-গুলা) সুবিবেচনা-যন্ত্রে চড়াইয়া আবশ্যক মতে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া মাজিয়া ঘষিয়া অথবা যেমন তেমনি অব্যাকৃত রাখিয়া, রচিতব্য

পরিভাষা উপযুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ মতে ধীরে সুস্থে রচনা করিতে পারেন। প্রকৃত কথা এই যে, শ্রমের বিভাজন, অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে Division of Labour, তাহার সাহায্য ব্যতিরিকে কোনো ষড়যন্ত্রিতব্য বৃহৎ কার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। সমিতি সুতা পাইলে কাপড় বুনিতে পারেন কিন্তু সুতা পাকাইতে জানেন না; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবর্গ কাপড় বুননের জন্য সুতা পাকাইতে পারেন, কিন্তু কাপড় বুনিতে জানেন না। দুই দল পৃথক থাকিলে দোঁহারই হস্ত অসাড় হইয়া যায়; দুই দল জোটবদ্ধ হইলে দোঁহারই কার্য সুচারুরূপে চলিতে পারে। সূত্রের অনটন হইলে বস্ত্রবয়ন যেভাবে চলে— পারিভাষিক সমিতির কার্য এক্ষণে সেইভাবে চলিতেছে; অচলভাবে চলিতেছে; অর্থাৎ কিনা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

সাহিত্যের পরিভাষার জন্য উদ্বেগের বিশেষ কোনও কারণ নাই— বিজ্ঞানের পরিভাষাই শক্ত সমস্যা। জ্যোতিষ, দেহতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের অধিকারভুক্ত অনেকগুলি পরিভাষা সংস্কৃত পুঁথি ঘুঁটিয়া বাহির করা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু তেমনি আবার অনেকগুলি পরিভাষা সংস্কৃত-শাস্ত্রের কোথাও অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যাইতে পারে না। শেষোক্ত স্থলে একেবারেই হাল ছাড়িয়া না দিয়া প্রয়োজনীয় পরিভাষা যথাসম্ভব সংস্কৃতানুযায়ী করিয়া লওয়াই পরামর্শসিদ্ধ। Nerve শব্দের দেশীয় প্রতিশব্দ নাই। Nerve-কে ধমনী বলা যাইতে পারে না, যেহেতু ধমনী=Artery; স্নায়ু বলা যাইতে পারে না, যেহেতু স্নায়ু=Tendon। আমি তাই বলি যে, Nerve-কে তৈজস তন্তু এবং Ganglion-কে তৈজসপিণ্ড বলিলে মন্দ হয় না। বেদান্তাদি-শাস্ত্রে সূক্ষ্ম শরীরাবচ্ছিন্ন জীব তৈজস শব্দে উক্ত হয়। Nervous System স্থূল শরীরের তেজোংশ-সম্ভূত একপ্রকার সূক্ষ্ম শরীরের সামিল। সুতরাং তাহা স্বচ্ছন্দে তৈজস শব্দের বাচ্য হইতে পারে। কেহ যদি বলেন যে, না, Nerve তৈজস শব্দে বাচ্য হইতে পারে না, যেহেতু তৈজস-পত্র বলিতে ধাতুময় পাত্র বুঝায় ইহা সকলেরই জানা কথা; তবে তাহার উত্তর এই যে, ধাতু বলিতে সোনা রূপা বুঝায় বলিয়া ধাতুজ্ঞ চিকিৎসক বলিতে সোনারূপাজ্ঞ চিকিৎসক বুঝায় না। Spring বলিতে উল্লম্ফনও বুঝায়; কিন্তু তা বলিয়া ঘড়ির Spring বলিলে ঘড়ির উল্লম্ফনও বুঝায় না—ঘড়ির উৎসও বুঝায় না। তেমনি তৈজসপত্র বলিতে ধাতুময় পাত্র বুঝায় এ কথা সত্য হইলেও শাস্ত্রোক্ত তৈজসজীবনের অর্থ ধাতুময় জীব নয়, অতএব Nerve-কে

তৈজস-তন্তু বলিলে পাছে লোকে ধাতুময় তন্তু বোঝে এরূপ আশঙ্কা, বাতিকের দুর্ভাবনার কোঠায় স্থান পাইবার যোগ্য।

যন্ত্রবিজ্ঞানের পরিভাষা রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে দেশীয় তাঁতী কামার কুমার ছুতার রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি কারকরিদিগের ব্যবসায়ী ভাষার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। যন্ত্র এবং যন্ত্রাঙ্গগুলার দিশী প্রতিশব্দ যেখানে যত পাওয়া যায় সে-গুলা আগে ত খুঁজিয়া পাতিয়া সংগ্রহ করা হোক্, তাহার পরে এ তো জানাই আছে যে, অবশিষ্টগুলার প্রতিশব্দ দেশীয় ভাষার চতুঃসীমার মধ্যে সহস্র মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যাইবে না। কাজেই, শেষোক্ত স্থলে নূতন প্রতিশব্দ সংগঠন করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। যন্ত্রবিজ্ঞানের সামান্য গোটা চার-পাঁচ শব্দ আমি উপস্থিত মতে গড়িয়া নমুনা স্বরূপে আপনাদিগকে দেখাইতেছি; তাহা আপনাদের মনে ধরুক্ বা না ধরুক্—তাহা দৃষ্টে বঙ্গভাষার নূতন সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনাদের কাহারও না কাহারও চক্ষু ফুটিবে, তাহা হইলেই হইল; বর্তমান স্থলে আমার আকাঙ্ক্ষা তাহার অধিক আর কিছুই নহে—

Lever—তোলক

Pendulum—দোলক

Screw—আবর্তক

Spring—প্রস্থাপক

আমার বিবেচনায় রসায়নের অধিকারভুক্ত শব্দগুলির বৈজ্ঞানিক নাম যত কম পরিবর্তন করা যায় ততই ভাল, কেননা রসায়নের অধিকার-ভুক্ত পদার্থ সকলের সাঙ্কেতিক নামের সঙ্গে সমগ্র রসায়ন-বিজ্ঞান এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জড়িত রহিয়াছে যে, পূর্বোক্তের একচুল ইতস্ততঃ হইলেই শেষোক্তের প্রাণে আঘাত লাগে। আমি তাই বলি যে, কার্বনকে কার্বন বলাই ভাল; তবে Sulpher-কে গন্ধক বলিতে দোষ নাই। আমার মনে হইতেছে, আমি যেন ইতিপূর্বে কোথাও Sulphuric Sulphurous এবং Sulphate গন্ধিক গন্ধীয় এবং গন্ধিত বলিয়া উক্ত হইতে দেখিয়াছি; আমার বিবেচনায়—এইরূপ নামকরণ-প্রণালী রসায়নের পরিভাষার পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপযোগী। মোট কথা এই যে, দেশীয় লোকের অবাধে উচ্চারণ করিতে পারে অথচ মূলের সহিত হয় অর্থের নাহয় শব্দের, সর্বাঙ্গীণ না হোক্ অন্ততঃ আংশিক সাদৃশ্য থাকে ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রসায়নের পরিভাষা বিরচিত হইলেই ঠিক হয়।

অতঃপর আসিতেছে—ভাষান্তর হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ প্রকাশ। ভাষান্তর হইতে অনুবাদ খুবই কাজের সামগ্রী যদি না পড়ে ধরা। অনুবাদ যদি অনুবাদ বলিয়া ধরা পড়ে তবে বেচারী জন্মের মতো গেল—বাজে কাগজ-পত্রের ঝুড়ি তাহাকে উদরস্থ করিবার জন্য মুখ-ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। অনুবাদ ষোল আনা মাত্র অনুবাদ হইবে অথচ তাহা অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকটে ঘুণাক্ষরেও অনুবাদ বলিয়া ধরা পড়িবে না; এই সুকঠিন ব্রতটি উদ্‌যাপন করিতে না পারিলে কোন অনুবাদই কোন কার্যের হয় না। অনুবাদের উভয় সঙ্কট। (১) অনুবাদই যদি মূলের অবিকল প্রতিবিম্ব না হয়, তবে তাহা অনুবাদ না—তাহা অন্যথাবাদ! আবার, (২) অনুবাদ যদি আপনাকে মূলের অবিকল প্রতিচ্ছবি করিতে গিয়া বিদেশীয় ঢঙের স্বদেশীয় ভাষার সং সাজিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে তাহা অনুবাদ না—তাহা হনুবাদ। এইরূপ ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর। যাহারা অনুবাদ-কার্যে বিশিষ্টরূপ নৈপুণ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের নিতান্ত কর্তব্য যে তাঁহারা দেশীয় প্রচলিত কথোপকথনের ভাষা এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃত গন্ধের ভাষা এই দুই পিতা পুত্র ভাষার হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দুইয়ের অন্তর্নিহিত অন্ধি-সন্ধি এবং খোঁচ-খাঁচগুলা ঠাওর করিয়া সমঝিয়া দেখেন। অধিকন্তু সেই সঙ্গে ইংরাজী এবং সংস্কৃতের মধ্যে যে যে অংশ প্রথা-সাদৃশ্য আছে, সেই সেই অংশ যদি খোঁচাইয়া তুলিয়া আলোকে বাহির করিতে পারেন তবে সোনায় সোহাগা হয়। সংস্কৃত এবং ইংরাজীর মধ্যে মূলগত প্রথা-বৈষম্য আমরা যতটা মনে করি বাস্তবিক তাহা ততটা না হইতে পারে। অনেক স্থলে সংস্কৃত ভাষার সহিত ইংরাজী ভাষার মর্ম-স্থানীয় ঐক্য দেখিয়া দর্শকের তাক লাগিয়া যায়। না হইবেই বা কেন? ধরিতে গেলে ইংরাজী ভাষা সংস্কৃত ভাষার বহিন ঝি, যেহেতু গ্রীক এবং লাটিন ভাষা সংস্কৃত ভাষার ছোট ভগ্নী। ইংরাজী এবং সংস্কৃতের মৌলিক প্রথা-সাদৃশ্য অনেক স্থলে আমার চক্ষে পড়িয়াছে; যখনি যখনি চক্ষে পড়িয়াছে, তখনি তখনি যদি আমি তাহা টুকিয়া রাখিতাম, তাহা হইলে আর কোনো গোল থাকিত না; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই সেই সময়ে আমার মন অন্যবিধ চিন্তায় নিবিষ্ট থাকাতে দুই ভাষার প্রথা-সাদৃশ্যের দৃষ্টান্তগুলি আমি টুকিয়া রাখিতে অবসর পাই নাই, এক্ষণে তাই সেগুলির পোনেরো আনা অংশ আমার স্মরণ হইতে সরিয়া

পলাইয়াছে। কি করি, নিরুপায়! তথাপি একেবারেই হাল ছাড়িয়া না দিয়া, সেই পলাতকা মহলের যৎসামান্য অধিবাসী যাহারা কোটরের মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া এখনো পর্যন্ত ভিটা আঁকড়িয়া আছে,—নমুনা স্বরূপে সেই দুই একটিকে আপনাদের নয়নগোচরে টানিয়া আনিয়া "মধ্বাভাবে গুড়ং দত্যাৎ" রকমে জো-সো করিয়া কাজ সারি।

একজন আপাত-দর্শী গ্রন্থ-সমালোচক সহসা মনে করিতে পারেন যে, 'অন্ধশক্তি' কথাটি Blind Force-এর অনুকরণ মাত্র। তাহা যদি তিনি মনে করেন, তবে সেটি তাঁর বড়ই ভুল। সাংখ্যদর্শনের জগতের আদ্যাশক্তি (মূল প্রকৃতি) বারম্বার অন্ধের সহিত উপমিত হইয়াছে। তাছাড়া, শরীর ভাষ্যে স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে যে, জ্ঞানশূন্যা প্রকৃতিকে জগতের মূল কারণ বলিলে 'জগদান্ধ্যং প্রসজ্যেত' জাগদান্ধ্য দোষ পড়ে অর্থাৎ সমস্ত জগৎ অন্ধভাবে চালিত হইতেছে এইরূপ একটা অসঙ্গতি দোষ পড়ে। যদি একটাকে আরেকটার অনুকরণ বলিতেই হয়, তবে অন্ধ শক্তিকে Blind Force-এর অনুকরণ বলা অপেক্ষা Blind Force-কে অন্ধ প্রকৃতির অনুকরণ বলা অধিক যুক্তি-সঙ্গত, যেহেতু সাংখ্যদর্শনের অন্ধ প্রকৃতি-বাদ ইংরাজী সাহিত্যের জন্মিবার বহু পূর্বে আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য তাঁহার বিরচিত কোনো গ্রন্থের কোনো এক স্থানে প্রসঙ্গ-ক্রমে বলিয়াছেন 'দ্বৈতং ন সহতে শ্রুতি' শ্রুতি দ্বৈত সহেনা; ইহার জুড়ি ধাঁচার একটি কথা ইংরাজিতে এইরূপ পাওয়া যায় যে, অমুক কথা does not bear scrutiny অর্থাৎ অমুক কথা অনুসন্ধান সহে না। ইংরাজি এবং সংস্কৃত উভয় স্থলেই 'সহে না' কথাটার ভাবার্থ অবিকল সমান। অন্ধে জৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ; অন্ধ কর্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায়! ইংরাজি ভাষার ইহার অবিকল জুড়ি বচন সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়— One blind man leading another। এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে সংস্কৃত ইংরাজীর সৌসাদৃশ্যের টানা জালে ভাষার একটু-আধটু খোঁচখাঁচ পর্যন্তও এড়ায় নাই।

বিভীষণ যখন রাবণকে অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে রামকে সীতা প্রত্যর্পণ করাই সর্বতোভাবে শ্রেয়, তখন রাবণ বলিলেন 'আমি ভাঙিয়া যাইতে পারি কিন্তু নত হইতে পারি না' I can

break but cannot bend। বাল্মীকি বলিয়াছেন তাই রক্ষা— আমরা যদি কেহ প্রসঙ্গক্রমে ঐ কথাটি কোথাও লিখিতে সাহস করিতাম তবে নিশ্চয়ই তাহা সমালোচকের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়া ইংরাজী অনুকরণের কোটায় সজোরে নিক্ষিপ্ত হইত।

সংস্কৃত তো আমাদের পৈতামহী ভাষা, আমাদের সাক্ষাৎ মাতৃভাষার সঙ্গেও ইংরাজী ভাষার পুরাতন সম্পর্ক-সূত্র ছোটোখাটো উপন্যাসের আড়ালে আব্ডালে এখনো পর্যন্ত উঁকিঝুঁকি দিতে ছাড়ে নাই। বলিলে আপনারা হাসিবেন—একটি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী রাক্ষসের উপন্যাসে আছে Fi fo fee fum ! I smell the blood of an Englishman। ইহার জুড়ি আমি আমার নিতান্ত শৈশবাবস্থায় নিদ্রা যাইবার পূর্বক্ষণে ধাত্রীর মুখে কতবার যে শুনিয়াছি তাহার ওর নাই। এখনকার কালের বালকেরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে, এইজন্য আমি সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছি না যে, সভাস্থ সকল ব্যক্তিই সেই ঔপন্যাসিক শ্লোকটি জানেন, তবে এটা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমার বয়সী সভাস্থজনের কাহারও নিকটে তাহা অবিদিত নাই; সেটি হচ্ছে 'হাঁউ মাউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ'। Fi Fo Fee Fum = ইংরাজী হাঁউ মাউ খাঁউ; আর I smell the blood of an Englishman = ইংরাজী 'মানুষের গন্ধ পাঁউ'। আঙ্গালা মুলুক পৃথিবীর উত্তর-পশ্চিম কোণে—বাঙ্গালা মুলুক পৃথিবীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে; দুই কোণের দুই ছেলে-ভুলানিয়া গল্পের মধ্যে অমনতর একটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ সৌসাদৃশ্য কম আশ্চর্যের বিষয় নহে। আবার, পোনেরো আনা সৌসাদৃশ্যের আড়াল হইতে এক আনা বৈসাদৃশ্য যাহা উঁকি দিতেছে সেটা আরো চমৎকার! ইংরাজ রাক্ষস 'মানুষের গন্ধ পাঁউ' বলিতেছে না। বলিতেছে 'I smell the blood of an Englishman'—English রক্তের গন্ধ পাঁউ! দেখিয়াছেন ব্যাপার!

দুই জাতির দুই ভাষার মধ্যে এইরূপ নিগূঢ় প্রথা-সাদৃশ্য শুধু দেখিলে কি হইবে? তাহা হইতে কাজ আদায় করিতে চেষ্টা করা হোক্। যে যে স্থানে ইংরাজী ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার মূলগত সাদৃশ্য আছে, সেই সেই স্থানে সংস্কৃত ভাষাকে আদর্শ করিয়া দেশীয় ভাষার পুষ্টি সাধন করা হোক্; তাহাতে ভাষার সৌন্দর্য এবং বলবিক্রম বাড়িবে বই কমিবে না।

আর একটি এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, স্থলবিশেষে সাধুভাষা অপেক্ষা চলিত কথোপকথনের ভাষা মন্তব্য প্রকাশের পক্ষে বেশী কার্যকরী হয়। কেহ যদি

বলে যে, 'অমুক কথাটার বন্ধন শিথিল' তবে সে-বাক্যটির অর্থ উহারই মধ্যে একটু কষ্ট করিয়া বুঝিতে হয়; কিন্তু তাহার পরিবর্তে সে যদি বলে যে, 'অমুক কথাটার বাঁধুনি আল্‌গা' তবে তাহার অর্থ বুঝিতে শ্রোতার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না। আমার বিশ্বাস এই যে, বাঙ্গালা ভাষার ত্রিসীমার মধ্যে একটিও সাঁওতালী ভাষার বা অন্য কোনো জঙ্গলী ভাষার শব্দ নাই। 'আল্‌গা' শব্দ শুনিলে হঠাৎ মনে হয় যে, সংস্কৃত ভাষার সহিত মূলে তাহার কোনো সম্পর্ক নাই; অথচ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, তাহা অলগ্ন শব্দের অপভ্রংশ; তার সাক্ষী অলগ্ন=অলগ=আল্‌গা। অনেক সময়ে সাধু ভাষার ত দ চলিত ভাষায় ট ড মূর্তিধারণ করে, তার সাক্ষী কর্তনের ত=কাটনের ট; বৃন্তের ত=বোঁটার ট; দলনের দ=ডলনের ড; দন্তের দ ত=ডাঁটার ড ট; কোমল শাকের কঠিন ডাঁটা—কোমল ওষ্ঠ-সংলগ্ন; কঠিন দন্তের সহিত উপমেয়। এরূপ, যখন তখন লিপ্তের ত যে, লপেটের ট হইবে তাহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। গেঞ্জিফরাক্‌ গায়ে লপেট্ হইয়া রহিয়াছে বলাও যা, আর লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে বলাও তা, একই। অনেক স্থলে সাধুভাষার র চলিত ভাষায় ল মূর্তি ধারণ করে; তার সাক্ষী চক্রের র-ফলা=চাক্‌লা এবং Circle-এর ল-ফলা। কাপড় এবং কাপ্‌ড়া শব্দ স্পষ্টই কর্পট শব্দ হইতে আসিয়াছে। যেমন কর্কট=কাঁকড়া; তেমনি কর্পট=কাপ্‌ড়া। তার সাক্ষী সংস্কৃত কাদম্বরী গ্রন্থের একস্থানে আছে—কর্পটাবগুণ্ঠিত অর্থাৎ বস্ত্রাবগুণ্ঠিত। মাঝের রেফ্‌ কখনো-বা শেষের র হয়, কখনো-বা শেষের ড় হয়। তার সাক্ষী দীর্ঘের রেফ্‌=ডাগরের র এবং দীঘলের ল। বর্ধনের রেফ্‌=ঝাড়নের ড়। শেষের র-ফলা কখনো বা মাঝের রেফ্‌ হয়, কখনো বা মাঝের ড় হয়; তার সাক্ষী—চক্র শব্দের শেষের র-ফলা রেফ্‌ হইয়া চর্কা এবং Circle-এর মাঝে বসিয়াছে, ও ড় হইয়া চড়ক শব্দের মাঝে বসিয়াছে। ঠাণ্ডা শব্দ স্পষ্টই স্নিগ্ধ শব্দ হইতে আসিয়াছে; তার সাক্ষী স্নিগ্ধ=থিন্দ=ঠাণ্ডা। ঠাওর শব্দ স্পষ্টই স্থাবর শব্দ হইতে আসিয়াছে; তার সাক্ষী—দেবর=দেওর, স্থাবর=ঠাওর। 'এই বস্তুটাকে ঠাওর করিয়া দেখ,' অর্থাৎ চক্ষের সম্মুখে স্থিরভাবে দাঁড় করাইয়া দেখ। কুল্য শব্দের নানা অর্থ অভিধানে লিখিত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে একটি অর্থ—আমরা যাহাকে বলি কুলো। ঢেঁকি শুনিলে সহজে মনে হয় যে, নিশ্চয়ই তাহা সাঁওতালদিগের নিকট হইতে ধার করিয়া পাওয়া। আমার কিন্তু মনে

হয় যে, তাহা ধক্ক ধাতু হইতে আসিয়াছে। ধক্ক ধাতুর অর্থ ধাক্কা দেওয়া। ধক্ক ধাতু হইতে ধক্কী আসিয়াছে, আর ধক্কী হইতে ঢেক্কী আসিয়াছে। ঢেঁকি ধাক্কা প্রদান করে এই অর্থে ধক্কী। যদি বল যে, ধক্কী হইতে ঢেঁকি আসিবে কিরূপে? তবে তার উত্তর এই যে, যা'র তা'র গায়ে চন্দ্রবিন্দু এবং সানুনাসিক বর্ণের যোজনা (প্রাচীন বিধবা রমণীর ন্যায় যখন তখন বিনা কারণে নাকি স্বরে কান্না) বঙ্গভাষার একটি চিরকেলে কু-অভ্যাস! কাচ যখন কাঁচ হইতে পারিল, কর্কট যখন কাঁকড়া হইতে পারিল, আকর্ষণ যখন আঁকড়ানো হইতে পারিল, হাসি যখন হাঁসি হইতে পারিল, ময়ূরপক্ষী যখন ময়ূরপঙ্খী হইতে পারিল, তখন ধক্কী যে ঢেঁকী হইতে না পারিবে কেন তাহাই জিজ্ঞাস্য।

বাবা এবং মা শব্দ সংস্কৃত বাব এবং মাম শব্দ হইতে আসিয়াছে; ইংরাজী Pappa Mamma-ও তাই। বাঙ্গালী দাদা এবং ইংরাজী Dad দুইই সংস্কৃত তাত শব্দের অপভ্রংশ। আমরা বলি ঠাকুরদাদা, ইংরেজরা বলে Grand Dad। বেটা শব্দ ইংরাজী Pet শব্দের সহোদর। Max Muller -এর একটি গ্রন্থে আমি দেখিয়াছিলাম যে, এক জাতীয় আধুনিক ইউরোপীয় আর্যভাষায় (কোন্ জাতীয় তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না) দুহিতাকে বলে Dsi। Max Muller যদি জানিতেন যে, আমাদের দেশে দুহিতার আর-এক নাম ঝি, তবে তিনি কত-না জানি আনন্দিত হইতেন। সংস্কৃত দুহিতা হইতে প্রাকৃত ধীদা হইয়াছে এটা জানা কথা। পুত্র যেমন পো, ধীদা তেমনি ধী, বন্ধ্যা যেমন বাঁঝা, ধী তেমনি ঝি।

আমি আমার 'উপসর্গ বিচার' নামক প্রবন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে দেখাইয়াছি যে, মার্জ্য হইতে মেজে হইয়াছে; দল্য হইতে চাল-ডালের ডাল হইয়াছে; দারু-পল্লব হইতে ডাল-পালা হইয়াছে; পর্যায় হইতে পালা হইয়াছে; ইত্যাদি।

সংস্কৃত ভাষার এইরূপ নদীর ন্যায় বিচিত্র নিম্নগতি দেখিয়া বহুকাল যাবৎ আমার চক্ষু ফুটিয়াছে; তাই আমি আজ সমস্ত সভার সমক্ষে এ কথা বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেছি না যে, বঙ্গীয় প্রাকৃত শব্দগুলিকে বর্বর ভাষা বলিয়া উপেক্ষা করা নিতান্তই অজ্ঞ লোকের কার্য; যেহেতু সেগুলা প্রকৃত পক্ষেই সংস্কৃতের সন্তানসন্ততি।

ইংরাজী কথা বাঙলায় অনুবাদ করিবার বিহিত প্রণালী কিরূপ তাহা যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে তাহার সন্ধান আমি আপনা-

দিগকে দুই কথায় বলিয়া দিতে পারি ; তাহা এই যে, যে পর্যন্ত অনুবাদিত বচনটি ভাবাংশে মূলের মতো, আর, ভাষাংশে মনের মতো না হয়, সে পর্যন্ত তাঁহাকে হস্ত হইতে নিষ্কৃতি না দেওয়া। এইরূপ প্রণালীতে অনুবাদের নদী সন্তরণ করিয়া আমি অনেকানেক স্থলে কূল প্রাপ্ত হইয়াছি, তবে মাঝপথে হাবুডুবু খাইয়াছিও বিস্তর। প্রস্তাবিত প্রণালীর গোটা কত দৃষ্টান্ত আমি নমুনা-স্বরূপে আপনাদিগকে দেখাইতেছি, তাহা হইলেই তাহার ফলদায়কতা এবং কার্যকারিতা বিশিষ্টরূপে আপনাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আমার কোন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অনেক কাল হইল আমাকে একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন যে, Centripetal এবং Centrifugal force তিনি অনুবাদ করিয়াছেন—কেন্দ্র-বর্তিনী এবং কেন্দ্র-বর্জিনী শক্তি। আমি দেখিলাম ঐ অনুবাদটি ভাবাংশে যদিচ মূলের অবিকল অনুরূপ কিন্তু ভাষাংশে 'ইংরাজী অনুবাদ' এই বৃত্তান্তটি উহার গায়ে টিকিট মারা রহিয়াছে ; আমি তাই উহাকে ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া করিলাম 'কেন্দ্রানুগা এবং কেন্দ্রতিগা শক্তি'।

'Organized labour' এ বচনটির অনুবাদ আমার বিবেচনায় 'যন্ত্রবদ্ধ পরিশ্রম' হইলে মন্দ হয় না। Organ = যন্ত্র ; Organization = যন্ত্রবন্ধন ; Organized = যন্ত্রবদ্ধ ? 'যন্ত্রবন্ধন' কথাটাকে আপনারা যতটা ইংরাজী অনুকরণ ঠাওরাইতেছেন—বাস্তবিক উহা ততটা নহে। ষড়যন্ত্র শব্দটা ডাহা সংস্কৃত। তাছাড়া, আমরা সচরাচর কথায় বলি 'অমুক কার্যটি যোগাড়যন্ত্র করিয়া করা চাই'। যোগাড়যন্ত্র করা আর Organize করা দুয়ের মধ্যে অতি অল্পই প্রভেদ। কিন্তু তা বলিয়া Organic Chemistry-র অনুবাদ 'যান্ত্রিক রসায়ন' করিলে চলিবে না। কেননা Organic Chemistry এ বচনটিতে Organ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি, এক কথায়—শরীর। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে—শরীর বলিতে এখানে বিজ্ঞানশাস্ত্রের মতানুযায়ী ব্যাপক অর্থে গৃহীতব্য। বিজ্ঞানশাস্ত্রের মতে উদ্ভিদ্ পদার্থেরও শরীর আছে, জলপান করিবার জন্য তাহার মুখ আছে—কী ? না—শিকড়গুলা। আলোক গ্রহণ এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নির্বাহের জন্য তাহার চক্ষু নাসিকা আছে ; —কী ? না পত্রের ত্বকে ছিদ্রগুলা। গর্ভাধানের জন্য পৃথক পৃথক অঙ্গ আছে ; —কী ? না পুষ্পের কেশর এবং বীজকোষাদি। আমার বিবেচনায় তাই Organic Chemistry-র অনুবাদ শারীরক রসায়ন হইলে ভাল হয়।

শারীরিক নহে—শারীরক। মহর্ষি ব্যাস তাঁহার প্রণীত বেদান্ত সূত্রের নাম শারীরক সূত্র দিয়াছেন কেন, তাহা আমি ঠিক জানি না ; আমার বোধ হয়—'শরীরের অভ্যন্তরে পঞ্চকোষ এবং পঞ্চকোষের অভ্যন্তরে আত্মা' এই কথাটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার গ্রন্থের ঐরূপ নাম দিয়াছেন। আমি তাই বলি যে, মহতের ঐ দৃষ্টান্তটি অনুসরণ করা হোক্—Organic Chemistry জীবশরীরের রসরক্তাদির এবং উদ্ভিদ্-শরীরের নির্যাসাদির মৌলিক উপাদান-সকলের তত্ত্ব নির্ণয়কার্যে ব্যাপৃত থাকে বলিয়া তাহার নাম দেওয়া হোক 'শারীরক রসায়ন'। তা ছাড়া এটি শুনিতেও শুনায় ভাল যে, Inorganic Chemistry ভৌতিক রসায়ন ; Organic Chemistry—শারীরক রসায়ন।

Theory-শব্দের কেহ কেহ অনুবাদ করেন উৎপত্তি ; এবং Theoretical শব্দের অনুবাদ করেন ঔপত্তিক। বিষম বিভ্রাট! Theory শব্দের অনুবাদ সম্বন্ধে ওরূপ একটা নির্ঘাত বিচার নিষ্পত্তি করিবার পূর্বে অনুবাদকের উচিত ছিল—উপপত্তিকে ইংরাজীতে বাস্তবিক কি বলে তাহা একটিবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা। ন্যায়শাস্ত্রের প্রকরণের উপপত্তির ঠিক উল্টাপিঠ হচ্ছে বিপ্রতিপত্তি। 'অগ্নির সংস্পর্শে শরীর শীতল হয়' এইরূপ একটা অযৌক্তিক কথা উক্ত হইলে, সে কথার মধ্যে অগ্নির সংস্পর্শ এবং শৈত্যের উৎপাদন এই দুয়ের বিরোধ যাহা দৃষ্ট হয়, তাহারই নাম বিপ্রতিপত্তি। পক্ষান্তরে 'অগ্নির সংস্পর্শে শরীর দগ্ধ হয়' এইরূপ একটা সম্ভবপর কথা উক্ত হইলে, সে-কথার মধ্যে অগ্নির সংস্পর্শে এবং দাহের উৎপাদন এই দুয়ের সুসঙ্গতি যাহা দৃষ্ট হয় তাহারই নাম উপপত্তি। সংস্কৃত ভাষায় 'উপপন্নমেতৎ' এবং 'সঙ্গতমেতৎ' এ দুই বাক্যের অর্থ অবিকল সমান। অতএব এটা স্থির যে, উপপত্তিকে ইংরাজীতে Theory বলে না—ইংরাজীতে বলে agreement between the subject and predicate। Theory বলে কাহাকে? নিউটন্ যখন গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিলেন যে, জড়পিণ্ড সকল পরস্পরকে স্ব স্ব পরমাণুপুঞ্জের সম পরিমাণে এবং দূরত্বের বর্গফলের বিপরীত পরিমাণে আকর্ষণ করে, তখন তাঁহার সেই কথাটি theory of gravitation বলিয়া পণ্ডিত-মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। মৎস্যের যেমন দুইটি অন্ত—ল্যাজা এবং মুড়া ; বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-প্রণালীর তেমনি দুইটি অন্ত—দৃষ্ট অন্ত এবং সিদ্ধ

অন্ত। দৃষ্টান্তগুলো—কাঁচা সামগ্রী raw materials; সেই কাঁচা সামগ্রীগুলাকে বিশেষ এক প্রকার সাধনের উনানে চড়াইয়া সিদ্ধ করিলেই তাহা সিদ্ধান্তে পরিণত হয়; সে সাধন কি? না, ব্যাপ্তি-সাধন, ইংরাজীতে যাহাকে বলে Generalisation। যাহা দেখা যায়, শুনা যায়, তাহাই দৃষ্টান্ত; আর দেখাশুনা বৃত্তান্তের ব্যাপ্তি সাধন করিয়া অর্থাৎ Generalisation করিয়া যাহা স্থির করা যায় বা স্থাপন করা যায় তাহাই সিদ্ধান্ত। গোরু রোমন্থন করে (অর্থাৎ জাবর কাটে), ছাগল রোমন্থন করে, হরিণ রোমন্থন করে, ইহা আপামর সাধারণ সকল লোকেরই দেখা কথা, আর তাহা দেখা কথা, দৃষ্ট কথা, তাই দৃষ্টান্ত শব্দের বাচ্য। পক্ষান্তরে 'শৃঙ্গী মাত্রেই রোমন্থক' এটা দৃষ্ট কথা নহে; যেহেতু জগতের সমস্ত শৃঙ্গী জন্তুকে (ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্ত শৃঙ্গী জন্তুকে) কেহই চক্ষে দেখে নাই, দেখিবেও না। গোরু রোমন্থন করে, হরিণ রোমন্থন করে এ কথা সবাই জানে—চাষাভূষারাও জানে; কিন্তু শৃঙ্গী 'রোমন্থক' এই পণ্ডিতের সিদ্ধান্তটি পণ্ডিতেরাই অনুমোদন করেন—ইহাতে চাষাভুষা লোকের দন্তস্ফুট হয় না। এই জন্য গৌতম সূত্রের ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে, 'ইদং ইত্থ ভূতঞ্চ ইত্যভ্যনুজ্ঞায়মানং অর্থ জাতং ... ... সিদ্ধান্তঃ'। 'এই বটে' 'এই প্রকার বটে' এইরূপ সম্মতিসূচক বাক্যে যাহা পণ্ডিতগণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হয় অর্থাৎ অনুমোদিত হয়, তাহাকেই সিদ্ধান্ত করা যায়। 'Newton Gravitationএর theory সংস্থাপন করিয়াছিলেন' এ কথার অর্থ এই যে, তিনি বিহিত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা—তাহা পণ্ডিতগণ অনুমোদনোপযোগী করিয়া গড়িয়াছেন। অতএব Newtonian theory-র অনুবাদ আমরা সচ্ছন্দে করিতে পারি—নিউটনের সিদ্ধান্ত। তা যেন হইল—এটা যেন বুঝিলাম যে, theory = সিদ্ধান্ত; কিন্তু theoretical শব্দের অনুবাদ তুমি কি করিবে? ইহার উত্তর এই যে theoretical শব্দের অনুবাদ আমি করি সাংসিদ্ধিক। সৈদ্ধান্তিক সাংসিদ্ধিক দুয়ের তাৎপর্যার্থ যদিচ একই কিন্তু দুয়ের মধ্যে সাংসিদ্ধিক শব্দটিকে আমি পছন্দ করি এই জন্য, যেহেতু সাংসিদ্ধিক শব্দ পুরাকাল হইতে আমাদের দেশের পণ্ডিত-মহলে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশীয় ভাষায়, সাংসিদ্ধিক সত্য (theoretical truth) তত্ত্বশব্দের বাচ্য। তার সাক্ষী উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব বলিলে বুঝায়—উদ্ভিদ্ বিষয়ক স্থির সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ কিনা পাকা বৈজ্ঞানিক

সিদ্ধান্ত বা প্রামাণিক সিদ্ধান্ত। আমি তাই Practical Science এবং Theoretical Science এই বাক্য যুগলের অনুবাদ করি ব্যাবহারিক[১] বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং তাত্ত্বিক বিজ্ঞানশাস্ত্র। Theoretically জার্মান-সিল্বর্ রুপো নহে কিন্তু Practically তাই রুপোরই সামিল এ কথাটির আমি পুরোপুরি বাঙ্গালা অনুবাদ করি এইরূপ যে তত্ত্বতঃ জার্মান-সিল্বর্ রুপো নহে কিন্তু ব্যবহারতঃ তাহা রূপোরই সামিল।

Morality-র অনুবাদ নীতি করিলে দুই এক স্থলে তাহা জো-শো করিয়া চলিতে পারে কিন্তু সকল স্থলেই তাহা সংলগ্ন হয় না, অধিকাংশ স্থলেই তাহা সংলগ্ন হয় না; যেহেতু ধর্ম স্বতন্ত্র, নীতি স্বতন্ত্র। চাণক্যের নীতিশাস্ত্রে বলে 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ', শঠের প্রতি শঠতাচরণ করিবে; মনুর শাস্ত্রে বলে 'ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ', পাপীর প্রতি পাপাচরণ করিবে না। নীতিশাস্ত্রের বচন নীতিশাস্ত্রেই শোভা পায়; ধর্মশাস্ত্রের বচন ধর্মশাস্ত্রেই শোভা পায়, দুয়ের মধ্যে সাদা কালোর প্রভেদ। রাজধর্ম রাজাকে সদুপায় অবলম্বনপূর্বক প্রতিপালন প্রভৃতি সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিতে বলে; রাজনীতি রাজাকে সৎ বা অসৎ যে কোন উপায়ে রিপুদমন প্রভৃতি প্রয়োজন কার্য অবিতর্কিত চিত্তে নিষ্পাদন করিতে বলে। ধর্মের সীধা পথ আর নীতির পেঁচাও পথ—দুয়ের প্রভেদ অস্বীকার করা যায় না। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে, সেটি এই যে, Honesty is the best policy ধর্মানুমোদিত নীতিই প্রকৃত নীতি; এইরূপ বিবেচনায় আমরা নীতি বলিতে প্রধানতঃ ধর্মনীতি বুঝি, আর উচিতও সেইরূপ বোঝা; ধর্মনীতি কি, না, ধর্মানুমোদিত নীতি—Moral maxim

ধর্মতত্ত্ব—Moral Science

ধর্মনীতি—Moral Maxim

নীতি বলিলে আমরা প্রধানতঃ ধর্মনীতি বুঝি বলিয়া moral training-এর অনুবাদ করি নৈতিক শিক্ষা। ধর্মনীতিই হচ্ছে প্রকৃষ্ট নীতি অর্থাৎ নীতি Par

---

১ সম্প্রতি আমি একজন নব্য এম. এ উপাধিধারী বঙ্গ যুবকের লেখনী দিয়া ব্যবহারিক শব্দের পরিবর্তে ব্যাবহারিক শব্দ অনর্গল বাহির হইতে দেখিয়া অবাক হইয়াছি। তিনি "শারীরিক" লেখেন না—লেখেন "শারিরীক" "মানসিক" লেখেন না—লেখেন 'মনসিক', কেবল ব্যাবহারিকের বেলা লেখেন ব্যবহারিক।

excellence এই জন্য moral trainingকে—নৈতিক শিক্ষা প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে কিন্তু তা বলিয়া ধর্ম আর নীতি দুইই যে এক তাহা নহে। কর্ম যেমন কৃ ধাতু হইতে আসিয়াছে ধর্ম তেমনি ধৃ ধাতু হইতে আসিয়াছে। যাহা করিতে হয় তাহাই কর্ম, যাহা ধরিয়া থাকিতে হয় তাহাই ধর্ম, Morality এবং Religion দুইটি দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকিবার বস্তু তাই দুইই ধর্ম শব্দের বাচ্য, প্রভেদ কেবল এই যে—

Religion—Doctrinal ধর্ম

Morality—Practical ধর্ম

Religionকে বিশ্বাসে ধরিয়া থাকিতে হয়

Moralityকে কার্যে ধরিয়া থাকিতে হয়

প্রকৃত কথা এই যে, Moralএর অনুবাদ জায়গা বুঝিয়া সুবিবেচনা মতে করা কর্তব্য। Moral Courage এবং Physical Courage-এর মধ্যে প্রভেদ এই যে, Moral Courage সাধুর লক্ষণ, Physical Courage বীরের লক্ষণ; Moral Courage সত্ত্বগুণ প্রধান, Physical Courage রজোগুণ প্রধান। ঐ দুই ইংরাজী বাক্যের আমি তাই অনুবাদ করি—সাত্বিক সাহস এবং রাজসিক সাহস। 'I am morally sure এটা অমুক ব্যক্তির কাজ' ইহার অনুবাদ আমি করি 'আমার অন্তরাত্মা বলিতেছে ওটা অমুক ব্যক্তির কাজ।' 'ইনি Physically weak but morally strong' ইহার অনুবাদ আমি করি—'ইহার শরীর দুর্বল কিন্তু অন্তরাত্মা সবল'।

প্রসঙ্গাধীনে আমি স্বদেশীয় নব্যকৃতবিদ্য লেখকগণকে অনুনয় বিনয় করিতেছি যে, কতকগুলি ভাষাজ্ঞানবর্জিত নব্য লেখকের দেখাদেখি তাঁহারা যেন বিবেক শব্দের অর্থ মুচড়াইয়া তাহাকে Conscience করিয়া গড়িয়া না তোলেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য তাঁহার শারীরকভাষ্যে, মহর্ষি কপিল তাঁহার সাংখ্যদর্শনে, পতঞ্জলি ঋষি তাঁহার যোগশাস্ত্রে, বিবেক শব্দের ভূয়ো ভূয়ো উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উঁহাদের কেহই একটিবার ভুলক্রমেও ঐ শব্দটি এরূপ স্থানে সন্নিবেশিত করেন নাই—যে স্থানের ত্রিসীমার মধ্যে—Conscience অর্থের বিন্দুবিসর্গেরও ছায়া কোনো অংশে বা কোনো ভাবে বা কোনো হিসাবে প্রকাশ করিতে পারে। ঐ সকল শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রকারেরা সকলেই এক বাক্যে বিবেক শব্দের এইরূপ অর্থ করেন যে, উহা বিবিক্ত করে discriminate করে, অনাত্মার সংস্পর্শ হইতে আত্মাকে বিবিক্ত করে, প্রকৃতির সংস্পর্শ হইতে সত্যকে বিবিক্ত করে, অসত্যের সংস্পর্শ

হইতে সত্যকে বিবিক্ত করে, এই অর্থে বিবেক। বিবেকের এইরূপ সর্ববাদিসম্মত প্রকৃত অর্থটি (Discriminating faculty এই অর্থটি) উল্টাইয়া দিয়া তাহাকে Conscienceএর অনুবাদকার্যে লাগান বড় যে ভাল কাজ তাহা নহে; তাহা এক প্রকার দিনে-ডাকাতি। কেননা সবাই জানে যে, বিবেকের অর্থে Discriminating faculty অথচ আমি তাহার অনুবাদ করিতেছি Conscience, এরূপ করিলে অত্যন্ত অবৈধ কার্য করা হয়— মধ্যাহ্ন দিবালোকে একজনের কণ্ঠের হার বলপূর্বক অপহরণ করিয়া তাহা আর একজনের কণ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। Conscienceএর দেশীয় প্রতিশব্দ কি—তাহা যদি সত্যই আপনারা জানিতে ইচ্ছা করেন তবে আমাদের দেশের পুরাতন পিতামহ শ্বেতশ্মশ্রু মনু কি বলিতেছেন তাহার প্রতি একটিবার শ্রদ্ধার সহিত কর্ণপাত করুন। তিনি তাঁহার সংহিতার ১৬১ শ্লোকে বলিতেছেন—

যৎকর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য-স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীতে বিপরীতং তু বর্জয়েৎ ॥

যে কর্ম করিলে তোমার অন্তরাত্মা পরিতুষ্ট হয়, তাহাই যত্ন সহকারে করিবে—তাহার বিপরীত কর্ম পরিবর্জন করিবে। অন্তরাত্মা পরিতুষ্ট হওয়াও যা, আর Conscience Satisfied হওয়া তা, দুয়ের মাঝে এক তিলও প্রভেদ নাই। এটা স্থির যে, Conscienceএর দেশীয় প্রতিশব্দ বিবেক নহে—Conscienceএর দেশীয় প্রতিশব্দ অন্তরাত্মা। কর্ণ যেমন শাব্দিক বাক্য শুনিবার বাহেন্দ্রিয়, অন্তরাত্মা তেমনি অন্তর্যামী পরমাত্মার অশাব্দিক আদেশ শুনিবার অন্তরিন্দ্রিয়, তাই Conscienceএর আর এক নাম voice of God। আর-একটা কথা এই যে, আমাদের দেশীয়-শাস্ত্রের মতানুসারে জীবাত্মা প্রত্যেকে মনুষ্যের সাক্ষাৎ ভিত্তিভূমি, অন্তরতম আত্মা পরমাত্মা সর্বজগতের (এবং সেই সঙ্গে জীবাত্মারও) ভিত্তিভূমি ; অন্তরাত্মা মনুষ্যমণ্ডলীর Humanity এবং সেই সঙ্গে Morality-র সাক্ষাৎ ভিত্তি-ভূমি। বিবেক ঔদাসীন্যের লৌহকবচে আবৃত হৃদয় ; Conscience শিশুর ন্যায় অনাবৃত হৃদয়। বিবেক করে কি ? না, সত্যের তুলাদণ্ডে ধর্মাধর্ম তৌল করিয়া দেখিয়া ধর্মের গুরুত্ব অবধারণ করে, তা-বই বিবেক ধর্মাধর্মের স্পর্শ অনুভব করে না, তাহা যে করে, ধর্মাধর্মের স্পর্শ যে অনুভব করে, তাহার নাম দিই অন্তরাত্মা কি না Conscience। অন্তরাত্মা অধর্মের সংস্পর্শে গ্লানিযুক্ত হয়,

ধর্মের সংস্পর্শে প্রসন্ন হয়; অন্তরাত্মা কাঁদে, অন্তরাত্মা ঠাণ্ডা হয়। পক্ষান্তরে, জটাধারী বিবেককে কেহই আজ পর্যন্ত প্রসন্ন হইতে বা বিষণ্ণ হইতে, বা কাঁদিতে বা ঠাণ্ডা হইতে দেখেন নাই। অতএব এটা স্থির যে, বিবেক Conscience নহে বিবেক Discrimination। অন্তরাত্মাই Conscience। তা যেন হইল—এটা যেন বুঝিলাম যে অন্তরাত্মাই Conscience, কিন্তু 'লোকটা বড় Conscientious' এই কথাটি পুরাপুরি বাঙ্গালায় বলিতে হইলে তুমি কি বলিবে? চিরকাল যাহা বলিয়া আসিতেছি যদি তাহাই বলি—বলিব যে, লোকটা বড় ধর্মভীরু; তা বই এরূপ বলিব না যে, লোকটা বড় বিবেকী (!)। একজন চাষা কর্তৃকারক কাহাকে বলে তাহা জানে না—কর্মকারক কাহাকে বলে তাহা জানে না—অথচ কথোপকথনের সময় কর্তৃকারকের জায়গায় কর্তা বসায়, কর্মের জায়গায় কর্ম বসায়; তেমনি একজন মূর্খ (গুহ চণ্ডাল) ধর্ম কাহাকে বলে, অধর্ম কাহাকে বলে তাহা না জানিতে পারে; অথচ এরূপ হইতে পারে যে, সে মিথ্যা কহিতে ডরায়, চুরি করিতে ডরায়। ডরায় কাহাকে? পুলিশের কন্‌স্টেবলকে না—ডরায় সে অন্তরাত্মাকে। একজন সাঁওতালকে ধরিয়া তাহাকে নানা প্রকার ভয় মৈত্রতা দেখাইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য বিচারপতির সাক্ষাতে দাঁড় করানো হইয়াছিল; সাঁওতাল বেচারী বার-দুই শেখানো কথাটা বলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই তাহা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না,—সে তখন কাঁদিয়া ফেলিল, আর বলিল যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে এই কথা বলিতে শিখাইয়া দিয়াছে। ইহারই নাম ধর্মভীরুতা Conscientiousness।

Patriot শব্দের যাঁহারা অনুবাদ করেন দেশহিতৈষী, তাঁহারা নিতান্তই দায়ে পড়িয়া তাহা করেন। Patriot শব্দের ঠিক প্রতিশব্দ আমাদের দেশীয় ভাষাতে নাই ও কস্মিন্‌কালে ছিল না পুরাতন গ্রীক দেশে Sparta প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড রাজ্যের Patriotism প্রথমে তাহাদের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাহার পরে পারস্য দেশের সহিত যুদ্ধের তাড়নায় সেই সমস্ত ক্ষুদ্র Patriotism একত্র জমাটবদ্ধ হইয়া সমস্ত গ্রীকবাসীকে একাত্মা করিয়া তুলিয়াছিল, এবং তাহার পরে সেই জমাটবদ্ধ Patriotism-কে Olympic-games নামক উৎসব দ্বারা সময়ে ঝালানো হইত। পুরাতন রোমান Patriotism প্রথমে রোম নগরের মধ্যেই পিঞ্জরাবদ্ধ ছিল। ক্রমে ক্রমে তাহা পক্ষ বিস্তার করিয়া সারা ইতালীময় পরিব্যাপ্ত হইল। পৈতৃক ভিটা

যে Patriotism-এর গোড়ার কাহিনী তাহা তাহার নামেই স্বপ্রকাশ। পৈতৃক ভিটার প্রতি প্রাণের টান যাহা অধিবাসীর মনে স্বভাবতই জন্মে, সেই প্রাণের টান ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিয়া দেশময় উথলিয়া পড়িলে তাহারই নাম দেওয়া হয় Patriotism। তার সাক্ষী—Expatriate শব্দের মৌলিক অর্থ পৈতৃক ভিটা হইতে স্থানান্তরিত করা এবং তাহার গৌণ অর্থ স্বদেশের সহিত সম্পর্ক রহিত করা। দেশের হিত সাধন করা Philanthropist স্বতন্ত্র, আর কায়মনোবাক্যে দেশের স্বকীয় মাহাত্ম্যের সমর্থনকারী Patriot স্বতন্ত্র। যিনি স্বদেশের স্বাধীনতা, গৌরব, তেজোবীর্য এবং মহত্ত্ব রক্ষণ করিয়া পিতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করেন তিনিই Patriot। তিনি যদি নেপোলিয়নের ন্যায় রুধির-স্রোতে দেশকে ভাসাইয়া দেশের পরাকাষ্ঠা হিতসাধন করেন, আর বলেন যে, দেশের মহত্ত্ব যদি না রহিল তবে তাহার হিতে কাজ নাই, তথাপি তিনি Patriot। পক্ষান্তরে যাঁহারা কাটা ছাঁটা আঁটা সাঁটা পোশাক এবং দোকান সাজাইয়া গৃহসজ্জাতেই সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখেন, স্বদেশের কিছুই যাঁহারা দুচক্ষে দেখিতে পারেন না, এমন কি স্বদেশের সর্ববাদিসম্মত বিশিষ্ট উৎকর্ষ স্থানটিকেও যাঁহারা কেবল অন্যের দেখাদেখি নাক মুক সিটকাইয়া ভাল বলেন। তা বই, তাহার ভালত্ব আপন চক্ষে দেখেনও না—দেখিতে জানেনও না; যাঁহারা স্বদেশের গৌরবেও আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন না, স্বদেশের অপমানেও আপনাদিগকে অপমানিত মনে করেন না, তাহা দূরে থাকুক, উল্টা আরো যাঁহারা স্বদেশকে নিচু করিয়া আপনার উঁচু হইবার চেষ্টায় যাচিয়া মান এবং কাঁদিয়া সোহাগের কর্দমাক্ত পথে উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান হন, তাঁহারা যদি স্বদেশের মাথা হেঁট করা দেহের যাঁতা চালাইবার উপযোগী মহা মহা বহ্বাড়ম্বরের ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া দেশহিতৈষিতার ধ্বজা উড়াইতে এক মুহূর্তও ক্ষান্ত না হন, তাহা হইলেও আমি তাঁহাদিগকে Gariboldi বলিব না। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ওরূপ Gariboldi ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে আমরা Patriot বলিলে যথার্থ যাহা তিনি ছিলেন তাঁহাকে তাহাই বলা হয়। আপনারা হয়তো মনে করিতেছেন যে, তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, দীন দুঃখীদিগের মা বাপ ছিলেন, বিধবা রমণীদের সন্তাপানলে নয়নজল বর্ষণ করিতেন, সেই কারণে আমি তাঁহাকে Patriot বলিতেছি। এরূপ অবিচার আপনারা আমার প্রতি করিবেন না। তিনি যদি একশত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

করিতেন, শত সহস্র দরিদ্র লোককে Rothschild করিয়া দিতেন; দশকোটি বিধবার মৃত সাধব্য পুনর্জীবিত করিতেন, তাহা হইলে শুদ্ধ কেবল সেই কারণে তাঁহাকে আমি Patriot বলিতাম না, তাহা হইলে বলিতাম তিনি মস্ত একজন Philanthropist; Patriot তাঁহাকে বলিতেছি আরেক কারণে। যখন তিনি Woodrow সাহেবের অধীনতাশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নিঃসম্বল হস্তে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক লেখনী-যন্ত্র দ্বারা জীবিকা সংস্থাপনের পথ কাটিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বুঝিলাম যে হাঁ তিনি Patriot, যেহেতু ইনি খাওয়া পরা অপেক্ষা স্বাধীনতাকে প্রিয় বলিয়া জানেন। যখন দেখিলাম যে, তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সারাংশ সমস্তই ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ সে সভ্যতার কৃত্রিম কুহকাংশে পদাঘাত করিয়া স্বদেশীয় উচ্চ অঙ্গের সভ্যতা বিদ্যা বিনয় দয়াদাক্ষিণ্য মহত্ত্ব এবং সদাশয়তা সমস্তই আপনাতে মূর্তিমান্‌ করিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে, ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণ সত্য সত্যই Patriot ছাঁচে গঠিত। যখন দেখিলাম যে 'এদেশের কিছু হইবে না' বলিয়া তিনি অকেজো মৌখিক সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সংসর্গে বিমুখ হইয়া বাষ্প গদগদ লোচনে গৃহকোটরে ঢুকিয়া আপনাতে আপনি ভর করিয়া অবস্থিত করিতেছেন—দীপ্ত দিবার অল্পে অল্পে তেজোরশ্মি গুটাইয়া অস্তাচল শিখরে অবনত হইতেছেন, তখন বুঝিলাম যে, পূর্বজন্মে ইনি প্রাচীন রোম নগরের কোন একজন খ্যাতনামা Patriot ছিলেন—পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ হইতে আমাদের এই হতভাগ্য দেশে নিপতিত হইয়া মনের খেদে ধূলায় পড়িয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি যাইতেছেন, অথচ কেহই তাঁহার সহিত কাজে যোগ দিতেছে না।

Patriot বলিতে আমি যাহা বুঝি তাহা বলিলাম। Patriotism শব্দের অনুবাদ কিরূপ হইলে ভাল হয়, তাহা আমার ঘটে জোগাইতেছে না। যা' তা' খেলো সামগ্রীকে Patriotism বলিয়া Patriot নামের গায়ে, আর দেশীয় লোকের চোখে যথেষ্ট ধূলি নিক্ষেপ করা হইয়াছে এবং হইতেছে; এখন আমার দেশীয় ভ্রাতারা এইরূপ ধূলির আবির-খেলা হইতে ক্ষান্ত হইলে আমি বাঁচি—Patriot শব্দের অনুবাদ ধীরে সুস্থে পরে হ'বে। Patriotism শব্দের গৌরবান্বিত পদবীতে 'স্বদেশবাৎসল্য' এই মাটির পুতুলটি প্রতিষ্ঠিত করিলে তাহাতে আর কিছু হোক না হোক—বঙ্গসাহিত্যের খেলা-ধূলা কার্য অনেককাল নির্বিঘ্নে চলিতে পারিবে—আমাদের ভাগ্যে তাহাই ঢের।

তাহার পরে আসিতেছে—বিজ্ঞান ইতিহাস কাব্য প্রভৃতি সকল প্রকার সাহিত্য আলোচনা ও সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির প্রকাশ। দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস কাব্য "এই বাক্যটির মাথা নীচু পা উঁচু অবস্থা ঘুচাইয়া উহাকে সোজা করিয়া দাঁড় করানো উচিত, উহাকে করা উচিত কাব্য ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন।" কেননা, প্রথমে কাব্য, পরে ইতিহাস, পরে বিজ্ঞান, পরে দর্শন, ইহাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের উত্তরোত্তর ক্রমান্বয় পদ্ধতি।

বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াও মনুষ্য প্রথম বয়সে কাব্যের, দ্বিতীয় বয়সে ইতিহাসের, তৃতীয় বয়সে বিজ্ঞানের, চতুর্থ বয়সে তত্ত্বজ্ঞানের, কিছু না কিছু টুক্‌রা-টাক্‌রা পাথেয় সম্বল মনোভাণ্ডারে সংগ্রহ করে।

প্রথম বয়সে মনুষ্য যখন মায়ের মুখে শোনে "এটা করিতে নাই—ওটা করিতে নাই" তখন তাহা কেন করিতে নাই জিজ্ঞাসা করে না; ধাত্রীর মুখে যখন শোনে যে, "সাপের মাথায় সাত রাজার ধন মানিক আছে" তখন তাহার বুদ্ধিতে তাহা বেদবাক্য। একই বয়সে কল্পনার কুহকে মুগ্ধ হইয়া সকল মনুষ্যই অশিক্ষিত কবি হয়।

তাহার পরে গতানুগতিকতা শেখে—"বাবা এইরূপ করে, আমিও এইরূপ করিব।" "পাঁচজনে এইরূপ করে আমিও এইরূপ করিব।" "মাষ্টার মহাশয় এইরূপ করিয়া বই পড়ে—আমিও এইরূপ করিয়া বই পড়িব" এইরূপ আপাতদর্শী বুদ্ধিতে চালিত হইয়া পার্শ্ববর্তী লোকেরা যে যাহা বলে এবং যে যাহা করে তাহাই শেখে। এই বয়সে মনুষ্য পিতৃ-পিতামহ-সেবিত বাঁধা রাস্তায় বাঁধা চালে চলিতে শিক্ষা করিয়া অশিক্ষিত সভ্য হয়।

তাহার পরে মনুষ্য জ্ঞাতব্য বিষয় কতক বা দেখিয়া শেখে, কতক বা ঠেকিয়া শেখে। যখন ঠেকিয়া শেখে তখন তার চক্ষু ফোটে। পরের কথায় নির্ভর করিয়া এবং পরের দেখাদেখি অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে চলিতে গিয়া যখন সে বার পাঁচ ছয় ঠকে তখন সে সকল বিষয় আপনার চক্ষে দেখিয়া, আপনার কর্ণে শুনিয়া, আপনার বুদ্ধিতে বিচার করিয়া যাহার মধ্যে যতটুকু সত্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহার মধ্য হইতে তাহা টানিয়া বাহির করে এবং তদনুসারে কর্তব্য স্থির করে। এই বয়সে মনুষ্য স্বাধীনতায় ভর করিয়া দাঁড়াইয়া অশিক্ষিত-বিজ্ঞ হয়।

তাহার পরে মনুষ্য— বাস্তবিক আমি কতটুকু স্বাধীন—কতটুকু পরাধীন; বাস্তবিক আমার ক্ষমতার দৌড় কতটুকু; বাস্তবিক আমার কোথায় স্থিতি,

কোথায় গতি, কোথা হইতে উৎপত্তি ; বাস্তবিক আমি কি করিতে সংসারে আসিয়াছি ; সংসারের আদি কি, অন্ত কি ; সত্য কি, কর্তব্য কি ; এই সকল বিষয় মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিয়া দেখে ; সংক্ষেপে আপনাকে আপনি সত্যের তুলাদণ্ডে তৌল করিয়া দেখে এবং সেই আত্মপরীক্ষা হইতে (Socrates-এর Know Thyself হইতে) সার সার জ্ঞানামৃত মন্থন করিয়া তাহার গুণে ধীর নম্র শ্রদ্ধাবান্ এবং ভক্তিমান্ হয় ; এই বয়সে মনুষ্য বিবেক এবং বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া অশিক্ষিত প্রাজ্ঞ হয়।

মনুষ্যের বয়সের গতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের গতি ধাপে ধাপে যেরূপ নীচু হইতে উঁচু দিকে ফিরিয়া যাইতে থাকে, তাহারই আমি একটি আনুপূর্বিক চুম্বক-দৃশ্য যত অল্প কথায় পারি চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু নৈয়ায়িকদিগকে আমি বড় ডরাই—বিশেষতঃ এদেশের এবং একালের নৈয়ায়িকদিগকে আমি বাঘের মত ডরাই ! একজন নৈয়ায়িক ঘানির ঘূর্ণনে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া কলুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গোরুর গলায় ঘণ্টা কেন ? কলুর মুখে যখন শুনিলেন যে, ঘণ্টার শব্দে জানিতে পারা যায় গোরু চলিতেছে, তখন সে কথা তাঁহার মনঃপূত হইল না ; তিনি তাঁহার কুশাগ্রীয় সূক্ষ্মবুদ্ধি পরিচালনা করিয়া বলিলেন যে, "গোরু যদি দাঁড়িয়ে ঘণ্টা নাড়ে ?" সমালোচক তেমনি আমাকে কি বলবেন, আমি তাহা জানি ; তিনি বলিবেন যে, "তুমি বলিতেছ মনুষ্য তৃতীয় বয়সে অশিক্ষিত বিজ্ঞ হয়, চতুর্থ বয়সে অশিক্ষিত প্রাজ্ঞ হয় ; কিন্তু যদি সে আন্দামান উপদ্বীপে জন্মগ্রহণ করে। ইহার তুমি কি উত্তর দাও ?" ইহার উত্তর আমি এই দিই যে, "আমার ঘাট হইয়াছে !" মাথা নাই তার মাথা ব্যথা ! আন্দামানীর তৃতীয় বয়স হইলে, তবে তো সে তৃতীয় বয়সে অশিক্ষিত বিজ্ঞ হইবে। তাহা তাহার ভাগ্যে হয় কই ! আন্দামানী চিরজীবনই প্রথম বয়সের পঁইটাতে হামাগুড়ি দ্যায়—চিরকালই সে শিশু থাকে। কাজেই আন্দামানী অশিক্ষিত কবি পর্যন্ত হইয়াই ক্ষান্ত থাকে। সুশিক্ষিত সভ্য লোকেরা সহস্র সাধ্য সাধনা করিয়াও যাহা দেখিতে পান না, আন্দামানীর ন্যায় অশিক্ষিত কবিরা তাহা বিনা চেষ্টায় দেখিতে পায় ; অরণ্যের আড়ালে আবডালে ভূত প্রেত যক্ষ রক্ষ বনদেবতা প্রভৃতি কত কি যে কল্পনাচক্ষে দেখিতে পায়, তাহার ওর নেই।

মনুষ্য যদি সুশিক্ষিত কবি হইতে ইচ্ছা করে তবে রীতিমত কাব্যশাস্ত্রের অনুশীলন; সুশিক্ষিত বিজ্ঞ হইতে হইলে, বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অনুশীলন; সুশিক্ষিত প্রাজ্ঞ হইতে হইলে, দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন—তাহার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক।

বঙ্গভাষার অধিকারায়ত্ত প্রদেশে সুশিক্ষা-পথের ঐ চারিটি সোপান-পংক্তি কাটিয়া প্রস্তত করিবার জন্য সাহিত্য-পরিষদ্ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—এ বৃত্তান্তটি আমাদের দেশের বর্তমান সময়ের খুবই একটি শুভচিহ্ন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা-বিতরণ করা এক প্রকার তেলা মাথায় তেল দেওয়া—সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য তাহা নহে। সাহিত্য-পরিষদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে অশিক্ষিত মহলে সুশিক্ষার আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ করা,—যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞানানুশীলন করিয়াই যাহাতে কালোচিত সুশিক্ষা লাভ করিতে পারেন, ধীরে ধীরে তাহার পথ প্রস্তত করা।

আমাদের দেশের বর্তমান সময়ে সুশিক্ষার পথের কণ্টক তিন শ্রেণীর ব্যক্তি—সুশিক্ষার পথের দীপ-স্তম্ভ এক শ্রেণীর ব্যক্তি। পূর্বোক্ত তিন শ্রেণীর ব্যক্তি হচ্ছেন, প্রথম—না পড়িয়া পণ্ডিত!

দ্বিতীয়—বই মুখস্থ করিয়া পুঁথিগত বিদ্যার জাহাজ।

তৃতীয়—ইংরাজী বিদ্যার অসারাংশ লেহন করিয়া, তন্মোতে আপাদমস্তক পরিপূরিত, স্ফীত, উদ্ধত, দিশাহারা কাণ্ডজ্ঞানরহিত কি যেন কি!

এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তি সুশিক্ষা পথের কণ্টক। পক্ষান্তরে,

দেশোচিত সংস্কৃত বিদ্যা এবং কালোচিত ইংরাজী বিদ্যার মর্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, দুয়ের যাঁহারা সারাংশ আত্মসাৎ করিয়াছেন;

দেশ এবং কাল দুয়ের যাঁহারা মর্মস্থানীয় ধাতু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া উভয়ের ভেদ অবগত হইয়াছেন।

যাঁহাদের নাড়ী-জ্ঞান আছে;

যাঁহারা কাহাকে কি বলে, কাহাকে কি বলে না, তাহা বিধিমতে বিচার করিয়া ঠিক্ ঠাক্ বুঝিয়াছেন;

কাহাকে সভ্যতা বলে, কাহাকে সভ্যতা বলে না, কাহাকে Patriotism বলে, কাহাকে Patriotism বলে না; কাহাকে স্বাধীনতা বলে, কাহাকে

স্বাধীনতা বলে না; তাহা এবং তাহার ভিতরকার মারপ্যাচ, সমস্তই যাঁহাদের ভাল করিয়া জানা হইয়াছে;

যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, কাহারো কোনো তক্কা রাখি না ভাব এবং হাম্বড়া ভাব স্বাধীনতা নহে, তাহা তমোগুণের অধীনতা;

যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, গৃহে হিতকাঙ্ক্ষী গুরুজনের অধীনতা, কর্মক্ষেত্রে প্রতিপালক প্রভুর অধীনতা এবং রণক্ষেত্রে সেনাপতির অধীনতা পরাধীনতা নহে;

যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, শিখেরা জজ ম্যাজিষ্টরকে সেলাম করে বলিয়া তাহারা কাপুরুষ নহে; আর বাঙ্গালীরা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি ন্যায্য সম্মান প্রদর্শন করে না বলিয়া, তাহারা মস্ত বীরপুরুষ নহে;

মোট কথা এই যে, যাঁহারা এদেশ এবং একাল, ভারতবর্ষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দী দুয়েরই শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া রসজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞতা এবং প্রাজ্ঞতা, এই চারিটি অমূল্য রত্ন উপার্জন করিয়াছেন; কাব্যশাস্ত্র মন্থন করিয়া রসজ্ঞতা উপার্জন করিয়াছেন, পুরাবৃত্ত মন্থন করিয়া অভিজ্ঞতা উপার্জন করিয়াছেন; বিজ্ঞানশাস্ত্র মন্থন করিয়া বিজ্ঞতা উপার্জন করিয়াছেন; এবং দর্শনশাস্ত্র মন্থন করিয়া প্রাজ্ঞতা উপার্জন করিয়াছেন; তাঁহাদের শ্রেণীর ব্যক্তিরাই বঙ্গের সুশিক্ষা পথের দীপ-স্তম্ভ। শেষোক্ত শ্রেণীর সুযোগ্য ব্যক্তিদিগের উপরেই সাহিত্য-পরিষদের সমস্ত আশা-ভরসা নির্ভর করিতেছে।

অতঃপর আসিতেছে, সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা। পত্রিকা-খানি সাহিত্য-সেবক-দিগের বাণিজ্যতরী। তাহা উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-বিজ্ঞানাদির গুরুভার বহন করিয়া বন্দরে বন্দরে যাতায়াত করিতেছে, মন্দ না? তাহা যেমন চলিতেছে, তেমনি চলিতে থাকিলে, তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এ আমাদের বলবতী আশা ফলবতী না হইবার কোন কারণ নাই! বিশেষতঃ যখন নগেন্দ্রবাবুর ন্যায় অমন একজন উদ্যমশীল সদাশয় এবং সুদক্ষ নাবিক তাহার হাল ধরিয়া রহিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবুই তাঁহার স্থানের ঠিক উপযুক্ত—ইংরাজীতে যাহাকে বলে, The right man in the right place।

আপনাদের সুগোচরার্থে মোট কথা যাহা আমার বক্তব্য, তাহা এই যে, এ দুই বৎসর সাহিত্য-পরিষৎ যে ভাবে চলিয়া আসিতেছে তাহা তাহার

স্থায়িত্বের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাহার উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইলে, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সহিত ইংরাজী সংস্কৃতজ্ঞ ভদ্র বিনীত এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের জোট-পাট সংঘটন করিয়া, কিরূপ প্রণালীতে কার্য করিলে ভাল হয়, তাহা আমার যতদূর সাধ্য তাহা আমি সংক্ষেপে বলিয়া চুকাইয়াছি; আপনাদের বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে আপনারা যাহা ভাল বোঝেন, তাহাই করিবেন।

এইখানে আমি আজ একটি আনন্দজনক বিষয়ের প্রজ্ঞাপন করিয়া মধুরেণ-সমাপয়েৎ করিতে পারিতাম; যেহেতু ইহারই মধ্যে পরিষৎ গোটা চার পাঁচ আয়াসসাধ্য অনুসন্ধানকার্য যেরূপ বিচক্ষণতা এবং নিপুণতার সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন—তাহা অনতিবিলম্বে গুণগ্রাহী সাধারণের নিকট যথোচিত আদরভাজন হইবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি আজ মধুরেণ-সমাপয়েৎ করিবার এমন সুযোগ পাইয়াও এ যাত্রায় তাহা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইতেছি; কেননা আমিও শ্রান্ত হইয়াছি—আপনারাও শ্রান্ত হইয়াছেন। তা বলিয়া আপনারা মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন না। বর্তমান প্রবন্ধ ছাপাইয়া প্রকাশ করিবার সময় এই প্রবন্ধের পরিশিষ্ট ভাগেই হউক, আর পৃথক কার্যবিবরণীতেই হউক, ঐ অভিনন্দনীয় বার্তাগুলির যথাবিহিত পর্যালোচনার ত্রুটি হইবে না।

অতঃপর এ দুই বৎসর আপনারা আমাকে সভাপতির গৌরবান্বিত আসনে অধিরূঢ় করাইয়া, যেরূপ সম্মানিত করিয়াছেন এবং আমার কার্যের অসমীচীনতা যেরূপ সদয় দৃষ্টিতে উপেক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পরিশেষে নিবেদন করিতেছি যে, এখন যদি আপনারা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া অবসর প্রদান করিতে সম্মত হন, তবে তাহা মুক্ত কণ্ঠে বলুন, তাহা হইলে, আমি আগমিষ্যৎ যোগ্যতর সভাপতির যথাবিহিত সৎকারের জন্য, স্থান খালি করিয়া সুপ্রসন্ন চিত্তে সভাপতির আসন হইতে সরিয়া দাঁড়াই।

নানাচিন্তা। ১৩২৭

বাংলার কথা

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

১৮৪৫ - ১৮৮৬

আর্যজাতি— কোন্ জাতীয় লোকে প্রথমে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যায় বাস করে, এবং কোথা হইতে কখন্ তাহারা এখানে উপস্থিত হয়, স্থির করা যায় না। তবে ইহা এক প্রকার অবধারিত হইয়াছে যে অতি পূর্বকালে সাঁওতাল পাহাড়িয়া প্রভৃতি অসভ্য জাতিই এদেশে বাস করিত। পরে 'আর্য' নামধারী হিন্দুরা তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া এদেশ অধিকার করেন। পরাজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেহ কেহ জঙ্গলে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, কেহ কেহ বিজেতাদিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল। এতদ্দেশীয় বর্তমান অসভ্য জাতিগণ এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ তাহাদেরই সন্তানসন্ততি।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে আর্যবংশ বলে। আর্যদিগের আদিম বাসস্থল মধ্য-এশিয়া; ক্রমে তাহারা ভারতবর্ষ, পারস্য, এবং ইউরোপখণ্ড অধিকার করেন। হিন্দু পারসীক গ্রীক রোমক ইংরেজ ফারসী জর্মন রুস ওলন্দাজ দিনেমার পর্তুগীজ প্রভৃতি জাতি আর্যবংশজাত।

আর্যগণ কখন্ এ প্রদেশে আগমন করেন, বলা যায় না। উত্তর পশ্চিম-প্রদেশ অধিকার করিয়া পূর্বাঞ্চলে আসিয়া বাস করিতে তাঁহাদিগের যে অনেক সময় লাগিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধধর্ম—মহাভারতে মগধ অর্থাৎ বেহারের পরাক্রান্ত রাজা জরাসন্ধের উল্লেখ আছে। তৎকালাবধি পুরাণে মগধের রাজাদিগের নাম পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধাধিপতি বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজত্বকালে বুদ্ধদেব স্বীয় ধর্ম প্রচার করেন। বুদ্ধদেবের নাম সিদ্ধার্থ। তাঁহার জন্মস্থান কপিলবস্তু। তাঁহার পিতা শুদ্ধধন কপিলবস্তুর রাজা ছিলেন; তাঁহার মাতার নাম মহামায়া। সূর্যবংশীয় শাক্যকুলে জন্ম; এজন্য তাঁহাকে শাক্যসিংহ ও শাক্যমুনি বলে। ব্যাধি জরা ও মৃত্যু অপরিহার্য দেখিয়া তিনি সংসার দুঃখময় জ্ঞান করেন, এবং উনত্রিশ বৎসর বয়সে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করেন। তিনি কিছুকাল শিষ্যভাবে ব্রাহ্মণদিগের নিকটে জ্ঞানোপার্জনের চেষ্টা করেন। পরে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী নাম ধারণ করিয়া স্বীয় মত প্রচার

করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মতে সর্বজীবের প্রতি দয়াই প্রধান ধর্ম। খৃষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে অশীতি বৎসর বয়সে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয়।

নন্দবংশ ও চন্দ্রগুপ্ত—বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কিছুকাল পরে নন্দবংশীয় রাজগণ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহারা নয়জনে একশত বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহাদিগের রাজত্ব সময়ে ভুবনবিখ্যাত মহাবীর আলেক্‌জণ্ডর ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন করিলে, চন্দ্রগুপ্ত মন্ত্রণাকুশল রাজনীতিবেত্তা চাণক্যের সাহায্যে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধের রাজাসন অধিকার করেন ও আর্যাবর্তের সম্রাট হন (৩১৫ খৃ. পূ)। আলেক্‌জণ্ডরের মৃত্যুর পর তদীয় সেনাপতি সেলুকস ভারতবর্ষ পুনরাক্রমণ করেন, কিন্তু সংগ্রামে পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষের উপর সমুদয় দাওয়া পরিত্যাগ করেন এবং চন্দ্রগুপ্তের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে মেগাস্থিনিস্ নামক একজন দূত প্রেরণ করেন। মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণ হইতে এতদ্দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। মেগাস্থিনিস্ ও অন্যান্য গ্রীকেরা ভারতবর্ষ-বাসীদিগের সাহস ও সত্যপ্রিয়তা দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন।

অশোক—চন্দ্রগুপ্তের পরে তৎপুত্র বিন্দুসার ও তদনন্তর বিন্দুসার-সুত অশোকবর্ধন বা প্রিয়দর্শী মগধের রাজা হন। অশোক প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বৌদ্ধদের একটি মহাসভা হয়, এবং বৌদ্ধধর্ম বিস্তারার্থে দূরদেশে প্রচারকগণ প্রেরিত হয়। বোধ হয় ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানই মহারাজা অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। উড়িষ্যা হইতে পেশবার পর্যন্ত প্রস্তরস্তম্ভে বা গিরিগাত্রে ক্ষোদিত প্রিয়দর্শীর আদেশাবলী দৃষ্ট হয়। এই সকল পাঠ করিয়া জানা যায় যে যদিও তিনি নিজে বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি সকল ধর্মের লোকের প্রতি তাঁহার সমান যত্ন ছিল। তিনি জীবহিংসা নিবারণ করেন, রাজবর্ত্মের ধারে ধারে বৃক্ষরোপণ ও কূপ খনন করান, এবং পীড়িত মনুষ্য ও জীবনের জন্য অনেক স্থানে চিকিৎসালয় সংস্থাপন করেন।

চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার ও অশোক যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার নাম মৌর্যবংশ। অশোকের মৃত্যুর পরে মৌর্যবংশীয় আরও কয়েকজন রাজা

হইয়াছিলেন। অনন্তর সুঙ্গ, অন্ধ্র ও গুপ্ত বংশের রাজগণ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহাদিগেরও বিলক্ষণ পরাক্রম হইয়াছিল।

সিংহল-বিজয়॥ সিংহলের ইতিহাসে বাঙ্গালার প্রথম প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে যে বঙ্গদেশে সিংবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়সিংহ প্রজাপীড়ন-দোষে নির্বাসিত হইলে সাতশত সঙ্গী লইয়া অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া সমুদ্রযাত্রা করেন; অনন্তর অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন এবং তত্রত্য অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া সেখানকার রাজা হন। পরে বিজয়ের মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাস বঙ্গদেশ হইতে যাইয়া লঙ্কার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। পাণ্ডুবাসই লঙ্কার রাজবংশের আদি পুরুষ, এবং সিংহ-বংশের রাজ্য বলিয়া উক্ত দ্বীপের নাম সিংহল হইয়াছে। কথিত আছে যে, যে বৎসর বুদ্ধদেব মানবলীলা সম্বরণ করেন, সেই বৎসরই বিজয় সিংহলে উপস্থিত হন। সুতরাং জানা যাইতেছে যে খৃষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে আর্যদিগের অধিকার বিস্তার হইয়াছিল, এবং তাঁহারা বর্তমান ইংরেজদিগের ন্যায় সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়া বিদেশ জয় করিয়াছিলেন।

চীন-পর্যটক॥ সিংহল-বিজয়ের পর বঙ্গদেশের বিষয়ে বহুকাল পর্যন্ত কিছুই জানা যায় না; কিন্তু খৃষ্টের জন্মের তৃতীয় শতাব্দী পূর্বে মগধের মৌর্যবংশীয় বৌদ্ধরাজগণ যেরূপ প্রবল হইয়াছিলেন, এবং পরে তত্রত্য অন্ধ্র-বংশীয় ও গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের যে প্রকার পরাক্রম হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হয় যে, সময়ে সময়ে বঙ্গীয় রাজগণ মগধের অধীন ছিলেন। চীনদেশীয় পর্যটকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষে তাম্রলিপ্ত অর্থাৎ তমলুক একটি প্রধান বন্দর ছিল, এবং তথা হইতে এদেশীয় লোক সমুদ্রপথে সিংহলাদি দূরদেশে গমনাগমন করিত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এদেশে ব্রিজি, মগধ, চম্পা, পৌণ্ড্রবর্ধন, সমতট, শ্রীক্ষেত্র, কমলাক্ষ, কিরণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত, ওড় প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল; এবং অনেক স্থলে কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্ধন রাজচক্রবর্তী বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

পালবংশ—অতঃপর খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে এদেশে একটি পরাক্রান্ত রাজবংশ লক্ষিত হয়। এই বংশীয়েরা 'পাল' নামধারী ও বৌদ্ধ-

ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু ইঁহারা সংস্কৃতের আদর করিতেন এবং হিন্দুদিগের প্রতি মমতা দেখাইতেন ; এমন কি, ইঁহারা ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদ্বারাই রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। পালবংশের প্রথম রাজা ভূপাল বা লোকপাল ; তৎপুত্র ধর্মপাল হিমালয় প্রদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হন। ধর্মপালের ভ্রাতুষ্পুত্র দেবপাল অনেক রাজ্য জয় করিয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তিনি সমুদয় ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া কীর্তিত। উত্তরকালে এই বংশে মহীপাল নামে একজন রাজা হইয়াছিলেন ; তিনি বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। দিনাজপুরের মহীপালদীঘি অদ্যাপি তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে। পালবংশীয় ১২-১৩ জন রাজার নাম পাওয়া যায় ; কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কে কখন্ রাজত্ব করেন এবং কে কি কার্য করেন অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই ; দিনাজপুর, বুদ্ধগয়া, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদিগের অনেক কীর্তি দেখা যায়, এবং তাঁহারা আপনাদিগকে গৌড়াধীপ বা গৌড়েশ্বর বলিয়া বর্ণনা করেন। বাঙ্গালা ও বেহার উভয়ই যে তাঁহাদিগের অধিকারে ছিল, এবং সময়ে সময়ে অন্যান্য স্থানের ভূপতিরা যে তাঁহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আদিশূর ॥ পালবংশের রাজ্য কিরূপে গেল নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। হিন্দুধর্মের প্রতি লোকের অধিক মতি হওয়া, বোধ হয়, ইহার একটি কারণ। যাহা হউক, পূর্ববাঙ্গালায় হিন্দুধর্মাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় 'সেন' রাজারা প্রবল হইয়া উঠিলেই যে পালবংশের প্রভাব বিলুপ্ত হয়, তাহাতে সংশয় নাই। সেনবংশের প্রথম রাজা বীরসেন বা শূরসেন, এবং রাজা বলিয়া তাহাকে আদিশূর বলে। আদিশূর রাজা হইয়া দেখিলেন যে বৌদ্ধদিগের অধিকারকালে লোকে হিন্দুধর্মের অনেক ক্রিয়াকলাপ ভুলিয়া গিয়াছে। এ নিমিত্ত তিনি কান্যকুব্জ হইতে সদ্বিদ্যাশালী ব্রাহ্মণ আনাইতে দূত প্রেরণ করিলেন। কান্যকুব্জাধিপতি পাঁচজন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদিগের নাম শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড়। ইহারা সকলেই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ; শ্রীহর্ষ 'নৈষধচরিত' এবং 'খণ্ডন খণ্ডখাদ্য' রচনা করেন। ভট্টনারায়ণ 'বেণীসংহার' প্রণেতা। অপর তিনজনের লিখিত কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ গোত্রজ ; ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্য ; দক্ষ কাশ্যপ ; বেদগর্ভ সাবর্ণ ; ছান্দড় বাৎস। এই পাঁচজন হইতেই বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের জন্ম ; এবং ইঁহাদিগের সঙ্গে যে পাঁচজন সহচর আসিয়াছিল, তাঁহাদিগের

সন্তানেরাই বাংলার প্রধান কায়স্থ। আদিশূর বা বীরসেনের রাজ্যারম্ভ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে ঘটে।

বীরসেনের পুত্র সামন্তসেন এবং পৌত্র হেমন্তসেনের রাজত্ব সময়ে উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা দেখা যায় না ; কিন্তু লিখিত আছে যে তাঁহার প্রপৌত্র বিজয়সেন কামরূপ, গৌড় ও কলিঙ্গ জয় করেন।

বল্লালসেন ॥ সেনবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে বল্লালসেনই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। তিনি 'দানসাগর' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন ; ঐ গ্রন্থে তিনি আপনাকে বিজয়সেনের পুত্র ও হেমন্তসেনের পৌত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আইন আকবরীর মতে তিনি ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের কৌলীন্যমর্যাদা সংস্থাপন করেন, এবং বাঙ্গালা দেশ নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত করেন ; ১ রাঢ়, ২ বরেন্দ্র, ৩ বাগড়ি, ৪ বঙ্গ, ৫ মিথিলা। বাঙ্গালার যে ভাগ ভাগীরথীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ তাহার নাম রাঢ়। যে ভাগ পদ্মার উত্তর এবং করতোয়া ও মহানন্দার মধ্যবর্তী, তাহার নাম বরেন্দ্র। যে ভূভাগ পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যস্থিত, তাহার নাম বাগড়ি। করতোয়া এবং পদ্মার পূর্বপার্শ্বস্থ প্রদেশের নাম বঙ্গ ; এবং মহানন্দার পশ্চিমে মিথিলা। কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে প্রধানতঃ রাঢ় প্রদেশ লইয়া বর্তমান বর্ধমান বিভাগ ; বরেন্দ্র লইয়া রাজসাহী এবং কুচবেহার বিভাগ ; বঙ্গ লইয়াই ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ ; বাগড়ি লইয়া প্রেসিডেন্সি বিভাগ ; এবং মিথিলা বেহারের অন্তর্গত বল্লালের দেশবিভাগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ হইয়াছে। তিনি নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রায় ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি সুবর্ণগ্রাম, গৌড় ও নবদ্বীপ এই তিনটি রাজধানী করিয়াছিলেন, এবং যখন যেখানে থাকিতে ইচ্ছা হইত সেইখানেই থাকিতেন।

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনও একজন প্রসিদ্ধ রাজা। লিখিত আছে যে তিনি বারাণসী, প্রয়াগ এবং শ্রীক্ষেত্রে বিজয়স্তম্ভ সংস্থাপন করেন। মিথিলায় অদ্যাপি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের অব্দ প্রচলিত আছে। উহার চিহ্ন 'লসং'। মাঘ মাসে উহার বৎসরারম্ভ হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ৭৬৭ লক্ষ্মণ সংবৎ চলিতেছিল। সুতরাং জানা যাইতেছে যে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেন রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' নামক স্মৃতি

গ্রন্থ রচনা করেন ; এবং তাঁহার সভায় থাকিয়া জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' প্রণয়ন করেন। 'গীতগোবিন্দে'র ন্যায় সুমধুর গীতকাব্য সংস্কৃত ভাষায় আর নাই। জয়দেব অজয় নদীতীরবর্তী কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সে গ্রামে অদ্যাপি জয়দেবের মেলা হয়। লক্ষ্মণসেনের সভায় জয়দেব ব্যতীত আরও তিনজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম উমাপতি ধর, শরণ ও গোবর্ধন আচার্য।

বোধ হয় লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালই সেনবংশের রাজ্যবিস্তৃতির চরম সীমা। কিন্তু যদিও সেনবংশীয়েরা বিলক্ষণ পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন, তথাপি পালবংশের ক্ষমতা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বুদ্ধগয়ার ক্ষোদিত লেখ্যসকল দেখিয়া জানা যায় যে পালবংশীয় ভূপতিরা হীনপ্রভ হইয়া মগধে রাজত্ব করিতেছিলেন।

বাঙ্গালা-বিজয়॥ লক্ষ্মণসেনের পরে তদীয় দুই পুত্র মাধবসেন ও কেশবসেন যথাক্রমে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন ; এবং তদনন্তর ১১২৩ খৃষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হইয়াই লাক্ষ্মণেয় বাঙ্গালার রাজা হন। তাঁহার বয়স যখন অশীতি বৎসর এবং তিনি গঙ্গাতীরবর্তী নবদ্বীপে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন মগধ রাজ্য ধ্বংস করিয়া বখ্‌তিয়ার খিলজী নামক মুসলমান সেনাপতি বঙ্গদেশে আসিতেছেন এই সংবাদ পৌছিল। পণ্ডিতেরা বলিলেন যে শাস্ত্রে লেখা আছে, মুসলমানদিগের জয় হইবে। সুতরাং অনেক প্রধান প্রধান অমাত্য আপনাদিগের সম্পত্তি লইয়া পূর্ব বাঙ্গালায় প্রস্থান করিলেন। পর বৎসর বখ্‌তিয়ার একদল সেনা সজ্জীকৃত করিয়া বেহার হইতে অগ্রসর হইলেন এবং সহসা এরূপ বেগে নবদ্বীপের নিকট উপস্থিত হইলেন যে কেবল ১৮ জন অশ্বারোহী মাত্র তাঁহার সঙ্গী হইতে পারিল, তদনন্তর অন্য সৈন্যচয় পৌছিল। সমুদয় সেনা উপস্থিত হইলে নবদ্বীপ অধিকৃত হইল ; এবং বৃদ্ধ ভূপতি নৌকাপথে পলায়ন করিলেন (১২০৩ খৃঃ অব্দ)।

দেশের অবস্থা॥ নবদ্বীপের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার উত্তর পশ্চিম ভাগ মুসলমানদিগের হস্তগত হইল। লাক্ষ্মণেয় 'বঙ্গ' প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ দক্ষিণ এবং পূর্ব বাঙ্গালায় সপ্তগ্রাম ও সুবর্ণগ্রাম রাজধানী লইয়া রাজত্ব করিতে লাগিল। এইরূপে রাঢ় ও বাগড়ি এই দুই বিভাগের

দক্ষিণাংশ এবং 'বঙ্গ' প্রদেশ প্রায় আর একশত বৎসর স্বাধীন ছিল ; অনন্তর মুসলমান রাজ্যভুক্ত হয়।

সেনবংশের রাজত্বকালে বঙ্গীয় সমাজবন্ধনের সূত্রপাত হয়। সমাজপতি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ আনীত হইলেন। কৌলীন্যপ্রথা সংস্থাপিত হইল ; এবং তৎসঙ্গে বহু বিবাহ ও কন্যাবিক্রয়ের বীজ রোপিত হইল ; কারণ একদিকে যেমন কুলীনেরা স্বশ্রেণীস্থ ও নিম্নশ্রেণীস্থ কন্যা পাইয়া অনেক বিবাহ করিবার সুবিধা দেখিলেন, তেমনই অপরদিকে নিম্নশ্রেণীস্থ পুরুষগণ সবর্ণা কুমারীবর্গের সংখ্যা হ্রাস হেতু বিবাহের পাত্রী পাওয়া দুষ্কর দেখিয়া অর্থ দ্বারা স্ত্রী ক্রয় করিতেও প্রস্তুত হইলেন।

কুলীনের লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয় যে, সমাজে জ্ঞানী এবং সচ্চরিত্র ব্যক্তিবর্গের নাম বাড়াইবার নিমিত্তই কৌলীন্য মর্যাদার সৃষ্টি হইয়াছিল। কুলীনের যে নয়টি গুণ চাই, সেগুলি সামান্য লোকের থাকে না। কিন্তু কালে কৌলীন্য গুণসাপেক্ষ না থাকিয়া কেবল বংশগত হওয়াতে অনেক বিষময় ফলোৎপত্তির হেতু হইল।

এদিকে আবার শ্রীহর্ষ ও ভট্টনারায়ণের গ্রন্থনিচয়ে দর্শন ও কাব্য চর্চার পথ খুলিল ; এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দে বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রথম তান বাজিল। আদিশূরের আনীত পঞ্চ পণ্ডিত এবং তাঁহাদিগের সন্তান-সন্ততিগণের প্রভাবে লোকের ভাষাও কিয়ৎ পরিমাণে সংস্কৃতানুযায়ী হইতে লাগিল।

সেনরাজারা কেবল বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, এমন নহে ; তাঁহারা স্বয়ং বিদ্যাচর্চা করিতেন। বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, মাধবসেন, ও কেশবসেনের রচিত কবিতা অদ্যাপি পাওয়া যায়।

সেনবংশীয় রাজাদিগের যে কয়েকখানি অনুশাসন পত্র দেখা গিয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে তাঁহারা অনেকেই শৈব ছিলেন। বোধ হয় তৎকালে শৈব ধর্মই এদেশে প্রবল ছিল। কেবল বাঙ্গালায় নহে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও এইরূপ দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগকালে সর্বত্রই শৈবধর্মের উন্নতি হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে শিব ও শক্তির উপাসনা অনার্য জাতিদিগের পুরাতন ধর্ম, এবং উহার সহায়তা অবলম্বন করিয়াই ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধধর্মের বিনাশ সাধন করেন।

বাঙ্গালার ইতিহাস। ১৮৮০

প্রায়শ্চিত্ত

অক্ষয়কুমার সরকার

১৮৪৬ - ১৯১৭

এই যে কলিকাতা হইতে রাজধানী চলিয়া গিয়াছে, এটা তোমাদের সেই কিম্ভূতকিমাকার স্বদেশীর অবশ্যম্ভাবী ফল। স্বদেশী করিতে গিয়া বা হইতে গিয়া, তোমরা যে দেশকে ছোট করিয়া তুলিতেছিলে, তাহারই ফলে, তোমরা সাম্রাজ্যের রাজধানীর মর্যাদা হারাইলে।

বাজারের স্বদেশীর মত বোকামির ব্যাপার বোধ করি জগতে আর কখনও হয় নাই। আমি আমার ছেলেটিকে প্রতিবেশী ছেলেদের অপেক্ষা বেশী ভালবাসি, এ কথা নাকি কেহ আবার ঢাক ঘাড়ে করিয়া, সেই ঢাক পিটাইয়া অলিগলি বলিয়া বেড়ায়। আরে পাগল! পাগল ভিন্ন সকলেই ত তাই করে। তুমি বলিতে পার, সে কথা ঠিক, কিন্তু আমরা বিদেশী দ্রব্যের মোহে পাগলই হইয়াছিলাম; সেই পাগলামি যাই ছুটিল, তাই আহ্লাদে ঢাক বাজাইয়া নৃত্য করিতেছিলাম। বেশ কথা। যদি পাগলামিই ছুটিল, তবে আবার আপনার দেশকে ছোট-করা-রূপ পাগলামি আসিল কেন? সত্য বটে, আমরা ক্ষুদ্রপ্রাণ বাঙ্গালী, বিশ্বপ্রেমের ধারণাই আমাদের হয় না—'বসুধৈব কুটুম্বকং' আমাদের মুখস্থ করা কথা, প্রাণের কথা নহে। তা বলিয়া আমরা কি ভারতমাতা ভুলিয়া বঙ্গমাতাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি?

আমাদের বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত, ধর্ম, কর্ম, তীর্থক্ষেত্র—সকলই ভারত লইয়া। আমাদের ইতিহাসের নাম মহাভারত, কলা-বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ভারতী। আমরা ভারতকে মনে করিলেই কি ভুলিতে পারি?

এই যে ইংরাজী শিক্ষার ফলে, একটু একটু করিয়া দেশভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল সেও ত ভারতভক্তি।

অতি বাল্যকাল হইতে সুর আমাদের কানে লাগিয়া রহিয়াছে—"রুইন্ রুইন্ হলো তোমার সোনার ইণ্ডিয়া।" সেও ত ভারতেরই কথা। তাহার পর ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে কাঁদিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম—

মলিন মুখ-চন্দ্রমা, ভারত তোমারি।
রাত্রিদিবা ঝরিতেছে লোচন-বারি॥

চন্দ্র জিনি কান্তি—চন্দ্র জিনি কান্তি—
হেরিয়ে ভাসিতাম আনন্দে—
আজু এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।

তাহার পর রঙ্গমঞ্চ হইতে ধ্বনিত হইল—

দেখ গো ভারতমাতা তোমার সন্তান
সবে অতি দীন হীন অন্ন বিনা তনু ক্ষীণ,
হেরিলে এদের দশা বিদরিয়া যায় প্রাণ।

তাহার পর ভারতমাতার জন্য সন্তানগণের মনোবেদনা সর্বত্র গীত হইতে লাগিল। হেমচন্দ্রের ভারত-সঙ্গীতে ভারত-বিলাপে দেশ ভরিয়া গেল।

মনোমোহন গায়িলেন,

দিনের দিন সবে দীন
ভারত হয়ে পরাধীন।

আগ্রা হইতে গোবিন্দ রায় গায়িলেন,

কতকাল পরে বল ভারত রে
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে।

বাঙ্গালীর বাঙ্গলা গানের সংগ্রহ হইল—নাম হইল, "ভারতীয় সঙ্গীত-মুক্তাবলী।" তাহাতে উদ্দীপনা, শোচনা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা নামে প্রায় শত সংখ্যক জাতীয় সঙ্গীত প্রকাশিত হইল—সে আজি প্রায় ত্রিশ বৎসরের কথা। তাহার পর প্রায় বিংশতি বৎসর কাল ঐ ভাবেই চলিতেছিল। বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্ত ওরই মধ্যে একবার বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার জন্য শোক করিয়াছিল মাত্র। কিন্তু বঙ্গদর্শন যখন প্রথম হইতেই 'ভারত-কলঙ্ক' ক্ষালনের জন্য ব্যস্ত ছিল, তখন ও কথা অনেকেরই প্রাণে লাগে নাই। পূর্বেই বলিয়াছি ঠাকুরবাড়ী হইতেই ভারতমাতার করুণ গীতি জাঁকাইয়া আরম্ভ হয়।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

মিলে সব ভারত-সন্তান,
একতান মহাপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান

উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমবাবু অজস্র পুষ্প-চন্দন বর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুরবাড়ীরই প্রসাদ, আবার ঠাকুরবাড়ী হইতেই বিষাদ—কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বদেশের পরিধি কমাইয়া ভারতপ্রীতিকে বঙ্গপ্রীতিতে পর্যবসিত করিতে ইদানীং বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি জননীর শ্রীমুখ দিয়া বলাইয়াছিলেন—

আমি অর্জুনেরে
আমি যুধিষ্ঠিরে
করিয়াছি স্তন্যদান
এই কোলে বসি বাল্মীকি করেছে,
পুণ্য রামায়ণ-গান।

আবার "শোচনায়" বলিয়াছিলেন—

ভারতের বনে পাখী গান গায়
স্বর্ণ-মেঘ মাখা ভারতবিমান,
হেতাকার লতা ফুলে ফলে ভরা
স্বর্ণ শস্যময়ী হেতাকার ধরা
প্রফুল্ল তটিনী বহিয়ে যায়।

আর রবিবাবুর "ভুবনমনোমোহিনী" সেও ভারতমাতাকে লক্ষ্য করিয়া রচিত।

ইহার পর, ১৯০৫ সালে নিতান্ত কুক্ষণে লর্ড কর্জন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বঙ্গকে দ্বিখণ্ডীকৃত করিলেন, আর আমাদের রবীন্দ্রনাথ শোকে মুহ্যমান হইয়া সোনার বাংলা ধুয়া ধরিলেন। অতি পবিত্র অথচ ক্ষীণ স্বরে বলিলেন—

বাংলার মাটি
বাংলার জল
বাংলার বায়ু
বাংলার ফল
পুণ্য হৌক পুণ্য হৌক।

আমরা পুরানো পাপী, ভারতমাতার ভিখারী সন্তান। আমরা কিন্তু সেই গরীয়সী জগজ্জননী ভারতমাতাকে ভুলিয়া নবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। রবীন্দ্রনাথ ডাকযোগে আমাকে রাখীসূত্র এবং মন্ত্রসূত্র পাঠাইয়াছিলেন। রাখী বাঁধিলাম, কিন্তু মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

সপ্তসিন্ধু, ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্মাবর্ত, আর্যাবর্ত—এ সকলই ভারতমাতার স্নেহের ও আদরের সন্তান, এখন বঙ্গদেবী ভারত-মাতার প্রাণের পুত্তলী বলিলেও চলে, তা বলিয়া কি জগজ্জননীর মহীয়সী মূর্তি প্রাণ হইতে ঠেলিয়া রাখিতে পারা যায়? তা কখন যায় না।

আজি কয়েক বৎসর হইল স্বদেশীর খুব ধুমধামের দিনে, কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তভবনে বঙ্কিমোৎসবে স্বরেন্দ্রবাবু আর-একটি মহাত্ম (নাম ভুলিয়া গেলাম) আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। আহ্বানকারীরা কিন্তু কেহই উপস্থিত ছিলেন না, বোধ হয় তখন হইতেই মধ্যব্রতীগণ দেশব্রতীদের হইতে একটু পৃথক্ হইতেছিলেন। আমরা সমস্ত দিনরাত্রি উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের দর্শন পাই না।

তাঁহারা না থাকুন, কিন্তু কলিকাতার ও নিকটের বহুতর ভদ্র-সন্তান এবং ভট্টপল্লীর ঠাকুর মহাশয়গণ প্রভৃতি অনেক লোক একত্র হইয়াছিলেন। তখনকার দিনে একজন চাঁই ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—তিনি এই বঙ্গ-মাতার নাম লইয়া বাহ্বাস্ফোটের একজন সর্দ্দার। আমার পান্সী কাঁটাল-পাড়ার ঘাটে লাগিল, আমার পাশে এক গলা গঙ্গাজলে উপাধ্যায় স্নান করিতে-ছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া আমি প্রথমেই প্রশ্ন করিলাম—'আপনারা বঙ্গমাতা বঙ্গমাতা করিয়া এত বাড়াবাড়ি করিয়া জগজ্জননী ভারত-মাতাকে ভুলিতে বলিয়াছেন কেন? আমরা কি কাশী, কাঞ্চী, মথুরার মায়া ভুলিয়া যাইব—? বেদ স্মৃতি পুরাণ ইত্যাদি সমস্তই ভুলিব? রাম লক্ষ্মণ ভীষ্ম দ্রোণের কথা মনেই আনিব না? সে কিরূপ patriotism (দেশভক্তি) হইবে?' ব্রহ্মবান্ধব আমার প্রশ্নে স্তব্ধ হইয়া গেলেন, ধীরে ধীরে ঘাটে উঠিলেন, আমিও উঠিতে লাগিলাম। উপাধ্যায় মাথা পুঁছিতে পুঁছিতে বলিলেন, "আপনি বঙ্কিমোৎসবে আসিতেছেন, তিনি যে সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকলনিনাদকরালে বলিয়া গিয়াছেন, তবেই ত বাঙ্গালী হইল।" আমি বলিলাম, "সন্ন্যাসীরা বুঝিয়াছিল, ভারত-মাতার (fighting force) তরবারি ধরিবার উপযুক্ত ব্যক্তি সপ্তকোটি।" ব্রহ্মবান্ধব আবার বলিলেন, "আনন্দমঠ জিনিষটা বাঙ্গালী লইয়া।" আমি বলিলাম, "কে বলিল! একজন হিমালয় দেশবাসী মহাপুরুষ পরিচালক, আর বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত সমগ্র ভারতের সুবোধ্য সহজ সংস্কৃতে; ইহাতেই কি বুঝা যায় না যে, সেই সঙ্গীত ভারতমাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত।" ব্রহ্মবান্ধব নিরুত্তর হইলেন, আমিও স্বস্তিলাভ

করিলাম। বাস্তবিক ভারতমাতার স্থলে বঙ্গমাতার স্থাপন চেষ্টা দেখিয়া আমার বড়ই অশান্তি হইয়াছিল।

আমি যে কাহারও অপেক্ষা বঙ্গদেবীকে কম ভালবাসি, এ কথা ঠিক নহে; আমি যে শুধু ভালবাসি এমন নহে, আমি ভক্তি করি, পূজা করি। কত জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফলে যে আমরা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিয়াছি, তাহা মনেও গণনা করিতে পারি না। এই যে গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু কাবেরী সপ্তসরিৎপ্লাবিতা পুণ্যভূমি, এই কাশী কাঞ্চী মায়া মথুরা প্রভৃতি সহস্র ধ্যানশোভিত বিস্তীর্ণ ধর্মক্ষেত্র, লক্ষাধিক অভ্রভেদী মঠমন্দির পরিব্যাপ্ত প্রসর ভূভাগ—অনন্তকাল ধরিয়া যদি জননীজঠরে জন্মিতে ও মরিতে হয় তবে তাহা অপেক্ষা মানবের সদ্গতি আর কি আছে?

তোমরা মুখে যাহাই বল, আর গানে যাহাই বল, তোমরা তোমাদের কার্যে ভারতমাকেই দেশমাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলে। সাম্রাজ্যের তাঁতীদের হাতে বোনা কাপড় পরিয়া বোম্বায়ের কলের চাদর মাথায় দিয়া আমরা রজনীকান্তের সঙ্গে বলিয়াছিলাম—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই

সে কোন্ মায়ের দেওয়া? ভারতমাতার ত! তখন যদি ভারতমাতা জাগ্রৎ হইয়া শত সহস্র হস্তে ব্যস্তসমস্ত হইয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া না দিতেন, তবে আমাদের কি দশা হইত মনে কর দেখ। তবেই বুঝ ভারতমাকে তোমরা ভুলিতে বসিয়াছিলে, তিনি তোমাদিগকে ভুলা দূরে থাকুক, তোমাদের লজ্জা নিবারণের জন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন।

কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখনও নয়।

মা কখনও ছেলেকে ভুলিতে পারেন কি? তিনি যে যুগযুগ ধরিয়া আমাদিগকে কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়া আসিতেছেন। কত দৈত্য দানব অসুর 'কালদ' কত যবন ম্লেচ্ছ মায়ের শ্রীঅঙ্গের উপর কত অত্যাচার করিয়াছে, রক্তপাত করিয়াছে, কৈ তিনি কখনও তাঁহার সোনার কোল হইতে আমাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছেন? না, তা কখনও করেন নাই। আমরাই মাকে ছোট করিয়া পলিটিক্সে জোর দিতে যাই, কখনও মাকে বড় করিয়া cosmopolitan বিশ্বমাতার পুত্র হইতে চাই। আমরাই মোহবশে বিড়ম্বনা করিয়া ফেলি।

তোমরাই ক্ষুদ্র পলিটিক্‌সে বলাধান করিবার জন্য এই অনন্তপ্রসারিণী অনন্তস্থায়িনী অনন্তনন্দিনী জগন্মাতাকে ভুলিতে বসিয়াছিলে, সেই পাপের প্রতিফলে, তোমরা রাজধানীর ঐহিক মর্যাদা হারাইয়াছ। তুমি সমগ্র ভারতকে ভুলিতে বসিয়াছিলে, ভারতের রাজশক্তির কেন্দ্রস্থ সেইজন্য তোমার ত্রিসীমার বহির্ভাগে গিয়াছে। কথায় কথায় ভারত গভর্নমেণ্টের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কলিকাতায় মহতী সভা করিতে, এখন চাল চিড়া বাঁধিয়া ইল্লি ডিল্লী গিয়া এখান হইতেও অধিকতর অস্বাস্থ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তোমাকে রাজ-প্রতিনিধির দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে হইবে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয় ত কি বলিব?

যদি এই প্রায়শ্চিত্তের ক্রিয়া সম্পাদন করণার্থ পুনঃপুনঃ গয়া কাশী প্রয়াগ গমনাগমন করিয়া, সমগ্র ভারতের মহাভাব তোমার হৃদয়ে পরিস্ফুট হয়, যদি মথুরা বৃন্দাবন প্রভাস হরিদ্বারের নিয়ত সামীপ্য লাভ করিয়া পবিত্র ভূমির পুণ্যপ্রতাপ বুঝিতে পার, যদি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণার্জুনের বিচরণক্ষেত্রের ধূলিতে ধূসরিত হইয়া মনঃপ্রাণ পবিত্র করিতে পার, তবেই জানিব প্রায়শ্চিত্ত সফল; রাজাজ্ঞা ফলবতী হইয়া বঙ্গবাসীকে আবার ভারতবাসী হইবার যোগ্য করিল। কেবল রাজনীতি রাজনীতি করিয়া উন্মত্ত হইয়ো না। একবার ধর্মের চক্ষে এই রাজধানী পরিবর্তন ব্যাপারটা দৃষ্টি কর, করিয়া ইহার ধর্মসঞ্চয়ের সোপান বলিয়া মনে করিয়া ধন্য হও।

'মানসী'। ফাল্গুন ১৩১৯

প্রাচীন ও নবীন

শিবনাথ শাস্ত্রী

১৮৪৭ - ১৯১৯

আমরা বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইতেছি। ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতি বর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকল দিকেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল। তাহার ক্রম কিঞ্চিৎ নির্দেশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

ইংরাজগণ এ দেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া কিরূপে রাজা হইয়া বসিলেন, সে ইতিবৃত্ত আর বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু বণিকদিগের মনে রাজভাব প্রবেশ করা, ইহা দুই-দশ দিনে ঘটে নাই। যতদিন তাঁহারা বণিক ছিলেন, ততদিন ভাবিতেন এ দেশের লোকের সুখদুঃখের সঙ্গে, উন্নতি-অবনতির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? আমরা বৈধ অবৈধ যেরূপ উপায়েই হউক এখান হইতে অর্থোপার্জন করিয়া লইয়া দেশে যাইব এইমাত্র আমাদের কাজ। এই ভাব কোম্পানির কর্তৃপক্ষের মনে এবং ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির সমুদয় কর্মচারীরও মনে বহুদিন প্রবল ছিল। প্রথম প্রথম কোম্পানির কর্মচারীগণ এরূপ স্বল্প বেতন পাইতেন যে, সেরূপ স্বল্প বেতনে ভদ্রলোক এত দূর দেশে আসে না। কিন্তু অবৈধ অর্থোপার্জনের উপায় এত বেশী ছিল যে, তাহার প্রলোভনে লোকে এ দেশে আসিতে ব্যগ্র হইত। এই সকল কর্মচারীর অধিকাংশকে ফ্যাক্টর বা কুঠিওয়াল বলিত। কুঠিওয়ালগণ কোম্পানির কুঠিসকলের পরিদর্শন করিতেন, বাণিজ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন, হিসাবপত্র রাখিতেন ও বিবিধ প্রকারে কোম্পানির সওদাগরীর কার্যের সহায়তা করিতেন।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি যখন দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, তখন রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির কর্মচারীদিগকে লইতে হইল। ফৌজদারী কার্যের ভার মুর্শিদাবাদের মুসলমান গবর্নমেণ্টের হস্তেই থাকিল। যখন রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির হস্তে আসিল, তখন কোম্পানির কুঠিওয়ালগণই কালেক্টর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা জেলায় জেলায় থাকিয়া কোম্পানির এজেণ্টের ন্যায় সওদাগরীর তত্ত্বাবধান করিতেন, সেই সঙ্গে কালেক্টরের কাজও

করিতেন। বণিকের ভাব তখনও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিল না। যেরূপে হউক অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, এই ভাবটা তাঁহাদের মনে প্রবল থাকিল। আমরা দেশের রাজা, প্রজাদিগের সুখদুঃখের জন্য আমরা দায়ী, এ ভাব তাঁহাদের মনে প্রবেশ করিল না। প্রমাণ স্বরূপ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অগ্রেই বলিয়াছি, নব-প্রতিষ্ঠিত রাজগণ তখন প্রজাকুলের দুর্ভিক্ষ-ক্লেশ নিবারণের জন্য কিছুই করেন নাই। কেবল তাহা নহে; ইহা স্মরণ করিতেও ক্লেশ হয় যে, দুর্ভিক্ষের বৎসরে সমগ্র বঙ্গদেশের প্রজা-সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, তথাপি রাজস্বের এক কপর্দকও ছাড়া হয় নাই। সে বৎসরে যাহা আদায় হইতে পারে নাই পর বৎসরে সে সমগ্র আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছিল। তদানীন্তন গবর্নর ওয়ারেন হেষ্টিংস বাহাদুর ১৭৭২ সালের ৩রা নবেম্বর দিবসে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষকে যে পত্র লেখেন তাহাতে রাজস্ব আদায়ের নিম্নলিখিত তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৭৬৮-৬৯ সালে ১৫২৫৪৮৫৬ টাকা; ১৭৬৯-৭০ সালে ১৩১৪৯১৪৮ টাকা; ১৭৭০-৭১ সালে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বৎসরে ১৪০০৬০৩০ টাকা; এবং ১৭৭১-৭২ সালে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের পর বৎসরে, ১৫৭২৬৫৭৬ টাকা। তবেই দেখা যাইতেছে নূতন রাজগণ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাবৃন্দের রক্তশোষণ করিতে ছাড়েন নাই। সকলে বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিতে পারেন, দুর্ভিক্ষের বৎসরে প্রজাসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যদি কালগ্রাসে পতিত হইল, তবে পর বৎসরে এত রাজস্ব আদায় হইল কিরূপে? ইহার উত্তরে হেষ্টিংস বাহাদুর তাঁহার পত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"It was naturally to be expected that the diminution of the revenue should have kept an equal pace with the other consequences of so great a calamity. That it did not was owing to its being violently kept up to its former standard. To ascertain all the means by which this was effected will not be easy. ··· One tax, however, we will endeavour to describe, as it may serve to account for the equality which has been preserved in the past collections, and to which it has principally contributed. It is called Najar, and it is an assessment upon the actual inhabitants of every inferior description of lands to make

up for the loss sustained in the rents of their neighbours, who are either dead or fled from the country."

অর্থাৎ দুর্ভিক্ষে এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হইয়া রাজস্বের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশের নিকট হইতে সুদে-আসলে বলপূর্বক আদায় করা হইয়াছিল। এই ব্যবহারের সপক্ষে হেষ্টিংস বাহাদুর এইমাত্র বলিয়াছেন যে, এরূপ নিয়ম সে সময়ে দেশে প্রচলিত ছিল, এবং গভর্নমেণ্ট সাক্ষাৎভাবে এ প্রকারে রাজস্ব আদায় করিতে আদেশ করেন নাই। কিন্তু ইহাতে সংশয় নাই, তাঁহারা অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে রাজস্বের এক কপর্দকও ছাড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন; এবং এইরূপ গর্হিত উপায়ে রাজস্ব আদায় হইতেছে জানিয়াও উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

যাক্ ও কথা, আমার মূল বক্তব্য এই যে, ইংরাজগণ দেশের রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও বহুদিন রাজার দায়িত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই। রাজার দায়িত্ব বুঝিলে প্রজার প্রতি এরূপ ব্যবহার সম্ভব নয়। গ্রামের একজন সামান্য জমিদার যাহা করিয়া থাকে, তাহাও তাঁহারা করেন নাই। দেশীয় রাজগণ সর্বদাই দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি বিপদের সময় রাজস্ব রেহাই দিয়া থাকেন এবং এখনও দিতেছেন। আমাদের বাস-গ্রামে জনশ্রুতি আছে, একবার দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামের জমিদারগণ পর্বতসমান অন্নের স্তূপ ও শালতী ভরিয়া ডাল রাঁধিয়া শত শত দুর্ভিক্ষগ্রস্থ প্রজাকে বহুদিন আহার করাইয়া বাঁচাইয়াছিলেন।

এইরূপে বণিকগণের রাজা হইয়া বসিতে ও রাজার কর্তব্য সকল হৃদয়ে ধারণ করিতে অনেকদিন গেল। অপরদিকে প্রজাদিগেরও নূতন রাজাদিগের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে বহুদিন লাগিল। প্রথম প্রথম এ দেশের লোক বুঝিতে পারে নাই ইংরাজেরা এ দেশে স্থায়ী হইয়া বসিতে পারিবেন কিনা? পলাশীর যুদ্ধে তাঁহারা দেশজয় করিলেন বটে, কিন্তু চারিদিকে অন্তর্বিদ্রোহ চলিল। একদিকে মুসলমান নবাবদিগের সহিত বিবাদ, অপরদিকে পশ্চিমে ও দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ও পূর্বে মগদিগের সহিত বিরোধ চলিতে লাগিল। দেশের মধ্যেও বিষ্ণুপুর বীরভূম প্রভৃতি স্থানে দলে-দলে বিদ্রোহী দেখা দিতে লাগিল। ১৮২৫ সালের মধ্যে এই সকল উপদ্রবের অধিকাংশ প্রশমিত হইল। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই এদেশীয়গণ অনুভব করিতে লাগিলেন যে, ইংরাজ-রাজ্য স্থায়ী হইল, এবং তাঁহাদিগকে এই নবরাজ্যের ও নূতন রাজাদিগের প্রয়োজনানুসারে গঠিত হইতে হইবে। ইংরাজ রাজপুরুষগণও হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন যে

ভারত-সাম্রাজ্য বহু বিস্তীর্ণ হইতে যাইতেছে ; এবং সেই সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার তাঁহাদের মস্তকে।

রাজা ও প্রজা উভয়ের মনে এই পরিবর্তন ঘটিয়া উভয় শ্রেণীর মনে একই প্রশ্ন উদয় হইল। রাজারা ভাবিতে লাগিলেন, কি প্রকারে এ দেশ শাসন করি—প্রাচীন বা নবীন রীতি অনুসারে ? প্রজাগণও চিন্তা করিতে লাগিলেন, কাহাকে এখন আলিঙ্গন করি— প্রাচীনকে বা নবীনকে ? ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত এই বিংশিত বর্ষের মধ্যে উক্ত উভয় প্রশ্নের বিচার ও মীমাংসা হইয়াছিল বলিয়া ঐ কালকে বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের সন্ধিক্ষণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছি। যেরূপে মীমাংসা হইয়াছিল তাহা পরে নির্দেশ করিতেছি।

নূতন রাজারা যতদিন এদেশ ও এদেশবাসীদিগকে বুঝিয়া লইতে পারেন নাই, ততদিন কোনও বিভাগেই লঘুভাবে প্রাচীনকে বিপর্যস্ত করেন নাই। সর্ববিভাগেই ভয়ে ভয়ে প্রাচীনের প্রতি হস্তার্পণ করিয়াছেন। রাজনীতি বিভাগে সর্বাগ্রে দেশীয় কর্মচারীদিগের দ্বারা দেশীয় রীতিতেই সকল কার্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথম প্রথম এক-এক জন এদেশীয় নায়েব-দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়াছেন। কিন্তু বহুকালের পরাধীনতাজাত দায়িত্বহীনতা দ্বারা জাতীয় চরিত্রের এমনি দুর্গতি হইয়াছিল, যে, অনেক স্থলে এই নায়েব-দেওয়ানগণ মনে করিতেন বিদেশীয়েরা ত দেশ লুটিয়া লইয়া যাইবে, আমরা ত লাভ লোকসানের ভাগী নই, সুতরাং আমরা যাহা-কিছু সংগ্রহ করিতে পারি করিয়া লই, এইরূপে তাঁহাদের উৎপীড়ন ও উৎকোচাদিতে লোক এত জ্বালাতন হইয়া উঠিত যে, অবশেষে সে সকল পদ তুলিয়া দিতে হইল। ক্লাইবের নায়েব-দেওয়ান গোবিন্দ রামের ও হেষ্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কথা অনেকেই অবগত আছেন। এইরূপে কিছুদিন গেল। শেষে, লর্ড কর্নওয়ালিস বাহাদুর এদেশীয়দিগকে উচ্চ উচ্চ পদ হইতে অপসারিত করিয়া সেই সকল পদে ইউরোপীয়দিগকে স্থাপন করিলেন। তখন হইতে এদেশীয়গণ সর্ববিধ উচ্চ পদ হইতে চ্যুত হইয়া হীন-দশায় পতিত হইলেন। তৎপরে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত এদেশীয়দিগের সেরেস্তাদারের উপরের পদে উঠিবার অধিকার থাকিল না। এই কালকে এদেশীয়দিগের প্রকৃত পতনের কাল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কারণ এই সময় হইতেই এদেশীয়গণ সর্ববিধ সম্মানের পদ হইতে অধঃকৃত হইয়া উন্নতির সম্ভাবনা ও তজ্জনিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইতে বিদূরিত হইয়া, ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও ক্ষুদ্রাশয়তার মধ্যে নিমগ্ন হইল। এই ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও ক্ষুদ্রাশয়তার

গর্তে এদেশীয়গণ এখনও পড়িয়া রহিয়াছেন। এই লক্ষ্য, চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার ক্ষুদ্রতাকে পরাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ শোচনীয় ফল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। কারণ কোনও জাতি কিছুকাল এই অবস্থাতে বাস করিলে তাহাদের জাতীয় জীবন হইতে মনুষ্যত্ব ও মহত্ব লাভের স্পৃহা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আইন-আদালত সম্বন্ধেও রাজারা ভয়ে ভয়ে বহুকাল যথাসাধ্য প্রাচীন রীতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি বিলাত হইতে নবাগত সিবিলিয়ানদিগকে এদেশীয় ভাষা ও এদেশীয় আইন প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন বহু বৎসর জেলার জজদিগের সঙ্গে এক-এক জন হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলমান মৌলবী থাকিতেন, তাঁহারা এদেশীয় আইনের ব্যাখ্যা করিয়া জজের সাহায্য করিতেন।

শিক্ষাবিস্তার-বিষয়েও তাঁহারা বহু বৎসর প্রাচীনের পক্ষপাতী ছিলেন। এমন কি এদেশীয়দিগকে চিকিৎসাশাস্ত্র শিখাইবার জন্য কিছুদিন সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে চরক সুশ্রুতের ক্লাস ও মাদ্রাসার সঙ্গে আবিসেন্নার ক্লাস রাখা হইয়াছিল।

অতএব ইহা নিশ্চিত যে ইংরাজগণ লঘুভাবে প্রাচীনের প্রতি হস্তার্পণ করেন নাই ; কতক ভয়ে, কতক লোকরঞ্জনার্থে, কতক প্রকৃষ্ট রাজনীতি বোধে, তাঁহারা প্রারম্ভে সর্ববিষয়ে প্রাচীনকে রক্ষা করিয়াই চলিতেন। এই সন্ধিক্ষণের মধ্যে মহা তর্কবিতর্কের পর প্রাচীনকে বিপর্যস্ত করিয়া নবীনের প্রতিষ্ঠা করা হইল। ইংরাজপক্ষে মেকলে ও বেন্টিঙ্ক এই নবযুগের সারথি হইয়াছিলেন।

এই আন্দোলন এদেশীয়দিগের মনেও উঠিয়াছিল। তাঁহারাও এই সন্ধিক্ষণে বিচার করিতে লাগিলেন, প্রাচীন ও নবীন ইহার মধ্যে কাহাকে বরণ করিবেন ? তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তিরা স্থির করিলেন যে, প্রাচীনকে বর্জন করিয়া নবীনকেই বরণ করিতে হইবে। দেশীয় পক্ষে রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও এই পুরুষত্রয়, সারথ্য কার্যের ভার লইয়াছিলেন।

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' : পঞ্চম পরিচ্ছেদ। ১৯০৪

বঙ্গ বিজেতা

রমেশচন্দ্র দত্ত

১৮৪৮ - ১৯০৯

১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ ও বিহার দেশে হিন্দুরাজ্যের নাম লোপ হইল। সেই অবধি ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আফগান অথবা পাঠানেরা এই দেশে রাজত্ব করেন। ইঁহারা কখন দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিতেন, কখন বা সময় পাইলে স্বাধীনভাব অবলম্বন করিতেন। ইঁহাদিগের রাজ্যতন্ত্র অনেক ইউরোপীয় ফিউডল রাজতন্ত্রের সদৃশ ছিল। দেশের সিংহাসন শূন্য হইলে কখন কখন সেনাপতিগণ আপনাদিগের মধ্যে কাহাকেও রাজা স্থির করিতেন, কখন বা কোন সেনাপতি আপন বাহুবলে সিংহাসনে আরোহণ করিতেন। দেশের অধিপতি কোন একটি উৎকৃষ্ট জেলা আপন অধীনে রাখিতেন, অন্যান্য জেলা প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতেন। তাঁহারা আবার আপন অধীনস্থ কর্মচারীদিগের মধ্যে জমি বিভাগ করিয়া দিতেন। কালক্রমে এই প্রকার রাজতন্ত্রের কিছু কিছু পরিবর্তন হইতে লাগিল। সেনাপতিগণ কখন কখন বঙ্গাধিপতির অধীনতা স্বীকার করিতেন, আবার সুযোগ পাইলেই আপন আপন জেলায় স্বাধীনভাব অবলম্বন করিতেন। বঙ্গদেশীয় হিন্দুগণ সাহস ও যুদ্ধকৌশলে ন্যূন হইলেও অতিশয় বুদ্ধিমান ও কর্মঠ, এইজন্য পাঠান অধ্যক্ষগণ তাঁহাদিগকেই প্রধান প্রধান কার্যে নিযুক্ত করিতেন, তাঁহাদিগকেই জমিদার করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা প্রজার নিকট কর সংগ্রহ করিতেন এবং তাঁহাদিগকেই বিশেষ সম্ভ্রমের পাত্র করিতেন। এমন কি, বঙ্গদেশের পাঠান রাজাদিগের মধ্যে আমরা একজন হিন্দুরাজারও নাম দেখিতে পাই। ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংস রাজা বঙ্গদেশের অধিপতি হইয়া সাত বৎসর নিরাপদে রাজত্ব করেন। তিনি পূর্বে জমিদার ছিলেন, আপন বাহুবলে সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার পুত্র মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করেন ও তাঁহার বংশ সর্বস্বদ্ধ চত্বারিংশৎ বৎসর বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। উপরিউক্ত বিবরণ হইতে অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে যে, দেশে হিন্দুদিগের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। দেশস্থ জমিদার জায়গীরদার অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন; প্রধান প্রধান জমিদারদিগের কিছু কিছু সৈন্য থাকিত ও যুদ্ধ সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধাগণ তাহাদিগের স্ব স্ব দলভুক্ত করিতে বিশেষ যত্ন করিতেন।

দেশের কৃষক ও প্রজাগণ সম্পূর্ণরূপে জমিদারদিগের অধীন থাকিত। জমিদারগণ সচ্চরিত্র ও সদয় হইলে কৃষকদিগের আনন্দ; জমিদার প্রজাপীড়ক হইলে তাহাদিগের আর নিস্তার থাকিত না। পরাক্রান্ত জমিদারগণ প্রায়ই আপনাদিগের মধ্যে যুদ্ধ করিতেন, তাহাতেও দেশের বিশেষ অনিষ্ট হইত। ফলতঃ সে সময়ে যে জমিদার বিশেষ বুদ্ধিকুশল হইতেন, তিনি ছলে বলে কৌশলে অন্যান্য জমিদারের নিকট হইতে জমি লইয়া আপন অধিকার বাড়াইতে পারিতেন। প্রজাদিগের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ হইলে তাঁহারা কিম্বা তাঁহাদের কর্মচারিগণ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন, দস্যু ও দুশ্চরিত্র লোকদিগকে তাঁহারাই দণ্ড দিতেন, তাঁহারাই গ্রামে গ্রামে শান্তিরক্ষা করিতেন। অধিক কি, তৎকালে তাঁহারাই প্রজাগণের 'বাপ-মা' ছিলেন। প্রজারা কি হারে কর দিবে, তাহা তাঁহারাই নির্ধারিত করিতেন; তাঁহারা যাহা চাহিতেন, তাহা দিতে অসম্মত হওয়ার কোন প্রকার সাধ্য ছিল না। তাঁহারা অবিচার করিলে সুবিচারের সম্ভাবনা ছিল না। ফলতঃ জমিদারেরাই প্রজাদিগের পালনকর্তা ও বিচারপতি ছিলেন, তাঁহারাই প্রজাদিগের রক্ষক ও রাজা ছিলেন।

১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে শেষ পাঠান রাজা দায়ুদ খাঁ বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার পর-বৎসরই আকবর শাহ এই দেশ জয় করিবার অভিলাষ করেন। তিনি স্বয়ং পাটনা নগর বেষ্টন ও অধিকার করিয়া মনাইম খাঁকে সেনাপতি রাখিয়া দিল্লী যাত্রা করেন। মনাইম খাঁ নামমাত্র সেনাপতি ছিলেন; ক্ষত্রিয়-চূড়ামণি রাজা টোডরমল্লই বস্তুতঃ পাঠানদিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ জয় করেন। তিনি দায়ুদ খাঁকে বারবার পরাস্ত করিয়া অবশেষে কটকের মহাযুদ্ধে জয়লাভ করেন। তাহাতে দায়ুদ খাঁ ভীত হইয়া ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ ও বিহার দেশ মোগলদিগকে অর্পণ করিলেন ও কেবল উড়িষ্যা মাত্র আপন অধীনে রাখিলেন। এই সন্ধির পরই টোডরমল্ল দিল্লী যাত্রা করেন, এবং দায়ুদ খাঁ অবকাশ পাইয়া সন্ধির কথা বিস্মৃত হইয়া পুনরায় বঙ্গদেশ অধিকার করেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর শাহ হোসেন কুলী খাঁকে সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করেন; তিনি নামমাত্র সেনাপতি; রাজা টোডরমল্লই সর্বেসর্বা। টোডরমল্ল দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশে আসিয়া রাজমহলের মহাযুদ্ধে দায়ুদ খাঁকে পরাস্ত করেন। সেই যুদ্ধে দায়ুদ খাঁ নিহত হয়েন ও পাঠান রাজ্য বিলুপ্ত হয়। দিল্লীশ্বর হোসেন কুলী খাঁকে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, এবং টোডরমল্ল পুনরায় দিল্লী প্রত্যাগমন করেন। হোসেন কুলী ও তৎপরে মজফ্‌ফর খাঁ চারি বৎসরকাল বঙ্গদেশ শাসন করেন।

১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল ও মজফ্‌ফর খাঁ নিধন প্রাপ্ত হইলেন। আকবর শাহ অতিশয় বুদ্ধিমান সম্রাট্ ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, যে হিন্দু সেনাপতি বঙ্গদেশ দুইবার জয় করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহই সেই শত্রুসঙ্কুল দেশ দিল্লীর অধীনে রাখিতে পারিতেছেন না। সুতরাং ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমল্ল সেনাপতি ও শাসনকর্তা-পদে নিযুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে প্রেরিত হইলেন।

'শতবর্ষ'। ১৮৭৯

মারাঠী ও বাঙ্গলা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৪৯ - ১৯২৫

আজকাল ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের ভাষা শিক্ষা ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন—ইহা একটা শুভ চিহ্ন বলিতে হইবে। ভারতবাসীদিগের মধ্যে একতা স্থাপিত হইবার পক্ষে যতগুলি বাধা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ভাষার বাধাও বড় একটি কম নহে। সচরাচর, ভারতবর্ষকে একটি দেশ বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাকে একটি মহাদেশ অথবা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। য়ুরোপখণ্ডের মধ্যে যেরূপ ইংরাজী ফরাসী জার্মান প্রভৃতি ভাষা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সেইরূপ বাঙ্গলা মারাঠী গুজরাটী প্রভৃতি বিবিধ ভাষা প্রচলিত। আজকাল, রেলপথের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দূরত্বের বাধা ক্রমশই অপসারিত হইতেছে এবং আমাদিগের রাষ্ট্রীয়-সভার অধিবেশন উপলক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসীদিগের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে ভাষার বন্ধন ও একতা না থাকা প্রযুক্ত তেমন আশানুরূপ ফল লাভ হইতেছে না। ইংরাজী ভাষায় একরূপ কাজ চলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু এই নিতান্ত পরকীয় ভাষার অবলম্বনে আমরা পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারি না। ভাষা-সম্বন্ধে আমাদের নিকট একজন ইংরাজও যেরূপ, একজন মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুও সেইরূপ। উভয়েরই সহিত ইংরাজী ভাষায় আমাদিগের কথাবার্তা চালাইতে হয়। ইহা কম অসুবিধার কথা নহে। এই ভাষার বাধা একেবারে অপসারিত হইবারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। গণনা করিয়া দেখিলে, আমাদিগের প্রাদেশিক ভাষার সংখ্যা, বোধকরি, দ্বাদশেরও অধিক হইবে। এক বোম্বাই অঞ্চলের মধ্যেই তো কতকগুলি ভাষা। এইসমস্ত ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে আমাদের প্রত্যেকের এক-একটি 'সার উইলিয়ম জোন্স্' না হইলে চলে না। তবে, এই পর্যন্ত করা যাইতে পারে— যাহার যতটুকু সাধ্য, আপনার ভাষা ছাড়া, আরও দুই-একটি প্রাদেশিক ভাষা শিখিবার চেষ্টা করা; তাহা হইলেও কতকটা কাজ হয়। বিশেষতঃ, যে উপভাগগুলির মধ্যে নৈকট্য-সম্বন্ধ বর্তমান

—প্রাকৃত হইতে যাহাদিগের উৎপত্তি— সেইসকল ভাষার অনুশীলনে, আর কিছু না হউক, অন্ততঃ নিজ নিজ ভাষার ব্যুৎপত্তি বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান লাভ হইতে পারে। মারাঠী ও বাঙ্গলার মধ্যে এইরূপ নিকট-সম্বন্ধ বর্তমান—উভয়ই এক জননী হইতে প্রসূত। সুতরাং মারাঠী ভাষার আলোচনায়, বাঙ্গলা ভাষারও কতকটা উপকার হইতে পারে।

মারাঠী ও বাঙ্গলা ভাষার গঠনে দুই-একটি মূলগত প্রভেদ লক্ষিত হয়। মারাঠী ভাষায় তিন লিঙ্গ : পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। এই লিঙ্গভেদ প্রকরণ সকল সময়ে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে নিষ্পন্ন হয় না। 'দউত' (দোয়াৎ) শব্দ, 'বাট' (পথ) শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ; 'বাস' (গন্ধ) শব্দ পুংলিঙ্গ ; 'মাঞ্জর' (মার্জার—বিড়াল) শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ; 'কুতরা' (কুকুর) শব্দ পুংলিঙ্গ ; 'মনুষ্য' শব্দ কখনও পুংলিঙ্গ, কখনও ক্লীবলিঙ্গ। 'বাট' শব্দ কেন স্ত্রীলিঙ্গ, এবং 'মাঞ্জর' শব্দ কেন ক্লীবলিঙ্গ হইল, ইহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্দেশ করা যায় না। চিরপ্রচলিত ব্যবহারই ইহার একমাত্র কারণ। নাম ও সর্বনামের লিঙ্গ অনুসারে, স্থল বিশেষে, ক্রিয়াপদের বিভক্তিতে রূপান্তর উপস্থিত হয়। বক্তা স্ত্রীলোক হইলে, 'মী করিত্যে' (আমি করি), পুরুষ হইলে 'মী করিতো' এইরূপ প্রয়োগ করা হয়। এ গেল, কর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ। আবার কর্মবাচ্যের প্রয়োগের সময়, কর্তা যে লিঙ্গেরই হউক না, তাহার লিঙ্গ অনুসারে ক্রিয়াপদ পরিবর্তিত না হইয়া, কর্মপদের লিঙ্গ অনুসারে ক্রিয়াপদের রূপান্তর হয়। যথা 'মী কাম কেলে' (আমি কাজ করিতেছি—অথবা আমা কর্তৃক কাজ কৃত হইয়াছে), 'মী বাট পাহিলী' (আমি পথ দেখিয়াছি—অথবা আমা কর্তৃক পথ দেখা হইয়াছে) এই দুই বাক্যের মধ্যে 'কাম' ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া 'কেলে' এই ক্রিয়াপদ একারান্ত হইল এবং 'বাট' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া 'পাহিলী' এই ক্রিয়াপদ ঈকারান্ত হইল। ইহা কতকটা হিন্দী ভাষার অনুরূপ। আর-এক প্রভেদ—বাঙ্গলায়, বহুবচনে ক্রিয়ার বিভক্তিতে কোন রূপান্তর হয় না, কিন্তু মারাঠী ভাষায় তাহা হইয়া থাকে। যথা,—'সে করে' 'তাহারা করে' এই দুই বাক্যগত ক্রিয়াপদের রূপ একই ; কিন্তু মারাঠী ভাষায় এই স্থলে 'তো করিতো' 'তে করিতাত' এইরূপ হইয়া থাকে। আরও কিছু কিছু প্রভেদ আছে। তাহা এখানে বলা অনাবশ্যক।

এই সকল কারণে, বিশেষতঃ লিঙ্গভেদের কোন নিয়ম না থাকায়, কোন বৈদেশিকের পক্ষে মারাঠী ভাষায় শুদ্ধ রূপে কথা কহা বড়ই কঠিন। পদে পদে

তাঁহার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। বাঙ্গলায় লিঙ্গভেদের কোন কড়াকড় নিয়ম নাই —একপ্রকার ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। আমরা ভাষার সৌন্দর্য ও উপযোগিতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্থলবিশেষে কখন বা 'সুন্দরী ললনা' কখন বা 'সুন্দর মেয়েটি' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারি। এবিষয়ে মারাঠী ভাষায় আবার একটু স্বতন্ত্র নিয়ম। যে বিশেষ্য শব্দগুলি খাস মারাঠী, বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে সেই সকল বিশেষণ পদের লিঙ্গভেদ হইয়া থাকে— কিন্তু যে সকল বিশেষণ পদ খাস সংস্কৃত তাহার কোন পরিবর্তন হয় না। মারাঠী 'চাঙ্গলা' (ভাল—সুন্দর) শব্দ যখন স্ত্রী সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, তখন 'চাঙ্গলী' এইরূপ প্রয়োগ হয়—কিন্তু 'সুন্দরী' এই শব্দ, কোন স্ত্রীলিঙ্গবাচক বিশেষ্য পদের পূর্বে বসে না। 'চাঙ্গলা বায়কো' (ভাল স্ত্রী) ও 'সুন্দর স্ত্রী' এইরূপ প্রয়োগ হয়, কিন্তু 'সুন্দরী স্ত্রী' এইরূপ প্রয়োগ কখনই হয় না। বাঙ্গলায় এই বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ স্বাধীনতা আছে। আমার বোধহয়, কোন ভাষার মধ্যে কৃত্রিম নিয়মের যতই বাঁধাবাঁধি ও আঁটাআঁটি, ভাবস্ফূর্তির পক্ষে ততই ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু মারাঠী ভাষায় এরূপ কৃত্রিম বাধাসত্ত্বেও, মারাঠী কবি মোরোপন্ত কর্তৃক ১০৮ প্রকারের পদ্য-রামায়ণ রচিত হইয়াছে। ইহা সামান্য বাহাদুরী নহে। মোরোপন্ত রচিত একটি রামায়ণের নাম 'পরন্তু রামায়ণ'—অর্থাৎ, ইহার প্রত্যেক শ্লোকে 'পরন্তু' এই শব্দটি কোন প্রকারে ঘটানো হইয়াছে। এই শব্দ-মল্ল কবিদিগের রচনায়, ভাব অপেক্ষা কথার কৌশলই অধিক, ফরাসী ভাষার মধ্যে এইরূপ লিঙ্গভেদের কৃত্রিমতা লক্ষিত হয়। কতকটা এই কারণে হয়তো ইংরাজী কবিতা ফরাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। কবিতাতে কতকটা বন্ধন আবশ্যক বটে, কিন্তু অতিবন্ধনও দোষাবহ। এই বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের জন্যই অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। সে যাহোক, ভাষায় লিঙ্গভেদ রাখা যে একেবারেই দোষের, আমি এ কথা বলি না। তবে, মারাঠী ও ফরাসী ভাষার ন্যায় অতটা কৃত্রিম বাড়াবাড়ি ভাল নহে। লিঙ্গভেদে ভাষার কতকটা সুবিধাও আছে। সর্বনামের মধ্যে লিঙ্গভেদ থাকায়, অনেক সময়, ভাষার অস্পষ্টতা নিবারণ হয় এবং বারম্বার নামের পুনরুক্তি করিতে হয় না। বাঙ্গলা ভাষায় এইরূপ লিঙ্গভেদ না থাকায়, সর্বনাম ব্যবহার না করিয়া আসল নামই অনেক সময় পুনরাবৃত্তি করিতে আমরা বাধ্য হই। ইহাতে ভাষার জোরও কতকটা কমিয়া যায়।

বাঙ্গলা ভাষা অপেক্ষা, মারাঠী ভাষায় নাম ও সর্বনামের বহুবচন অতি

শোভন ও সহজভাবে নিষ্পন্ন হয়। বাঙ্গলায়, 'তোমার' এই পদের বহুবচনে 'তোমাদের' বলিতে হইবে। এই স্থলে মারাঠীতে 'তুমচা'র বহুবচনে 'তুমচে' এইরূপ প্রয়োগ হয়। তাছাড়া, বাঙ্গলা ভাষায় বস্তুবাচক নাম কিম্বা সর্বনামের বহুবচন নিষ্পন্ন করিতে হইলে 'সকল' 'সমূহ' প্রভৃতি কথা জুড়িয়া দিতে হয়। 'হেঁ'র বহুবচনে সেখানে 'হী' বলিলেই চলে, বাঙ্গলায় সেই স্থলে 'এই'র বহু-বচনে 'এই-সকল' বলিতে হয়। ফলকথা, ব্যাকরণের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, বাঙ্গলা অপেক্ষা মারাঠী ভাষার গঠন যে অধিকতর পরিপুষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই।

আর-এক কথা, বাঙ্গলা অপেক্ষা মারাঠী জোরালো। তাহার প্রধান কারণ, বাঙ্গলা অপেক্ষা মারাঠী ভাষায় রূঢ়িক ক্রিয়াপদ অধিক আছে। বাঙ্গলা ভাষায়, বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সহিত 'কৃ' ও 'ভূ'-ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ যোগ করিয়া অধিকাংশ ক্রিয়াপদ সংগঠিত। এইরূপ যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রয়োগে ভাষার জোর কমিয়া যায়। আমাদের কবিবর মাইকেল মধুসূদন, কবিতার ভাষায় বলবিধান করিবার জন্যই অনেক রূঢ়িক ক্রিয়াপদ রচনা করিয়া স্বীয় কবিতা মধ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। এই-সকল অভিনব ক্রিয়াপদের প্রয়োগ, সেই সময়ে অনেকেরই অসহ্য মনে হইয়াছিল। পদ্যেই যখন এইরূপ—গদ্যের তো কথাই নাই। ফলকথা, এই প্রকার প্রয়োগ অধিক পরিমাণে আমাদের ভাষায় চলে না—ইহা বাঙ্গলার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আমরা বাঙ্গলা গদ্যে 'রুষিছে' কিম্বা 'লাজিছে'—এইরূপ বাক্য কখনই প্রয়োগ করিতে পারি না। কিন্তু মারাঠী ভাষায় এইরূপ রূঢ়িক ক্রিয়াপদের প্রচুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলা অপেক্ষা মারাঠী যে জোরালো, তাহা এই উভয় ভাষার উচ্চারণেই কতকটা প্রকাশ পায়। মারাঠীর উচ্চারণ অনেকটা সংস্কৃতের অনুরূপ। যদিও মারাঠী অপেক্ষা বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ অধিক, তথাপি কোন মারাঠীর সম্মুখে বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহিলে, তাহার মধ্যে যে কোন সংস্কৃত শব্দ আছে, এরূপ তাঁহার অনুভবই হয় না। আমাদের বিকৃত উচ্চারণই ইহার একমাত্র কারণ। আমাদিগের সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ যতই দিগ্‌গজ পণ্ডিত হউন-না কেন, এই উচ্চারণের দোষে তাঁহারা অন্য প্রদেশীয় লোকদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন। সংস্কৃত হিন্দী মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় উচ্চারণের মুখ্যগতি যেরূপ খোলা আ-কারের দিকে, বাঙ্গলা ভাষার উচ্চারণপ্রবণতা সেইরূপ

বোজা ও-কারের দিকে। আমার বোধ হয়, শারীরিক দুর্বলতাই ইহার মূল কারণ। বাঙ্গালী অপেক্ষা মারাঠীদিগকে দেখিতে যেরূপ মজবুৎ, উহাদের ভাষাতেও সেইরূপ অধিক বলের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেহ যেরূপ ক্ষীণ ও সুকুমার, আমাদের ভাষাও সেইরূপ।

পক্ষান্তরে বাঙ্গলা ভাষা মারাঠী অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সুললিত ও পরিমার্জিত। মারাঠী ভাষার জোর, যেন একটু রূঢ়তার সীমায় গিয়া উপনীত হইয়াছে। 'ড়' 'ঢ়' 'ণ' এইসকল কাঠখোট্টা কঠিন বর্ণসকল মারাঠী ভাষায় বারম্বার শুনিতে পাওয়া যায়। মারাঠী ভাষা প্রথম শুনিলে মনে হয় যেন উহা ওড়িয়া ও হিন্দী এই দুই ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন। মারাঠী ভাষার উচ্চারণে 'ড়' 'ঢ়' প্রভৃতি অক্ষর যেরূপ ক্রমাগত আমাদের কানে আইসে, বাঙ্গলা ভাষার উচ্চারণে সেইরূপ 'চ' 'ছ' অক্ষর মারাঠীদিগের কানে বারম্বার উপস্থিত হয়। মারাঠী ভাষায় দুই চারিটি বর্ণের উচ্চারণের একটু বিশেষত্ব আছে—উহা সংস্কৃতের অনুরূপ নহে। মারাঠীতে 'ল' এই অক্ষরের উচ্চারণ দুই প্রকার—এক, সাধাসিধা 'ল'এর মত; আর-এক, কতকটা আমাদের 'ড়'এর মত। মারাঠীদিগের 'ড়'এর উচ্চারণ অনেকটা 'ড' ঘেঁষিয়া। উহাদের মধ্যে চ ছ ঝ —এই অক্ষরগুলিরও দুইপ্রকার উচ্চারণ শুনিতে পাওয়া যায়। এক উচ্চারণ, আমাদের ন্যায়; আর-এক উচ্চারণ, কতকটা আমাদের পূর্ববঙ্গীয়দিগের ন্যায়। এইসকল বিভিন্ন উচ্চারণের স্বতন্ত্র লিপিচিহ্ন-পদ্ধতি আমাদের মধ্যে প্রবর্তিত হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ, ইংরাজী শব্দ বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিবার সময় এই সম্বন্ধে অসুবিধা বিলক্ষণ অনুভব করা যায়। মহারাষ্ট্রীয়েরা তবু এ বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা একটু অগ্রসর। ইংরাজী স্বরবর্ণের বিভিন্ন উচ্চারণ-প্রকাশক দুই-একটি চিহ্ন তাঁহারা পুস্তকাদি ছাপাইবার সময় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। 'ইটালিকস'এর স্থলে একটু বড় ও মোটা অক্ষর ব্যবহৃত হয়। ইংরাজী V অক্ষর মারাঠীতে লিখিবার সময় 'হ্ব' এই যুক্তাক্ষর তাঁহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। 'গবর্নমেণ্ট' না লিখিয়া তাঁহারা 'গহ্বর্নমেণ্ট' লিখেন। এইরূপ লিখিলে, ইংরাজী V অক্ষরের অনেকটা কাছাকাছি শুনায়।

বাঙ্গলা ভাষায় যদি একটি ভাল অভিধান প্রস্তুত করিতে হয়—যদি প্রচলিত দেশজ শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা আবশ্যক হয়, তবে মারাঠী প্রভৃতি প্রাকৃতের অপভ্রংশ ভাষাগুলির অনুশীলন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহার একটি দৃষ্টান্ত, যথা—আমাদের 'আনাড়ি' শব্দ; এই শব্দের ব্যুৎপত্তি কি?

মারাঠী ভাষাতে 'আড়ানী' বলিয়া একটি শব্দ আছে উহার প্রায় একই অর্থ। হইতে পারে 'আড়ানী' এই শব্দটি উল্টাইয়া 'আনাড়ি' শব্দে পরিণত হইয়াছে। মারাঠী পণ্ডিতগণ বলেন, 'অজ্ঞানী' হইতে 'আড়ানী' শব্দ উৎপন্ন।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষার অনুশীলনে আর-একটা উপকার আছে। আজকাল আমরা ইংরাজী বিদ্যা ও সাহিত্যের সংশ্রবে অনেক নূতন কথা ও নূতন ভাব অর্জন করিতেছি। এই-সকল ভাব আমাদের দেশভাষায় প্রকাশ করা আবশ্যক হওয়ায়, কি মারহাট্ট কি বাঙ্গালী আমরা উভয়েই এই-সকল কথা ও ভাবের অনুরূপ শব্দ রচনা ও সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের উভয়েরই সাধারণ শব্দভাণ্ডার সংস্কৃত ভাষা। অতএব আমাদের উভয়ের রচিত ও সংগৃহীত প্রতিশব্দগুলি যদি পরস্পর মিলাইয়া দেখি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব সেগুলি যথাযথ হইতেছে কিনা। যদি তাহাদিগের মধ্যে অমিলদেখি, তাহা হইলে আমাদিগের মনে স্বভাবতই সংশয় উপস্থিত হয়। তখন কোন্ প্রতিশব্দটি ঠিক তাহা আর একবার বিচার করিয়া দেখিতে পারি। দৃষ্টান্ত, যথা, দুটি ইংরাজী শব্দ 'nerve' ও 'muscle'। ইহাদের প্রতিশব্দ কি ? আমরা 'nerve'কে স্নায়ু বলি। মারাঠীতে 'muscle'কে স্নায়ু বলে ও 'nerve'কে মজ্জাতন্তু বলে। চরক প্রভৃতি পুরাতন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে স্নায়ুর যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা অতি অস্পষ্ট, তাহা হইতে প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করা সুকঠিন। ইংরাজী 'sinews' শব্দের সহিত 'স্নায়ু' শব্দের কতকটা সাদৃশ্য আছে। এই জন্য মনে হয়, স্নায়ু 'muscle' শব্দের প্রতিশব্দ হইলেও হইতে পারে।

রাষ্ট্রীয় সভা (National Congress) রাষ্ট্রীয় স্তোত্র (National Anthem) সংস্থা (Institution) অনুক্রমপত্র (Progamme) আবৃত্তি (Edition) পদবীদানসমারম্ভ (Convocation) স্থানিক স্বরাজ্য (Local self-government) ব্যবস্থাপক মণ্ডলী অথবা অন্তরঙ্গসভা (Executive committee) অধ্যক্ষ (President) উপাধ্যক্ষ (Vice President) প্রমুখ (Chairman) মন্ত্রী (Secretary) দেশবান্ধব (Fellow-countryman) স্বাগত সভা (Reception committee) মৃত্যুপত্র (Will) আরোপী (Accused) প্রেক্ষক (Visitor) সাংস্থানিক (Native states) ভূত-দয়া (Humatity)।

উপরোক্ত শব্দগুলি বাঙ্গালা প্রতিশব্দের সহিত মিলাইয়া দেখিলে উহার মধ্যে

কোন কোন শব্দ, বাঙ্গলা অপেক্ষা সুরচিত বলিয়া মনে হয়। 'জাতীয় সভা' অপেক্ষা 'রাষ্ট্রীয় সভা' আখ্যাটি অধিকতর উপযুক্ত, কেননা, যে সভার অন্তর্ভূত হিন্দু মুসলমান পারসী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোক, তাহাকে 'জাতীয় সভা' না বলিয়া 'রাষ্ট্রীয় সভা' বলাই সঙ্গত। 'দেশবান্ধব' কথাটি মন্দ নয়। Institution শব্দের বাঙ্গলা কোন প্রতিশব্দ প্রচলিত আছে কিনা বলিতে পারি না; কখন কখন, অনুষ্ঠান শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু উহা ঠিক নহে। বরং 'প্রতিষ্ঠা' কিংবা 'প্রতিষ্ঠান' এই অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মারাঠী 'সংস্থা' শব্দ কি বাঙ্গলায় গ্রহণ করা যায় না? Edition এই শব্দের মারাঠী প্রতিশব্দ 'আবৃত্তি' ও বাঙ্গলা প্রতিশব্দ 'সংস্করণ'; এই উভয়ের মধ্যে কোনটি ঠিক? 'অনুক্রমপত্র' (Programme) ইহার স্থলে 'অনুক্রমণিকা' বলিলে কি চলে না? 'রাষ্ট্রীয় স্তোত্র' National Anthemএর সুন্দর প্রতিশব্দ।

আর কতকগুলি ইংরাজি পারিভাষিক শব্দের মারাঠী প্রতিশব্দ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—

উত্তর ধ্রুব (North Pole) গুরুত্ব-মধ্য (Centre of gravity) বর্গ (class) চতুর্থ ইয়ত্তা (Fourth Standard) বাতাবরণ (Atmosphere) ভূশির (Cape) দ্বীপকল্প (Penninsula) দীর্ঘ-বর্তুল (Ellipse) উপপদ (Article) সিদ্ধ বা অব্যুৎপন্ন শব্দ (Primitive word) সাধিত বা ব্যুৎপন্ন (Derivative word) উভয়ান্বয়ী (Conjunction) শব্দযোগী (Post Position) কেবল-প্রয়োগী অথবা উদ্গারবাচী (Interjection) দর্শক সর্বনাম (Demonstrative Pronoun) স্বল্প-বিরামচিহ্ন (Comma) অর্ধ-বিরামচিহ্ন (Semi-colon) অপূর্ণ-বিরামচিহ্ন (Colon) পূর্ণ-বিরামচিহ্ন (Full Stop) করণ-রূপ (Positive form) অকরণরূপ (Negative form) আখ্যাতরূপ (Conjugation) উদ্গার-চিহ্ন (Sign of Admiration) শক্যার্থ (Potential mood) স্বার্থ (Indicative mood) সংকেতার্থ (Conditional mood) প্রয়োজক ক্রিয়াপদ (Casual verb) পক্ষান্তর বাচক (Alternative) স্নায়ুবন্ধন (Tendon) মজ্জাতন্তু (Nerve) কর্ণিকা (Auricle) মধ্যপর্দা (Diaphragm) পরশু (Rib) কূর্চাস্থি (Cartilage) জীবনেন্দ্রিয়-শাস্ত্র (Physiology) দ্বাদশাঙ্গুলান্ত্র (Duodenum) দ্বিশির স্নায়ু (Biceps) অস্থিবন্ধন (Legament) মনঃপ্রেরণা (Mental transmission) রক্তাভিসরণ (Circulation of

blood) রক্তপিত্ত (Corpuscle) রক্তসংকলন (Congestion) রক্তদ্রব (Serum) অন্তর্মিশ্রণ (Assimilation) আর্দ্রত্বচ (Mucusmembrane) দুগ্ধবাহিনী (Lactile) পরাবর্তন (Reflection) বক্রীভবন (Refraction) ব্যাপ্য-ব্যাপক অনুমান অথবা ব্যাপকানুমান (Induction) ব্যাপক-ব্যাপ্য অনুমান অথবা ব্যাপ্যানুমান (Deduction) সন্ধায়ক (Copula) ত্র্যবয়ব অনুমান বাক্য (Sylogism) ব্যাপ্যানুমান-বিষয়ী ন্যায় (Deductive Logic) জাতিবর্গ (Genus) অন্তর্জাতি (Species) কাদাচিৎক (Incidental) বিধায়ক বাক্য (Positive proposition) নিষেধক বাক্য (Negative Proposition) কাটি কোণ (Right angle) বিশাল কোণ (Obtuse angle) লঘু কোণ (Acute angle) বায়ুভার-মাপক (Barometer) উষ্ণতামাপক (Thermometer) বর্গীকরণ (Classification) সমুদায়ীকরণ (Generalization) কার্যানুক্রম (Process) নিরোধ (Resistance)।

উল্লিখিত পারিভাষিক শব্দের মধ্যে দুই-চারিটি কথা আমরা বোধ হয় গ্রহণ করিতে পারি। ইহার মধ্যে কতকগুলি শব্দ আমাদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। Induction ও Deduction ইহাদের প্রতিশব্দ বাঙ্গলায় আছে কিনা জানি না। যদি না থাকে, তবে আমরা 'ব্যাপকানুমান' ও 'ব্যাপ্যানুমান' এই দুইটি শব্দ বোধ হয় গ্রহণ করিতে পারি। বাঙ্গলা 'অন্তরীপ' অপেক্ষা 'ভূশির' আমার বোধ হয় capeএর ঠিক প্রতিশব্দ। কেননা 'অন্তরীপ' অর্থে দ্বীপ বুঝাইলেও বুঝাইতে পারে। আমাদিগের 'উপদ্বীপ' অপেক্ষা মারাঠী 'দ্বীপকল্প' শব্দটি Peninsulaর ঠিক প্রতিশব্দ। কেননা, উপদ্বীপ শব্দে ক্ষুদ্র দ্বীপও বুঝাইতে পারে। বিদ্যালয়ের 'ক্লাস'কে আমরা 'শ্রেণী' বলিয়া থাকি, তদপেক্ষা 'বর্গ' শব্দটি উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। বিদ্যালয়ের standard শব্দের কোন প্রতিশব্দ বাঙ্গলায় আছে কিনা জানি না। মারাঠী 'ইয়ত্তা' শব্দটি কি গ্রহণ করা যাইতে পারে না? Sign of Admiration-এর মারাঠী প্রতিশব্দ 'উদ্গার-চিহ্ন'। বাঙ্গলায় ইহার কোন কথা আছে কিনা জানি না। বাঙ্গালায় বরং ইহাকে 'উদ্গীর্ণ উক্তি' বলা যাইতে পারে, কিন্তু এই অর্থে 'উদ্গার' শব্দ বাঙ্গলায় অচল। কেননা, ইহা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। এইরূপ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের দৃষ্টান্ত আমি আর কতকগুলি দিতেছি, প্রথমে মারাঠী তাহার পর বাঙ্গলা—

অনুভব—অভিজ্ঞতা। অনুভবী—অভিজ্ঞ। প্রামাণিকপণা—খাঁটি ব্যবহার

(honesty)। শিক্ষা—দণ্ড। শিক্ষণ—শিক্ষা। অপবাদ—নিয়মের ব্যতিক্রম (exception)। প্রান্ত—প্রদেশ। পরিদর্শক—স্বচ্ছ (Transparent), স্বচ্ছ-পরিষ্কৃত। ভব্য—উন্নতকায়, মহৎ (noble, grand)। সূচনা—প্রস্তাব। প্রয়োগ—পরীক্ষা। বন্ধু—সহোদর ভ্রাতা। ইত্যাদি।

বাঙ্গলায় এক কথায় honestyর ঠিক কোন প্রতিশব্দ আছে কি না জানি না। অর্থ-সম্বন্ধীয় honestyকে সংস্কৃত ভাষায় অর্থ-শৌচ বলে, honestকে অর্থ-শুচি বলে। বাঙ্গলায় আমরা 'examination' ও 'experiment' এই উভয় অর্থেই 'পরীক্ষা' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু experimentএর একটি স্বতন্ত্র প্রতিশব্দ থাকা আবশ্যক। আমার বোধ হয়, 'experiment'কে 'প্রয়োগ-পরীক্ষা' বলিলে মন্দ হয় না।

বাঙ্গলা অপেক্ষা মারাঠী ভাষায় অনেকগুলি যাবনিক শব্দ পাওয়া যায়। যবন-সংসর্গই তাহার কারণ। দেড়-শতাব্দী পূর্বে, পেষোয়ার দফ্তরখানায় লেখা-পড়ার কাজ সমস্তই পারস্য ভাষায় সম্পন্ন হইত। আমাদের অনভ্যস্ত কানে, সংস্কৃত শব্দের পাশাপাশি, এই সকল যাবনিক শব্দ খারাপ শুনায় বটে, কিন্তু আমার বোধ হয় সে কেবল অভ্যাসের কথা। বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল যাবনিক শব্দ মিশিয়া গিয়াছে, তাহা তো আমাদের কানে খারাপ লাগে না। বরং স্থলবিশেষে তাহা সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা ভাবব্যঞ্জক। যথা, 'জোর' এই যাবনিক শব্দ, আর 'বল' এই সংস্কৃত শব্দ। যেখানে 'জোর' শব্দ বসে সেখানে 'বল' শব্দ কিছুতেই প্রয়োগ করা যায় না। যেমন, 'কথার উপর জোর দেওয়া'। যে সকল চলিত বৈদেশিক কথা ভাষার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার স্থলে নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই কারণেই শিবাজী, মহারাষ্ট্রীদিগের উপর অসীম আধিপত্য থাকা সত্বেও তাঁহার পণ্ডিতগণের রচিত শব্দগুলি মহারাষ্ট্র-ভাষার মধ্যে প্রচলিত করিতে সম্যক্‌রূপে সমর্থ হয়েন নাই। চলিত কথার মধ্যে এইরূপ অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিলে নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যদি এখন আমরা 'চাদর'এর স্থলে 'প্রাবরণী' 'গোলাপে'র স্থলে 'মকরন্দ' 'কারখানা'র স্থলে 'সম্ভার গৃহ' 'ফতুয়া'র স্থলে 'পাহু-কঞ্চুক' এবং 'চৌকি'র স্থলে 'আসন্দিকা' ব্যবহার করি, তাহা হইলে কিরূপ শুনিতে হয়।

আর-এক কথা, সংস্কৃত আমাদের গৃহ-ভাণ্ডার, উহার দ্বার আমাদিগের নিকট সততই উন্মুক্ত। যখন ইচ্ছা, আমরা সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ

সংগ্রহ করিয়া ভাষার পুষ্টিসাধন করিতে পারি। কিন্তু বৈদেশিক শব্দ, কোন ভাষার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে কাল ও ঘটনার অপেক্ষা করে। যদি সৌভাগ্যক্রমে, ঘটনাচক্রে কতকগুলি বৈদেশিক শব্দ ভাষার মধ্যে মিশিয়া গিয়া থাকে, সে তো আমাদিগের 'উপরি লাভ'। তাহার জন্য আক্ষেপ কেন? এখন আবার মহারাষ্ট্র-ভাষার মধ্যে সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করিতেছে। প্রায় ২০ বৎসর অতীত হইল, মহারাষ্ট্র পণ্ডিত মৃত মহাত্মা বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপ্‌লোঙ্কার, তাঁহার লেখায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ প্রথম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন— ইনিই বলিতে গেলে, মহারাষ্ট্র গদ্য-সাহিত্যের গতি ফিরাইয়া দিয়াছেন। ইনি মহারাষ্ট্র দেশে মহারাষ্ট্রীয় 'মেকলে' বলিয়া প্রখ্যাত। ইঁহার প্রণীত 'নিবন্ধমালা' মহারাষ্ট্র গদ্যের আদর্শ স্থল। আধুনিক লেখকেরা এখন ইঁহারই পদানুসরণ করিতেছেন। সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের দিকে ইঁহাদিগের প্রবণতা দেখা যাইতেছে। তা ছাড়া, আজকাল প্রসিদ্ধ ইংরাজী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থসকল মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে—সুতরাং অনেক শব্দ সংস্কৃত হইতে সংগৃহীত ও বিরচিত হইয়া উত্তরোত্তর ভাষার পুষ্টিসাধন করিতেছে।

তবে, এ কথা বলিতে হয়, মহারাষ্ট্র-সাহিত্য, বাঙ্গলার তুলনায় এখনও অনেকটা পশ্চাদ্বর্তী। এখনও উহার মধ্যে নবোদ্ভাবনী প্রতিভার অভ্যুদয় হয় নাই। মারাঠী ভাষার অধিকাংশ আধুনিক গদ্য-উপন্যাস 'কাদম্বরী'র ন্যায় প্রাচীনকালের আদর্শে বিরচিত। এই জন্য, মারাঠী ভাষায়, গদ্য-উপন্যাস মাত্রেরই নাম 'কাদম্বরী'। সম্প্রতি একটি উপন্যাস গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা অনেকটা আধুনিক ধরণের[১]। এক স্ত্রীলোক তাঁহার বাল্যাবস্থার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন—ইহাই গ্রন্থের বিষয়। বেশ স্বাভাবিক সহজ ভাষায়, ঘরের লোকদিগের কথা, ঘরকন্নার কথা, এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

বাঙ্গলার ন্যায় বোম্বাই অঞ্চলেও নাট্যাভিনয়ের খুব ধুম। কোন মহারাষ্ট্র নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়া, মুণ্ডিত-মস্তক শিখা-বিলম্বিত তিলক-চর্চিত-ললাট, প্রকাণ্ড-উষ্ণীষধারী মহারাষ্ট্র-শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যেও যখন 'এন্‌কোর' 'এন্‌কোর' ধ্বনি ও হাততালির চটাচট শব্দ প্রথম শুনিলাম, তখন নিতান্তই বিস্মিত হইয়াছিলাম। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকাংশ নাটকই পুরাতন সংস্কৃত

১ এই গ্রন্থের নাম "পণ কোন লক্ষাত ঘেতো" অর্থাৎ—"কিন্তু কে লক্ষ্য করে"—একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকারী কর্তৃক প্রণীত।

নাটক ও ইংরাজী শেকস্‌পিয়ারের নাটক অবলম্বনে রচিত। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে অনেকগুলি কবিও হইয়া গিয়াছেন। 'জ্ঞানেশ্বরী', একনাথ-কৃত রামায়ণ, মুক্তেশ্বর-কৃত চার পর্ব মহাভারত, তুকারাম, নামদেব প্রভৃতির অভঙ্গ নামক ছন্দের পদাবলী, মোরোপন্ত-কৃত মহাভারত, ভাগবত ও রামায়ণ— এই-সকল কবিতাগ্রন্থ দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যে অল্পই কবিদিগের স্বকল্পিত রচনা, অধিকাংশই রামায়ণ ও মহাভারতে ভাষান্তর। এই-সকল মারাঠী কবিতার মধ্যে বৈরাগ্য ও পারমার্থিক রসেরই প্রাদুর্ভাব। রসের বৈচিত্র্য কিছু মাত্র নাই। তুকারাম, রামদাস, ইহারা কবি ও সাধু পুরুষ। তুকারামের অভঙ্গের ন্যায় ভক্তহৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এক বিষয়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা ন্যায্যরূপে অহঙ্কার করিতে পারেন ; তাঁহাদের মধ্যে 'বখর' নামক স্বদেশীয় ইতিবৃত্ত আছে। আমরা ইতিহাসের কোন ধার ধারি না— আমাদের যাহা কিছু ঐতিহাসিক গ্রন্থ আছে, তাহার উপকরণ ইংরাজী গ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত।

আজকাল সংবাদপত্রাদির পরিচালনে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রভূত উদ্যম ও তৎপরতা দেখা যায় ; কৃতবিদ্যমণ্ডলীর শক্তিসামর্থ্য, বলিতে গেলে, উহাতেই পর্যবসিত। দুই-চারিটি মাসিক প্রবন্ধপত্রও যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। ইহার মধ্যে, একটির নাম 'ভাষান্তর'—উহাতে প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থাদি ক্রমশঃ অনুবাদিত হইয়া পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপে, মারাঠী ভাষায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্রের কৃতবিদ্যমণ্ডলী আর-একটি বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ওয়েবস্টার-কৃত সমগ্র ইংরাজী অভিধান ইহারা মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন। এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে, মারাঠী-ভাষার বাস্তবিক উন্নতি হইবে কিনা সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। যাহা হউক, ইহাতেও কতকটা উপকার হইতে পারে।

আমরা যেরূপ আজকাল মারাঠী-ভাষার আলোচনা আরম্ভ করিয়াছি, মহারাষ্ট্রদেশের কৃতবিদ্য লোকেরাও সেইরূপ বাঙ্গলা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা অতীব আহ্লাদের বিষয়, সন্দেহ নাই। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা প্রার্থনা-সমাজের অন্তর্ভূত, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ' ও 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান', মূল হইতে পড়িবার উদ্দেশেই বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করেন, এবং কেহ-বা বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের গ্রন্থ

পড়িবার জন্য, কেহ-বা বাঙ্গলা সংবাদপত্র ও সাহিত্যাদির গ্রন্থ পড়িবার জন্য বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিতে উৎসুক। 'বধূ-দর্পণ' নামক একটি মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থে, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'মেঝ-বৌ' এবং অন্যান্য বাঙ্গালী লেখকদিগের প্রবন্ধ অনুবাদিত হইয়াছে। এইরূপ সাহিত্যগত ভাবের আদান-প্রদানে আমাদের মধ্যে যে প্রভূত উপকার হইবার সম্ভাবনা, তাহাকে কে অস্বীকার করিবে? য়ুরোপে যেমন, ফরাসী জর্মান প্রভৃতি আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষা করা কৃতবিদ্য মাত্রেরই অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সেইরূপ হিন্দী বাঙ্গলা মারাঠী গুজরাটী প্রভৃতির মধ্যে দুই-একটি ভাষা আমাদের সকলেরই শিক্ষা করা কর্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে উৎসাহ দিবেন, এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, আর-এক দিক দিয়া, ইহার উত্তেজনা অল্প স্বল্প আরম্ভ হইয়াছে। এ দেশীয় লোক যাঁহারা চিহ্নিত-পদবীর সরকারী কর্মচারী হইয়া বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বপ্রদেশে নিযুক্ত না হইয়া, ভারতবর্ষের ভিন্ন প্রদেশে নিযুক্ত হইতেছেন—সুতরাং তাঁহাদিগকে ভিন্ন প্রদেশের ভাষা বাধ্য হইয়া শিক্ষা করিতে হইতেছে। এইরূপে প্রকারান্তরে দেশ-ভাষাগুলির প্রসার বৃদ্ধি হইবার উপক্রম হইয়াছে। যখন দেখিব, আমাদের সাময়িক সাহিত্যপত্রাদিতে মারাঠী গুজরাটী হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থ সকলের সমালোচনা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখনই জানিব আমরা কতকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছি, এবং যখন দেখিব এক সময়ে সমস্ত য়ুরোপে যেরূপ ফরাসী ভাষার আদর ছিল, সেইরূপ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক, বাঙ্গলার সাহিত্য-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া, বাঙ্গলা ভাষা আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সহিত শিক্ষা করিতেছে, তখনই জানিব, বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনে গৌরব-রবির উদয় হইয়াছে।

সাধনা। বৈশাখ ১৩০২

পল্লীচিত্র : একটি কথোপকথন

মীর মশার্‌রফ হোসেন

১৮৪৮ - ১৯১২

আমিরণ। (কাঁথা সেলাই করিতে করিতে) আর কাঁ'দ্‌লে কি হবে, জমীদারের হাত কখনও এড়াতে পা'র্ব্বে না, টাকা দিতেই হবে।

নুরন্নেহার। পঞ্চাশ টাকা কোথা পাব? আজ যে ক'রে প্যায়দার কোমর খোলাই পাঁচ টাকা দিয়েছি, তা আর কি ব'ল্‌বো। আর একটা পয়সারও ফিকির নাই, জিনিস পত্র ঘর কয়েকখানা বেচ্‌লে কিছু টাকা হতে পারে, তা এ অবস্থায় কেই বা কিন্তে সাহস করে? টাকা না দিলেও তোঁ রক্ষা নাই। আমি কি ক'র্‌বো? এত টাকা কোথা পাব? তিনি কাছারিতে আটক রৈলেন, আমি মেয়েলোক কোথা থেকে এত টাকা দেব? গরিব ব'লেও কি তাঁর দয়া হ'লো না? পঞ্চাশ টাকা একসাতে তো আমরা কখনও চক্ষেও দেখি নাই। আজ্‌ আর কোথা হতে দেব?

আমিরণ। না দিয়ে কি আর বাঁচ্‌বে? জরিমানা না দিয়ে যে অন্য কোন হাকিমের মাটীতে পালাবে, মনের কোণেও সে কথা ঠাঁই দিওনা!

নুরন্নেহার। পালাব! সে তো পরের কথা, রাত্রে যে তাঁকে কত কষ্ট দেবে, কত মা'রই মার্ব্বে, কত বারই যে খাড়া ক'র্ব্বে, আমার সেই কথাই মনে প'ড়ছে! তাঁর হাতে একটী পয়সাও নেই (রোদন) টাকার জন্যে তাঁকে মেরে মেরে একবারে খুন ক'রে ফেল্‌বে।

আমিরণ। মাটীর হাকিমে মেরে ফেল্লে তুমি কি ক'র্ব্বে? তার নামে তো আর সাএবদের কাছে নালীস ক'র্ত্তে পা'র্ব্বেনা? নালীস ক'ল্লে এই হবে, একদিনে তোমার ভিটেয় পুকুর ক'রে দেবে! জমীদারের সঙ্গে কার কথা? সে কি না ক'র্ত্তে পারে?

নুরন্নেহার। পারেন ব'লেই কি একেবারে মেরে ফেল্‌বেন? এই কী জমীদারের বিচের? জমীদার বাপের সমান, কোথায় প্রজার ধন প্রাণ মান রক্ষে ক'র্ব্বেন। ওমা! তা গেল মাটী চাপা! উল্টে দিনে ডাকাতী!

আমিরণ। চুপ্ কর চুপ্ কর, ঐ কেষ্ণমণি আসছে, যদি কিছু ওর কানে গে থাকে, তবে এখনই ব'লে দেবে। মাগো, ও তো সামান্যি মেয়ে নয়।

নুরন্নেহার। তাই তো, ও আবার আস্‌ছে কেন? ওকে দেখ্‌লেই যে আমার প্রাণ উড়ে যায়!

খোলা কক্ষে, ঘটী হস্তে কৃষ্ণমণির প্রবেশ

কৃষ্ণমণি। জয় রাধে কৃষ্ণ বল মন! মা ভিক্ষে দেও গো! ওমা তোমায় আজ্ এমন দেখ্‌ছি কেন গা? কেঁদে কেঁদে দুটো চ'ক যে একেবারে রাঙা ক'রেছ, ওমা ওকি গো?

আমিরণ। ও ম'রে গেছে, ওকি আর আছে! মোল্লাকে যে কাচারি ধ'রে নে গেছে, তুমি শোন নি?

কৃষ্ণমণি। দুই চ'কের মাথা খাই মা, আমি কিছুই শুনিনি! ধরে নিয়ে গেছে? সে কি? কেন, আবু তো দোষ কর্‌বার লোক নয়!

আমিরণ। শুদু ধ'রে নিয়ে গেছে! ধ'রে নিয়ে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হেঁকেছে, আরও কত অপমান ক'র্চ্ছে, টাকার জন্যে মাথায় ইট দিয়ে খাড়া করে নাকিং রেখেছে! এদের তো ঘর কুড়ুলে পাঁচটা পয়সা বেরোয়না, অত টাকা কোথা পাবে? এই কি হাকিমের বিচের?

কৃষ্ণমণি। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আহা হা, এত করেছে! হা কৃষ্ণ! কি ক'র্‌বে বাছা, জমীদার দণ্ড ক'ল্লে আর বাঁচবার উপায় নেই। টাকা দিতেই হবে—জমীদার টাকা নেবার জন্যে ধ'ল্লে আর এড়ান নেই। তবে তাকে ভয়ও ক'র্ত্তে হয়, তার কথাও শুন্তে হয়, জমীদার আস্ত বাঘ!

নুরন্নেহার। দুর্জ্জনকে সকলেই ভয় করে! এই কি তাঁর বিবেচনা? আমাদের দিন চলাই দায়, কোন কোন দিন উপোস ক'রেও কাটাতে হয়, এতে যে, বিনি দোষে এত টাকা জরিবানা ক'ল্লেন, কোত্থেকে দেব? ঘর দোর ঘটী বাটী বেচ্‌লেও তো পঞ্চাশ টাকার অর্দ্ধেক হয় না। দেখ দেখি বাছা এ তাঁর কেমন বিচের? হাকিমে এমন ক'রে অবিচারে মা'ল্লে আর কার কাছে দাঁড়াব? এর পর যদি হাকিমের পর হাকিম থাক্‌তো তবে এর বিচের হতো।

কৃষ্ণমণি। ওমা! হাকিম থাকলে ক'র্ত্তে কি? জমীদারের হাত ক দিন এড়াবে? হাকিম তো আর সকল সময় কাছে ব'সে থাক্‌বেন্ না! জমীদার যখন মনে ক'র্ব্বে তখনই ধ'রে নিয়ে জরিমানার টাকা আদায়

ক'র্ব্বে। মা! বেলা গেল আর থাক্‌তে পারিনে, একমুটো ভিক্ষে দেও যাই, আর কি ক'র্ব্বে মা! (দীর্ঘনিশ্বাস)

নুরন্নেহার ভিক্ষা আনিতে গমন
কৃষ্ণমণি পাশ্চাৎ যাইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান
নুরন্নেহার ভিক্ষা আনিয়া ভিকারিনীর ঘটিতে দান

কৃষ্ণমণি। (ভিক্ষা লইতে লইতে) চুপে চুপে শুন মা! জমীদারের হাত কখনও এড়াতে পা'র্ব্বেনা, আমি শুনিছি তোমার জন্যে একেবারে পাগল। দেখ মা এক মাস হ'লো তোমার পাছেই নেগে আছে, তুমি মনে ক'ল্লে সব মিটে যায়!

নুরন্নেহার। (সক্রন্দনে) আমি আবার কি মনে ক'র্ব্বো?

কৃষ্ণমণি। আর এমন কিছু নয়, আজ্ রাত্রে যদি তাঁর বৈটকখানায় যেতে পার, তা হ'লে যত রাগ দেখ্‌ছো একেবারে জল হয়ে যাবে! তুমি উল্টে আবার তার ডবল টাকা ঘরে আন্তে পা'র্ব্বে।

নুরন্নেহার। আমি বৈটকখানায় যাব মাসি? (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) এত কাল পরে তুমি আমায় এই কথা বল্লে? তাঁর কি এমন কর্ম্ম করা উচিত? অধীনে আছি ব'লেই কি এমন অধর্ম্মের কাজ ক'র্ব্বেন? এই কি তাঁর ধর্ম্ম?—এ বড় দারুণ কথা, আমা হতে এমন কর্ম্ম হবে না! তিনি যা করুন, তা করুন, প্রাণ থাক্‌তে আমা হতে এমন কুকাজ হবে না—আমি বৈটকখানায় কখন যেতে পা'র্ব্বো না। যদি বড় পেড়াপীড়ি হয় তবে এই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্ব্বো!

কৃষ্ণমণি। (জিব কাটিয়া) সেও তো ভদ্রসন্তান, তায় আবার জমীদার, একথা কে শুনবে? কেউ জান্তে পা'র্ব্বে না! জান্‌লেও কার দুটো মাথা এ কথা মুখে আনে মা! তুমি রাজার রাজ-রাণীর মত সুখে থাক্‌বে! দেখ জমীদার, সে কি না ক'র্ত্তে পারে? তোমায় ধরে নিয়ে যেতেও তো তার ক্ষ্যামতা আছে! জব্‌রাণ্ ক'ল্লেও তো ক'ত্তে পারে। সে যখন পণ ক'রেছে, তখন ছাড়্‌বে না, কখনই তোমায় ছাড়্‌বে না। তবে কেন অপমানে কুল্ মজাবে? মান্ থাক্‌তে আগেই গিয়ে তাঁর কাছে কাতর হয়ে পড়, আদর পাবে! তিনি যা বলেন তাইতে রাজি হওগে মা! তুমিই যে একা একাজ ক'চ্ছো তা তো নয়; জমীদারের নজরে পড়ে অনেক কোণের বউ পর্জ্জন্ত এ কাজ করেছে;

চোধুরীদের কথা শোননি ; ওমা তারা আস্ত ডাকাৎ! পাড়াপড়সী জ্ঞাত্ কুটুম পের্জার ঘর কাউকেও ছাড়ে নি। যার ওপর নজর করেছে তারির মাথা খেয়েছে? কৈ কে তার কি করেছে? যে তার অবাধ্য হয়েছে, তার ভিটে মাটী একেবারে উল্‌কুড় উটিয়ে দিয়েছে! মা আমি তোমার ভালর জন্যেই বল্‌ছি, মানে মানে থাকাই ভাল, শেষে মানও যাবে আর জান্তেই পাচ্ছো—বুঝেছ—

নুরন্নেহার। বুঝেছি সব, কিন্তু সে কাজ আমি পার্ব্বোনা, জান্ থাক্‌তে তো নয়! আগে আমায় খুন্ করুন, তার পর যাই ইচ্ছে তাই ক'র্ব্বেন!

ঘৃণা ও বৈরক্তির দৃষ্টিতে শশব্যস্তে গমনোদ্যতা

কৃষ্ণমণি। দাঁড়াও না শু—

নুরন্নেহার। আমি শুন্‌বো না (আমিরণের নিকটে গমন)

কৃষ্ণমণি। শুন্‌লেনা, শুন্‌লেনা, আচ্ছা যাই আগে, খাঁ সাহোবর কাছে এই সতীপনার যা শোনাতে হয়, তা হবে অকন! শেষে জান্তে পার্ব্বে আমি কেমন কৃষ্ণমণি।

সক্রোধে প্রস্থান

আমিরণ। কৃষ্ণমণি হাত মুখ নেড়ে কি বলছিল বউ?

নুরন্নেহার। তোমার আর শুনে কাজ নেই। সে কথা আর মুখে আন্‌বো না, ছি ছি বড় মান্‌ষের এই আচরণ!

আমিরণ। কি কথা বল্‌না শুনি?

নুরন্নেহার। তবে শোন। (কানে কানে প্রকাশ)

আমিরণ। (গালে হাত দিয়া) এমন! তা হবেই তো; ওরা ছাগলের জাত্! —পর্য্যন্ত পার পায় না, তুমি আমি তো ছাড় কথা! ব'লতেও নজ্জা করে ব'ন্, শুনতেও নজ্জা! ওদের মেয়েমানুষ দেখ্‌লেই চ'ক টাটায়, জমীদার হলেই প্রায় এক খুরে মাথা মুড়নো! কেউ চিরকাল বাইরে বাইরে কাটাচ্ছেন, ঘরের খবর চাকরেরাই জানে! যেখানে যান সেই খানেই মরেন, এক দিনের জন্যেও ছেড়ে থাক্‌তে পারেন না। বাই! বাই! বাই! বাই বই দুনিয়াতে তাঁদের যেন আর কেউ নাই! এঁরাই আবার বড় লোক! সাএবদের কাছে ব'সতে পান্, কত খাতির হয়, তাতেই আরও ন্যাজ ফুলে ফুলে ওঠে! সৎকার্জের বেলা এক পয়সা মা বাপ! কিন্তু ওদিকে কল্পতরু! চুল পেকেছে,

দাঁত পড়েছে, মুখের চামড়া ঢিল হয়েছে, কিন্তু সক্ এম্‌নি দাঁত পড়া বাঘের মতন এখনও জিব্ লক্ লক্ করে। সেই বাজারে মেয়েগুনো এসে কত নাঙ্গনা দিয়ে যায়, তবু নজ্জা নেই! কিছু দিন খাবার পর্‌বার্ নোভে থেকে বেশ দশ-টাকা হাত ক'রে মুখে চুণ কালী দিয়ে চলে যায়, আবার বেদিনী, যুগিনী, চাঁড়াল্‌নী, কলুনী, চা'র জেতের চা'র জনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড় বয়সে রঙ্গ ক'চ্ছেন; কেউ ঘরের বাইরের রঙ্গিনী নে উন্মত্ত; কেউ ঘরের দিদি স্ত্রী ফেলে পাড়াতেই কাল্ কাটাচ্ছেন। তা ব'ন এদেশের জমীদারদের অনেকের দশাই তো এই! তা বলে আর কি ক'র্ব্বে বল? যে গতিকে পারে, তোমার মাথা খাবেই খাবে! তা এখন চল ওদিকে—

নুরন্নেহার। ওদিকে আর তুমি কি ব'ল্‌বে ভাই! (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমি আজ্ বুঝেছি। আজ মাসাবধি লোকের দ্বারায় কত রকমের কথার ঠারে কত লোভ দেখাচ্ছে। খাঁসাহেবও বিকেলে সন্ধ্যার পর মিছি মিছি শিকারের ছুতো ক'রে বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আমি আজ্ সকলি বুঝিছি। আমি যা যা বলিছি, বোধ হয় কৃষ্ণমণি তার দ্বিগুণ বাড়িয়ে ব'ল্‌বে, আমার কি হবে? আমি কোথা পালাব? এখনই যদি আমাকে ধ'রে নিয়ে যায়, তবে আমার কি দশা হবে? কার কাছে গে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাব? এমন কি কেউ নেই?

জমীদার-দর্পণ নাটক। ১২৭৯ বঙ্গাব্দ

বাংলার গৌরব

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১৮৫৩ - ১৯৩১

হস্তী-চিকিৎসা

বেদের আর্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা হাতী চিনিতেন না। কারণ, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে হাতী পাওয়া যায় না। বেদের আর্য জাতির প্রধান কীর্তি ঋগ্বেদে 'হস্তী' শব্দটি পাঁচ বার মাত্র পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে তিন জায়গায় সায়ণাচার্য অর্থ করিয়াছেন, হস্তযুক্ত ঋত্বিক্ বা পদযুক্ত ঋত্বিক্। দুই জায়গায় তিনি অর্থ করিয়াছেন, হাতী। সে দুইটি জায়গা এই—

মাহিষা সো মায়িনশ্চিত্রভানবো
গিরয়ো ন স্বতবসো রঘুষ্যদঃ।
মৃগা ইব হস্তিনঃ খাদথা বনা
যদারুণীষু তবিষীর যুগধ্বং॥ ১।৬৪।৭

হে মরুৎগণ, তোমরা বড় লোক, জ্ঞানবান; তোমাদের দীপ্তি অতি বিচিত্র। তোমরা পাহাড়ের মত আপন বলে বলীয়ান। তোমরা হস্তী মৃগের মত বনগুলি খাইয়া ফেল। অরুণবর্ণ দিক সমূহে তোমরা বল যোজনা কর।

স্বর উপাকে তন্বং দধানো
বি যত্তে চেত্যমৃতস্য বর্পঃ।
মৃগো ন হস্তী তবিষী মুষাণঃ
সিংহো ন ভীমঃ আয়ুধানি বিভ্রৎ॥ ৪।১৬।১৪

হে ইন্দ্র, তুমি যখন সূর্যের নিকটে আপনার রূপ বিকাশ কর, তখন সে রূপ মলিন না হইয়াও আরও উজ্জ্বল হয়। পরের বলনাশক হস্তী মৃগের ন্যায় তুমি আয়ুধ ধারণ করিয়া সিংহের মত ভয়ংকর হও।

এই দুই জায়গায়ই, হস্তী মৃগের ন্যায়, 'মৃগা ইব হস্তিনঃ' 'মৃগো ন হস্তী' এইরূপ প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ এই যে, উঁহারা হস্তী নূতন দেখিতেছেন। উহাকে মৃগবিশেষ বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে। তাই তাঁহারা মৃগজাতীয় হাতী বলিয়া উহার উল্লেখ করিতেছেন। পলিনেসিয়ায় ও টাহিটি দ্বীপের লোক কেবল শূকর চিনিত। ইউরোপীয়েরা যখন সেখানে ঘোড়া কুকুর ভেড়া আরও

নানা রকম জানোয়ার লইয়া গেলেন, তখন তাহারা ঘোড়াকে বলিল চিঁ-হি-হিঁ শূয়ার, কুকুরকে বলিল ঘেউ-ঘেউ শূয়ার, ভেড়াকে বলিল ভ্যা ভ্যা-শূয়ার। আর্যগণ সেইরূপ মৃগ চিনিতেন, কেননা তাঁহারা শিকারে খুব মজবুত ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহারা হাতী দেখিলেন, তখন তাঁহারা তাহাকে হাতওয়ালা মৃগ বলিলেন।

হাতীর আসল বাসস্থান বাংলা, পূর্ব-উপদ্বীপ, বোর্নিও, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপ। পশ্চিমে দেরাডুন পর্যন্ত হাতী দেখা যায়, দক্ষিণে মহিশূর ও লঙ্কায় দেখা যায়। আফ্রিকায়ও হাতী দেখা যায়, কিন্তু এত বড় নয়, এত ভালও নয়। সুতরাং বৈদিক আর্যেরা যে হাতীর বিষয় অল্পই জানিতেন সে কথা একরকম স্থির।

ঋগ্বেদে হাতীর নাম ত ঐ দুইবার আছে। ও যে ঠিক হাতীরই নাম, সে বিষয়েও একটু সন্দেহ। কারণ, 'হাতওয়ালা' মৃগ বলিতেছে, যদি স্পষ্ট করিয়া 'শুঁড়ওয়ালা' বলিত, তবে কোন সন্দেহই থাকিত না। আরও সন্দেহের কারণ এই যে, সংস্কৃতে হাতীর অনেক নাম আছে— করী, গজ, দ্বিপ, মাতঙ্গ— ইহার একটি শব্দও ঋগ্বেদে নাই, এমন কি, ঐরাবতের নাম পর্যন্তও নাই। যাহারা কালো হাতীই চিনিত না, তাহারা সাদা হাতী কেমন করিয়া জানিবে?

ঋগ্বেদে হাতীর নাম থাকুক বা না থাকুক, তৈত্তিরীয় সংহিতায় উহার নাম আছে। অশ্বমেধের কথা বলিতে বলিতে, যখন কোন্ দেবতাকে কোন্ জানোয়ার বলি দিতে হইবে এই প্রশ্ন উঠিল, তখন প্রথম এগারো জন দেবতাকে বন্য জন্তু দিতে হইবে স্থির হইল। কোন কোন মতে এই বন্য জন্তুর ছবি বলি দিলেই হইল; কোন কোন মতে বলিল, "না, যেমন গ্রাম্য জন্তুর বেলায় আসলেরই ব্যবস্থা, বন্য জন্তুর বেলাও সেইরূপ।" এই দেবতা ও জন্তুদিগের নাম যথা— রাজা ইন্দ্রকে শূকর দিতে হইবে, বরুণ রাজাকে কৃষ্ণসার হরিণ দিতে হইবে, যমরাজাকে ঋষ্য মৃগ দিতে হইবে, ঋষভদেবকে গবয় বা নীল গাই দিতে হইবে, বনের রাজা শার্দূলকে গৌর মৃগ দিতে হইবে, পুরুষের রাজাকে মর্কট দিতে হইবে, শকুনরাজ বা পক্ষিরাজকে বর্তক পাখী দিতে হইবে, নীলঙ্গ সর্পরাজকে ক্রিমি দিতে হইবে, সিন্ধুরাজকে শিংশুমার দিতে হইবে, আর হিমবান্‌কে হস্তী দিতে হইবে।

ঋগ্বেদে হিমবান্ বলিয়া দেবতার কথা নাই। দশম মণ্ডলে একবার হিমবন্ত শব্দ আছে, তাহার অর্থ বরফের পাহাড়—ঐ পাহাড় ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতায় হিমবান্ দেবতা হইয়াছেন এবং বন্য

হস্তী, এখনও আর্যগণ যাহা ভাল করিয়া চিনিয়াছেন, তাহাই তাঁহার বলি হইয়াছে। হিমবানের দেবতা হওয়া ও বন্য হস্তীর তাঁহার বলি হওয়া, এই দুই ঘটনায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, আর্যগণ এখন ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন।

হিমবান্ এককালে দেবতা ছিলেন না, পরে দেবতা হইয়াছেন। ইহার একটা কারণ বিষ্ণুপুরাণে দেওয়া আছে। সে পুরাণে প্রজাপতি বলিতেছেন, "আমি যজ্ঞের উপকরণ সোমলতাদির উৎপত্তির জন্য হিমালয়ের সৃষ্টি করিয়াছি।" তাই দেখিয়াই কালিদাস বলিলেন, যজ্ঞাঙ্গযোনিত্বমবেক্ষ্য যস্য ইত্যাদি। অর্থাৎ হিমালয়ের দেবত্ব পরে প্রজাপতি করিয়াছেন এবং যজ্ঞে তাঁহার ভাগও একটু পরে নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে হাতী পোষা খুব চলিত হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেবের এক হাতী ছিল। তাঁহার ভাই দেবদত্তেরও হাতী ছিল। বুদ্ধদেব কুস্তি করিতে করিতে একটা হাতী শুঁড় ধরিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন, তাহাতে হাতী যেখানে পড়ে সেখানে একটি ফোয়ারা হইয়া গিয়াছিল। উদয়ন রাজার 'নলাগিরি' নামে একটি প্রকাণ্ড হাতী ছিল। তাঁহার নিজের ও চণ্ডপ্রদ্যোতের বড় বড় হাতীশালা ছিল, হাতী ধরারও খুব ব্যবস্থা ছিল।

এই যে হাতী ধরা ও পোষ মানানো, তাহার চিকিৎসা, তাহার সেবা, যুদ্ধের জন্য তাহাকে তৈয়ার করা—এ সব কোথায় হইয়াছিল? এই প্রশ্নের এক উত্তর আছে। আমরা এখন যে দেশে বাস করি, যাহা আমাদের মাতৃভূমি, সেই বঙ্গদেশই এই প্রকাণ্ড জন্তুকে বশ করিতে প্রথম শিক্ষা দেয়। যে দেশের একদিকে হিমালয়, একদিকে লৌহিত্য ও একদিকে সাগর—সেই দেশেই হস্তিবিদ্যার প্রথম উৎপত্তি। সেই দেশেই এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি বাল্যকাল হইতেই হাতীর সঙ্গে বেড়াইতেন, হাতীর সঙ্গে খাইতেন, হাতীর সঙ্গে থাকিতেন, হাতীর সেবা করিতেন, হাতীর পীড়া হইলে চিকিৎসা করিতেন, এমন কি একরকম হাতীই হইয়া গিয়াছিলেন। হাতীরা যেখানে যাইত, তিনিও সেইখানেই যাইতেন। কোনদিন পাহাড়ের চূড়ায়, কোনদিন নদীর চড়ায়, কোনদিন নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে, হাতীর সঙ্গেই তাঁহার বাস ছিল। হাতীরাও তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিত। তাঁহার সেবা করিত, তাঁহার মনের মত খাবার জোগাইয়া দিত, ব্যারাম হইলে তাঁহার শুশ্রূষা করিত।

অঙ্গ দেশের রাজা লোমপাদ বঙ্গবাসীর সুপরিচিত। তিনি রাজা দশরথের

জামাই ছিলেন। তাঁহার একবার শখ হইল, 'হাতী আমার বাহন হইবে। ইন্দ্র স্বর্গে যেমন হাতী চড়িয়া বেড়ান, আমিও তেমনি করিয়া হাতীর উপর চড়িয়া বেড়াইব।' কিন্তু হাতী কেমন করিয়া বশ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি সমস্ত ঋষিদের নিমন্ত্রণ করিলেন। ঋষিরা পরামর্শ করিয়া কোথায় হাতীর দল আছে, খোঁজ করিবার জন্য অনেক লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা এক প্রকাণ্ড আশ্রমে উপস্থিত হইল। সে আশ্রম 'শৈলরাজাশ্রিত' 'পুণ্য' এবং সেখানে 'লৌহিত্য সাগরাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে'। সেখানে তাহারা অনেক হাতী দেখিতে পাইল এবং তাহাদের সঙ্গে একজন মুনিকেও দেখিতে পাইল, দেখিয়াই তাহারা বুঝিল যে, এই মুনিই হাতীর দল রক্ষা করেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া রাজা ও ঋষিদিগকে খবর দিল। রাজা সসৈন্যে সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঋষি আশ্রমে নাই; তিনি হস্তিসেবার জন্য দূরে গমন করিয়াছেন। রাজা হাতীর দলটি তাড়াইয়া লইয়া চম্পানগরে উপস্থিত হইলেন ও ঋষিদের পরামর্শ মত হাতীশালা তৈয়ার করিয়া সেখানে হাতীদের বাঁধিয়া রাখিয়া ও খাবার দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। ঋষি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার হাতীগুলি নাই। তিনি চারিদিকে খুঁজিতে লাগিলেন ও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অনেক দিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া শেষে চম্পানগরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার হাতীগুলি সব চম্পানগরে বাঁধা আছে, তাহারা রোগা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের গায়ে ঘা হইয়াছে, নানারূপ রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ লতা-পাতা শিকড়-মাকড় তুলিয়া আনিয়া বাটিয়া তাহাদের গায়ে প্রলেপ দিতে লাগিলেন, হাতীরাও নানারূপে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। অনেক দিনের পর পরস্পর মিলনে, তাঁহার ও তাঁহার হাতীদের মহা আনন্দ। রাজা সব শুনিলেন—তিনি কে, কি বৃত্তান্ত জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। মুনি কাহারও সহিত কথা কহিলেন না। ঋষিরা আসিলেন, তাঁহাদের সহিতও কথা কহিলেন না। রাজা নিজে আসিলেন মুনি তাঁহার সহিতও কথা কহিলেন না। শেষে অনেক সাধ্যসাধনার পর মুনি আপনার পরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন, "হিমালয়ের নিকটে যেখানে লৌহিত্য নদ সাগরাভিমুখে যাইতেছে, সেখানে সামগায়ন নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁহার ঔরসে ও এক করেণুর গর্ভে আমার জন্ম। আমি হাতীদের সহিতই বেড়াই, তাহারাই আমার আত্মীয়, তাহারাই আমার স্বজন। আমার নাম পালকাপ্য। আমি হাতীদের পালন করি, তাই

আমার নাম পাল। আর কাপ্য গোত্রে আমার জন্ম, সেইজন্য আমার নাম কাপ্য। লোকে আমায় পালকাপ্য বলে। আমি হস্তিচিকিৎসায় বেশ নিপুণ হইয়াছি।" তাহার পর রাজা তাঁহাকে হাতীদের বিষয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাহার উত্তরে তিনি হস্তীর আয়ুর্বেদশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার শাস্ত্রের নাম 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' বা 'পালকাপ্য'। উহা প্রাচীন সূত্রের আকারে লেখা। অনেক জায়গায় পদ্য আছে, অনেক জায়গায় গদ্যও আছে। আধুনিক সূত্র সকল কেবল বিভক্তিযুক্ত পদ, তাহাতে ক্রিয়াপদ নাই। প্রাচীন সূত্রে যথেষ্ট ক্রিয়াপদ আছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে 'ব্যাখ্যাস্যামঃ' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা আছে। প্রাচীন সূত্রের সহিত পালকাপ্যের প্রভেদ এই যে, এখানে রাজা ও মুনির কথোপকথনচ্ছলে সূত্র লেখা হইয়াছে। ভারত-নাট্যশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন সূত্রে এরূপ কথোপকথন নাই। বোধ হয়, কোন একখানি প্রাচীন হস্তিসূত্র পরে পুরাণের আকারে লেখা হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে যে ঋষি বলিলেন, "কাপ্যগোত্রে আমার জন্ম!" কিন্তু চেন্তসাল রাও সি. আই. ই. যে 'গোত্রপ্রবরনিবন্ধকদম্বম্' সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার শেষে তিনি প্রায় সাড়ে চারি হাজার গোত্রের নাম দিয়াছেন, ইহাতে কাপ্যগোত্র নাই। অর্থাৎ যে সকল গোত্র-প্রবরের গ্রন্থ এ দেশে চলিত আছে, তাহার কোথাও কাপ্যগোত্রের নাম নাই। তবে পালকাপ্য কিরূপে কাপ্যগোত্রের লোক হইলেন, কিরূপেই বা তাঁহাকে আর্য বা ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই পুস্তকে প্রথমে লোমপাদ যে সকল মুনিদের আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাপ্য বলিয়া একজন মুনি আছেন, অশ্বলায়ন-বৌধায়নাদির সূত্রে তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, তিনি আর্যগণের মধ্যে চলিত গোত্রের লোক নহেন, এ গোত্র বোধ হয় বাংলা দেশেই চলিত ছিল। পালকাপ্য বঙ্গদেশের লোক ছিলেন। লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের ধারে, সমুদ্র ও হিমালয়ের মধ্যে তাঁহার জন্মভূমি ও শিক্ষার স্থান। যদিও অঙ্গরাজ্যে চম্পানগরে তাঁহার আয়ুর্বেদ লেখা ও প্রচার হয়, তিনি আসলে বাংলা দেশেরই লোক। এই যে প্রকাণ্ড জন্তু হস্তী, ইহাকে বশ করিয়া মানুষের কাজে লাগান, ইহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা— এ সমস্তই বাংলা দেশে হইয়াছিল। পালকাপ্য পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে মনে হয় যেন, উহা অন্য কোন ভাষা হইতে সংস্কৃতে তর্জমা করা হইয়াছে; অনেক সময় মনে হয়, উহা সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে চলিতেছে না। এ গ্রন্থ যে কত প্রাচীন তাহা

স্থির করা অসম্ভব। কালিদাস ইহাকে অতি প্রাচীন শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন। রঘুর ষষ্ঠ সর্গে তাঁহার সুনন্দা অঙ্গরাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, বহুকাল হইতে শুনা যাইতেছে যে, স্বয়ং সূত্রকারেরা ইহার হাতীগুলিকে শিক্ষা দিয়া যান, সেই জন্যেই তিনি পৃথিবীতে থাকিয়াই ইন্দ্রের ঐশ্বর্য ভোগ করিতেছেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'হস্তিপ্রচার' অধ্যায়ে হস্তিচিকিৎসকের কথা আছে। পথে যদি হাতীর কোন অসুখ হয়, মদক্ষরণ হয়, অকর্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে চিকিৎসক তাহার প্রতিবিধান করিবেন, ইহার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং কৌটিল্যেরও পূর্বে যে হস্তিচিকিৎসার একটি শাস্ত্র ছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। যে আকারে পালকাপ্যের সূত্র লেখা, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, উহা অতি প্রাচীন। সুতরাং ম্যাক্সমূলার যাহাকে Suttra Period বলেন, সেই সময়েই পালকাপ্য সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। বিউলার সাহেব বলেন, আপস্তম্ব ও বৌধায়ন খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে সূত্র লিখিয়াছিলেন। এবং তাহারও আগে বশিষ্ঠ ও গৌতমের সূত্র লেখা হয়। পালকাপ্যও সেই সময়েরই লোক বলিয়া বোধ হয়।

ভারতের পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, সূত্র রচনার কাল আরও একটু আগে হইবে, কিন্তু সে কথা লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে যদি বাংলা দেশে হস্তিচিকিৎসার এত উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেটা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নয়।

নানা ধর্মমত

পূর্বে অনেক জায়গায় আভাস দিয়াছি যে, জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, আজীবক ধর্ম এবং যে সকল ধর্মকে বৌদ্ধরা তৈর্থিক মত বলিত, সে সকল ধর্মই বঙ্গ মগধ ও চের জাতির প্রাচীন ধর্ম, প্রাচীন আচার, প্রাচীন ব্যবহার, প্রাচীন রীতি, প্রাচীন নীতির উপরই স্থাপিত। আর্যজাতির ধর্মের উপর ইহা ততটা নির্ভর করে না। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নয়। এরূপ মনে করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। এই সকল ধর্মেরই উৎপত্তি পূর্বভারতে বঙ্গ মগধ ও চের জাতির অধিকারের মধ্যে, যে সকল দেশের সহিত আর্যগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল সে সকল দেশের বাহিরে। এ সকল ধর্মই বৈরাগ্যের ধর্ম। বৈদিক আর্যদের ধর্ম সম্পূর্ণরূপে গৃহস্থের ধর্ম। ঋগ্বেদে বৈরাগ্যের নামগন্ধও নাই। অন্যান্য বেদেও যাগযজ্ঞের কথাই অধিক, সেও গৃহস্থেরই ধর্ম। সূত্রগুলিতেও গৃহস্থের ধর্মের কথা। এক ভাগ সূত্রের নামই ত গৃহ্যসূত্র।

সূত্রগুলিতে চারি আশ্রম পালনের কথা আছে। শেষ আশ্রমের নাম ভিক্ষুর আশ্রম। ভিক্ষুর আশ্রমেও বিশেষ বৈরাগ্যের কথা দেখা যায় না। এ আশ্রমের লোক ভিক্ষা করিয়াই খাইবেন, এই কথাই আছে। কিন্তু আমরা যে সকল ধর্মের কথা বলিতেছি, তাহাদের সকলেই বলিতেছে গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করো। গৃহস্থ-আশ্রমে কেবল দুঃখ। গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাহাতে জন্ম জরা মরণ— এই ত্রিতাপ নাশ হয় তাহারই ব্যবস্থা করো। আর তাহা নাশ করিতে গেলে "আমি কে?" "কোথা হইতে আসিলাম?" "কেন আসিলাম?"—এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে হয়। সেই চিন্তার ফলে কেহ বলেন আত্মা থাকে, কিন্তু সে "কেবল" হইয়া যায়, সংসারের সহিত তাহার আর কোন সংশ্রব থাকে না, সুতরাং সে জরামরণাদির অতীত। কেহ বলেন, তাহার অহংকার থাকে না; যখন তাহার অহংকার থাকে না, তখন সে সর্বব্যাপী হয়, সর্বভূতে সমজ্ঞান হয়, মহাকরুণার আধার হইয়া যায়। এ সকল কথা বেদ ব্রাহ্মণ বা সূত্রে নাই। এ সব ত গেল দর্শনের কথা, চিন্তাশক্তির কথা, যোগের কথা।

বাহিরের দিক হইতেও দেখিতে গেলে, এই সকল ধর্মের ও আর্য-ধর্মের আচার-ব্যবহারে মিল নাই। আর্যগণ বলেন, পরিষ্কার কাপড় পরিবে, সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে, নিত্য স্নান করিবে। জৈনরা বলেন, উলঙ্গ থাকো, গায়ের ময়লা তুলিও না, স্নান করিও না। মহাবীর মলভার বহন করিতেন। অনেক জৈন যতি গৌরব করিয়া "মলধারী" এই উপাধি ধারণা করিতেন। আর্যগণ উষ্ণীষ, উপানহ ও উপবীত ধারণ করিতেন, তাঁহারা খালি মাথায় থাকিতেন, জুতা পরিতেন না, এক ধুতি ও এক চাদরেই কাটাইয়া দিতেন। আর্যগণ সর্বদাই খেউরি হইতেন। অনেক ধর্মসম্প্রদায় একেবারে খেউরি হইত না। তাহাদের নখ চুল কখনো কাটা হইত না। আর্যেরা মাথা মুড়াইলে মাথার মাঝখানে একটা টিকি রাখিতেন। বৌদ্ধেরা সব মাথা মুড়াইয়া ফেলিত। আর্যগণ দিনে একবার খাইতেন, রাত্রিতে একবার খাইতেন। বৌদ্ধেরা বেলা বারোটার মধ্যে আহার করিত; বারোটার মধ্যে আহার না হইয়া উঠিলে তাহাদের সেদিন আর আহারই হইত না। রাত্রিতে তাহারা রস বা জলীয় পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই খাইতে পারিত না। খাট ছাড়া আর্যগণের শয়ন হইত না। বৌদ্ধেরা উচ্চাসন মহাসন একেবারে ত্যাগ করিত, তাহারা মাটিতেই শুইয়া থাকিত। আর্যগণ সংস্কৃতে লেখাপড়া করিতেন, অন্য সকল ধর্মের লোক নিজ দেশের ভাষাতেই লেখাপড়া করিত।

ইহারা এত নূতন জিনিস কোথা হইতে পাইল ? এ সকল নূতন জিনিস যখন আর্যদের মতের বিরোধী, তখন তাহারা আর্যদের নিকট হইতে সে সব পায় নাই। উত্তর হইতে তাহারা এই সব জিনিস পাইতে পারে না, কেননা উত্তরে হিমালয় পর্বত। হিমালয়ের উত্তর দেশের লোকের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিতেই পারে না। দক্ষিণ হইতেও ঐ সব জিনিস আসিতে পারে না, কেননা দক্ষিণের সহিত তাহাদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই ; বরং বিন্ধ্যগিরি পার হইয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং যাহা কিছু উহারা পাইয়াছে, পূর্বাঞ্চল হইতেই পাইয়াছে এবং পূর্বাঞ্চলেই আমরা এই সকল নূতন জিনিস কতক কতক এখনও দেখিতে পাই।

জৈনদের শেষ তীর্থংকর মহাবীর ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন, তাহার পর, কিছুদিন বৈশালীর জৈন মন্দিরে বাস করেন, তাহার পর বারো বৎসর নিরুদ্দেশ থাকেন। এ সময় তিনি পূর্বাঞ্চলেই ভ্রমণ করিতেন। বারো বৎসরের পর তিনি জ্ঞান লাভ করিয়া বৈশালীতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহারও পূর্বের তীর্থংকর পার্শ্বনাথ কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন, ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন, তাহার পর নানাদেশে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণও পূর্বাঞ্চলেই অধিক। শেষজীবনে তিনি সমেতগিরিতে বাস করেন—সমেতগিরি পরেশনাথ পাহাড়। তাঁহারও পূর্বে যে বাইশ জন তীর্থংকর ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমেতগিরিতে বাস করিতেন ও সেইখানেই দেহরক্ষা করেন।

সাংখ্য-মত এই সকল ধর্মেরই আদি। সাংখ্যের দেখাদেখিই জৈনেরা কেবলী হইতে চাহিত, কৈবল্য চাহিত। বৌদ্ধেরা বলেন, তাঁহারা সাংখ্যকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু সাংখ্য-মত আর্য-মত নহে, উহার উৎপত্তি পূর্বদেশে। কতকগুলি আধুনিক সময়ের উপনিষৎ ও মনু প্রভৃতি কয়েকজন শিষ্টলোক উহার আদর করায়, শঙ্কর উহার খণ্ডন করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এ কথা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। নচেৎ তাঁহার মতে উহা শিষ্টগণের গ্রাহ্য নহে। উপনিষদে যে সাংখ্য-মত আছে, শঙ্কর তাহাও স্বীকার করেন না—বলেন, ও সকলের অর্থ অন্যরূপ। সাংখ্যকার কপিলের বাড়ী পূর্বাঞ্চলে, পঞ্চশিখের বাড়ীও পূর্বাঞ্চলে। মহাভারতের শান্তিপর্ব 'অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনং' বলিয়া আরম্ভ করিয়া এক জায়গায় বলিয়া গিয়াছেন যে, পঞ্চশিখ জনক রাজার রাজসভায় আসিয়া রাজাকে উপদেশ দেন। সাংখ্যমত যে পূর্বাঞ্চলের, এ কথা অনেকবার বলিয়াছি। তাই আর এখানে বেশী করিয়া বলিব না।

রেশম

বাংলার তৃতীয় গৌরব রেশমের কাজ। ইউরোপীয়েরা চীনদেশ হইতে রেশমের পোকা আনিয়াছিলেন এবং অনেক শত বৎসর চেষ্টা করিয়া তাঁহারা রেশমের কারবার খুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের সংস্কার, চীনই রেশমের জন্মস্থান; চীনেরাও তাহাই বলে। তাহারা বলে খ্রীষ্টের ২৬৪০ বৎসর পূর্বে চীনের রানী তুঁত গাছের চাষ আরম্ভ করেন। রেশমের ব্যবসা সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীনদেশে অনেক লেখাপড়া আছে। চীনেরা রেশমের চাষ কাহাকেও শিখিতে দিত না। ঐটি তাহাদের উপনিষৎ বা গুপ্ত বিদ্যা ছিল। জাপানীরা অনেক কষ্টে খ্রীষ্টের তৃতীয় শতকে কোরিয়ার নিকট রেশমের চাষ শিক্ষা করে। ইহারই কিছুদিন পরে চীনের এক রাজকন্যা ভারতবর্ষে উহার চাষ আরম্ভ করেন। ইউরোপে খ্রীষ্টের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে স্থলপথে চীনের সহিত রেশমের ব্যবসা চলিত। অনেকে মনে করেন, এই রেশমের ব্যবসার জন্যই পঞ্জাবের শক রাজারা বেশী করিয়া সোনার টাকা চালান। ইউরোপে রেশমের চাষ ইহার অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু আমরা চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই, বাংলা দেশে খ্রীষ্টের তিন চারি বৎসর পূর্বে রেশমের চাষ খুব হইত। রেশমের খুব ভাল কাপড়ের নাম 'পত্রোর্ণ' অর্থাৎ পাতার পশম। পোকাতে পাতা খাইয়া যে পশম বাহির করে, সেই পশমের কাপড়ের নাম 'পত্রোর্ণ'। সেই পত্রোর্ণ তিন জায়গায় হইত— মগধে, পৌণ্ড্রদেশে ও সুবর্ণকুড্যে। নাগবৃক্ষ, লিকুচ, বটগাছ আর বকুলে এই পোকা জন্মিত। নাগবৃক্ষের পোকা হইতে হল্‌দে রঙের রেশম হইত, লিকুচের পোকা হইত যে রেশম বাহির হইত তাহার রঙ গমের মত, বকুলের রেশমের রঙ সাদা, বট ও আর আর গাছের রেশমের রঙ ননীর মত। এই সকলের মধ্যে সুবর্ণকুড্যের 'পত্রোর্ণ' সকলের চেয়ে ভাল। ইহা হইতেই কৌষেয় বস্ত্র ও চীনভূমিজাত চীনের পট্টবস্ত্রেরও ব্যাখ্যা হইল।

উপরে যেটুকু লেখা হইল, তাহা প্রায়ই অর্থশাস্ত্রের তর্জমা। অর্থশাস্ত্রের যে অধ্যায়ে কোন্ কোন্ ভাল জিনিস রাজকোষে রাখিয়া দিতে হইবে তাহার তালিকা আছে, সেই অধ্যায়ের শেষ অংশে ঐ সকল কথা আছে। অধ্যায়ের নাম 'কোষপ্রবেশ্য রত্নপরীক্ষা'। এখানে রত্ন শব্দের অর্থ কেবল হীরা জহরত নয়, যে পদার্থের যাহা উৎকৃষ্ট সেইটির নাম রত্ন। এই রত্নের মধ্যে

অগুরু আছে, চন্দন আছে, চর্ম আছে, পাটের কাপড় আছে, রেশমের কাপড় আছে ও তুলার কাপড় আছে। যে অংশ তর্জমা হইল, তাহাতে মগধ ও পৌণ্ড্রদেশের নাম আছে, এই দুইটি দেশ সকলেই জানেন। মগধ—দক্ষিণ-বেহার। আর পৌণ্ড্র—বারেন্দ্রভূমি। সুবর্ণকুড্য কোথায়? প্রাচীন টীকাকার বলেন, সুবর্ণকুড্য কামরূপের নিকট। কিন্তু কামরূপের নিকট যে রেশম এখন হয়, তাহা ভেরাণ্ডা পাতায় হয়। আমি বলি, সুবর্ণকুড্যেরই নাম শেষে কর্ণসুবর্ণ হয়। কর্ণসুবর্ণও মুর্শিদাবাদ ও রাজমহল লইয়া। এখানকার মাটি সোনার মত রাঙা বলিয়া, এ দেশকে কর্ণসুবর্ণ, কিরণ-সুবর্ণ বা সুবর্ণকুড্য বলিত। এখানে এখনও রেশমের চাষ হয় এবং এখানকার রেশম খুব ভাল। নাগবৃক্ষ এখানে খুব জন্মায়। নাগবৃক্ষ শব্দের অর্থ নাগকেশরের গাছ। নাগকেশর বাংলার আর কোনখানে বড় দেখা যায় না, কিন্তু এখানে অনেক দেখা যায়। লিকুচ মাদার গাছ। মাদার গাছেও রেশমের পোকা বসিতে পারে। বকুল ও বটগাছ প্রসিদ্ধই আছে। কৌটিল্য যে ভাবে চীনদেশের পট্টবস্ত্রের উল্লেখ করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি চীনদেশের রেশমী কাপড় অপেক্ষা বাংলার রেশমী কাপড় ভাল বলিয়া মনে করিতেন। রেশমী কাপড় যে চীন হইতে বাংলায় আসিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণই অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। চীনের রেশম তুঁতগাছ হইতে হয়। বাংলার রেশমের তুঁতগাছের সহিত কোন সম্পর্কই নাই। সুতরাং বাঙালী যে রেশমের চাষ চীন হইতে পাইয়াছে, এ কথা বলিবার জো নাই। এখন পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে এই কথা বলিতে হইবে যে, রেশমের চাষ বাংলাতেও ছিল, চীনেও ছিল। তবে তুঁতগাছ দিয়া রেশমের চাষ চীন হইতেই সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যত্র যে রেশমের চাষ ছিল, এ কথা চাণক্য বলেন না। তিনি বলেন, বাংলায় ও মগধেই রেশমের চাষ ছিল। কারণ, পৌণ্ড্রও বাংলায়, সুবর্ণকুড্যও বাংলায়। চাণক্যের পরে কিন্তু ভারতবর্ষের নানাস্থানে রেশমের চাষ হইত। কারণ, মান্দাসোরে খ্রীষ্টীয় ৪৭৬ অব্দে যে শিলালেখ পাওয়া যায়, তাহাতে লেখা আছে যে, সৌরাষ্ট্র হইতে একদল রেশম-ব্যবসায়ী মান্দাসোরে আসিয়া রেশমের ব্যবসা আরম্ভ করে এবং তাহারাই চাঁদা করিয়া এক প্রকাণ্ড সূর্যমন্দির নির্মাণ করে।

অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা যে সংবাদ পাইলাম, সেটি বাংলার বড়ই

গৌরবের কথা। যদি বাঙালীরা সকলের আগে রেশমের চাষ আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত তাঁহাদের গৌরবের সীমাই নাই। যদি চীনেই সর্বপ্রথম উহার আরম্ভ হয়, তথাপি বাঙালীরা চীন হইতে কিছু না শিখিয়াই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে যে রেশমের কাজ আরম্ভ করেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁহারা ত আর তুঁতপাতা হইতে রেশম বাহির করিতেন না, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। যে সকল গাছ বিনা চাষে তাঁহাদের দেশে প্রচুর জন্মায়, সে সকল গাছের পোকা হইতেই তাঁহারা নানা রঙের রেশম বাহির করিতেন। চীনের রেশম সবই সাদা, তাহা রঙ করিতে হয়। বাংলার রেশম রঙ করিতে হইত না, গাছ-বিশেষের পাতার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন রঙের সুতা হইত। আর, এ বিদ্যা বাংলার নিজস্ব, ইহা কম গৌরবের কথা নয়।

বাকলের কাপড়

বাংলার চতুর্থ গৌরব বাকলের কাপড়। প্রথম অবস্থায় লোকে পাতা পরিত। কটকের জঙ্গল-মহলে এখনও দু-এক জায়গায় লোকে পাতা পরিয়া থাকে। তাহার পর লোকে বাকল পরিত ; গাছের ছাল পিটিয়া কাপড়ের মত নরম করিয়া লইত, তাহাই জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করিত এবং কাঁধের উপর একখানি ফেলিয়া উত্তরীয় করিত। সাঁচী পাহাড়ের উপর এক প্রকাণ্ড স্তূপ আছে, উহার চারিদিকে পাথরের রেলিং আছে, রেলিং-এর চারিদিকে বড় বড় ফটক আছে। দুই-দুইটি থামের উপর এক-একটি ফটক। এই থামের গায়ে অনেক চিত্র আছে। এই চিত্রের মধ্যে বাকল-পরা অনেক মুনিঋষি আছেন। তাঁহাদের কাপড় পরার ধরণ দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি, কেমন করিয়া সেকালে লোকে বাকল পরিয়া থাকিত। তাহার পরে লোকে আর বাকল পরিত না, বাকল হইতে সুতা বাহির করিয়া কাপড় বুনিয়া লইত ; শণ, পাট, ধঞ্চে, এমন কি আতসী গাছের ছাল হইতেও সুতা বাহির করিত। এখন এই সকল সুতায় দড়ি ও থলে হয়। সেকালে উহা হইতে খুব ভাল কাপড় তৈয়ার হইত এবং অনেক কাপড় খুব ভালও হইত। বাকল হইতে যে কাপড় হইত তাহার নাম ক্ষৌম, উৎকৃষ্ট ক্ষৌমের নাম 'দুকূল'। ক্ষৌম পবিত্র বলিয়া লোকে বড় আদর করিয়া পরিত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে বাংলাতেই এই বাকলের কাপড় বুনা হইত। বঙ্গে দুকূল হইত, উহা শ্বেত ও স্নিগ্ধ, দেখিলেই চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। পৌণ্ড্রেও দুকূল হইত, উহা শ্যামবর্ণ ও মণির মত উজ্জ্বল। সুবর্ণকুড্যে যে

দুকূল হইত তাহার বর্ণ সূর্যের মত এবং মণির মত উজ্জ্বল। এই অংশের শেষে কৌটিল্য বলিতেছেন, ইহাতেই কাশীর ও পৌণ্ড্র দেশের ক্ষৌমের কথা 'ব্যাখ্যা' করা হইল। ইহাতে বুঝা যায়, বাংলাতেই বাকলের কাপড় সকলের চেয়ে ভাল হইত এবং 'দুকূল' একমাত্র বাংলাতেই হইত। সুতরাং ইহা আমরা বাংলার চতুর্থ গৌরবের বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

এখানে আমরা কাপাসের কাপড়ের কথা বলিলাম না। কারণ, চাণক্যের মতে কাপাসের কাপড় যে শুধু বাংলাতেই ভাল হইত, এমন নয়—মধুরার কাপড়, অপরান্তের কাপড়, কলিঙ্গের কাপড়, কাশীর কাপড়, বৎস দেশের কাপড় ও মহিষ দেশের কাপড়ও বেশ হইত। মধুরা পাণ্ড্যদেশে, মহিষদেশ নর্মদার দক্ষিণে, অপরান্ত বোম্বাই অঞ্চলে। কিন্তু চাণক্যের অনেক পরে কাপাসের কাপড়ও বাংলার একটা প্রধান গৌরবের জিনিস হইয়াছিল। ঢাকাই মস্‌লিন ঘাসের উপর পাড়িয়া রাখিলে ও রাত্রিতে তাহার উপর শিশির পড়িলে, কাপড় দেখাই যাইত না। একটা আংটির ভিতর দিয়া এক থান মস্‌লিন অনায়াসেই টানিয়া বাহির করিয়া লওয়া যাইত। তাঁতীরা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া একটি বাখারির কাটি লইয়া কাপাসের ক্ষেতে ঢুকিত। ফট্ করিয়া যেমন একটি কাপাসের মুখ খুলিয়া যাইত, অমনি বাখারিতে জড়াইয়া তাহার মুখের তুলাটি সংগ্রহ করিত। সেই তুলা হইতে অতি সূক্ষ্ম সুতা পাকাইত, তাহাতেই মস্‌লিন তৈয়ার হইত। আকবর যখন বাংলা দখল করিয়া সুবাদার নিযুক্ত করেন, তখন সুবাদারের সহিত তাঁহার বন্দোবস্ত হয় যে, তিনি বাংলার রাজস্ব-স্বরূপ বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র লইবেন, কিন্তু দিল্লীর রাজবাড়ীতে যত মালদহের রেশমী কাপড় ও ঢাকার মস্‌লিন দরকার হইবে, সমস্ত সুবাদারকে জোগাইতে হইবে।

থিয়েটার

প্রাচীন বাংলার পঞ্চম গৌরব থিয়েটার! থিয়েটারের সেকালের নাম 'প্রেক্ষাগৃহ' বা 'পেক্‌খা ঘর অ'। ইউরোপের অনেক পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষে থিয়েটার ছিল না, থিয়েটারের ব্যাপার গ্রীস হইতে এখানে আসিয়াছে, থিয়েটার রাজাদের নাচঘরে থাকিত। এ কথা একেবারে ঠিক নয়। আমাদের নিজ গৌরবের কথা আলোচনা করিতেছি। পরনিন্দায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, এক সময়ে দেবাসুরের ঘোর দ্বন্দ্ব হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে জিতিয়া ইন্দ্র এক ধ্বজা খাড়া করিয়া দেন। ধ্বজার নীচে দেবতার দল আমোদ-আহ্লাদ করিতে থাকেন। আমোদ করিতে করিতে তাঁহারা দেবাসুরের যুদ্ধ অভিনয় করিয়া বসিলেন। দেবতারা দেখিলেন যে, "বাঃ! ইহাতে ত বেশ আমোদ হয়। যখনই শক্রধ্বজ তুলা যাইবে, তখনই এই রকম অভিনয় করিতে হইবে।" অসুরেরা বলিল, "বাঃ! আমাদের ছোট করিবার জন্য তোমরা একটা নূতন কীর্তি করিবে, ইহা আমরা কিছুতেই হইতে দিব না।" এই বলিয়া তাহারা অভিনয় ভাঙিয়া দিবার জোগাড় করিয়া তুলিল। ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া এক বাঁশ লইয়া তাহাদিগকে তাড়া করিলেন। অসুর মারিতে মারিতে বাঁশের ডগাটি ছেঁচিয়া গেল, তাহার নাম হইল 'জর্জর'। জর্জর সেই অবধি নাটকের নিশান হইল। প্রেক্ষাগৃহ তৈয়ার করিতে গেলে আগে জর্জর পুঁতিতে হইত, নাটক আরম্ভ করিতে গেলে আগে জর্জরের পূজা করিতে হইত। জর্জরের ছয়টি পাব্‌ ছয় রকম নেকড়া দিয়া জড়ান থাকিত। ছয়জন বড় বড় দেবতা উহাতে বাস করিতেন! তাঁহাদের ছয় জনেরই পূজা করিতে হইত। থিয়েটারের ঘর তিন রকম হইত: এক রকম টানা অর্থাৎ আগা সরু, গোড়া সরু, মাঝখানটা মোটা, ইহা এক শ আট হাত লম্বা, এরূপ ঘর দেবস্থানেই হইত; আর-এক রূপ ঘর চৌকোণা—চৌষট্টি হাত লম্বা, বত্রিশ হাত চ্যাটাল—ইহা রাজাদের জন্য; আর সাধারণ ভদ্রলোকদের বাড়িতে যে থিয়েটার হইত, তাহা তেকোণা, সমবাহু-ত্রিভুজ—প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ বত্রিশ হাত। থিয়েটার করিবার সময় কানা খোঁড়া কুঁজা কুরূপ কোন লোককে সেখানে যাইতে দেওয়া হইত না, এমন কি মজুরি করিতেও ঐরূপ লোক লওয়া হইত না; সন্ন্যাসী, ভিখারীকেও সেস্থানে যাইতে দেওয়া হইত না। ঘর করিবার সময় ঠিক মাঝখানে জর্জর পুঁতিয়া রাখিতে হইত। থিয়েটারের অর্ধেকটা প্রেক্ষকদিগের জন্য, অর্ধেকটা নটদিগের জন্য। থিয়েটারও দোতালা হইত, প্রেক্ষকদিগের জায়গাও দোতালা হইত। দোতালা স্টেজ (রঙ্গ) পৃথিবীর আর-কোন দেশে এখনও নাই। পৃথিবীর ব্যাপার একতলায় হইত, স্বর্গের ব্যাপার দোতলায় হইত। প্রেক্ষকদিগের যে অর্ধেকটা স্থান থাকিত, তাহার সম্মুখটা ব্রাহ্মণদের জন্য, সেখানকার থাম সাদা। তাহার পিছনে ক্ষত্রিয়দের স্থান, সেখানকার থামগুলি রাঙা। তাহার পিছনে বৈশ্যের ও শূদ্রের অর্ধেক

অধেক করিয়া স্থান, সেখানকার থাম কালো ও হল্‌দে। সম্মুখের সারির অপেক্ষা পিছনের সারি এক হাত উঁচা, তাহার পিছনে আর এক হাত উঁচা, তাহার পিছনে আর এক হাত উঁচা— এইরূপে গেলারী করা ছিল। দোতালার অবস্থাও এইরূপ। স্টেজের পিছনে সাজঘর ও বাজনার ঘর, তাহার পিছনে বিশ্রামঘর, তাহারও পিছনে দেবতাদের পূজা করিবার স্থান। স্টেজে চিত্র থাকিত; কিন্তু সেগুলি নড়ানো যাইত না। স্টেজের দেওয়ালের গায়ে উজ্জ্বল বর্ণে কোথাও বাগান, কোথাও বাড়ি, কোথাও শোবার ঘর, কোথাও নদীতীর, কোথাও পর্বত আঁকা থাকিত। স্টেজের উপরে জর্জরের পূজা হইত ও নান্দীপাঠ হইত। স্টেজের দুই পাশে দুই দরজা থাকিত, সেইখান দিয়া পাত্রের প্রবেশ হইত।

যাঁহারা অভিনয় করিতেন, তাঁহারা প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণই ছিলেন। ঋষিদের উপর কটাক্ষ করিয়া কয়েকখানি প্রহসন করায় ঋষিরা শাপ দেন, "তোমরা শূদ্র হইয়া যাইবে।" সেই অবধি উহারা শূদ্র হইয়া যান। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে উহাদিগকে শূদ্রই বলা হইয়াছে।

থিয়েটারের কথা বলিতে গিয়া ভরত মুনি উহার কতকটা ইতিহাস দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, অনেক সম্প্রদায়ের নটস্থত্র ছিল। প্রত্যেক স্থত্রেরই ভাষ্য ছিল, বার্তিক ছিল, নিরুক্ত ছিল, সংগ্রহ ছিল, কারিকা ছিল। এই সমস্ত স্থত্র একত্র করিয়া ভরত-নাট্যশাস্ত্র হইয়াছে। এই নাট্যশাস্ত্রখানি বোধহয় খ্রীষ্টের দুই শত বৎসর পূর্বে লেখা হইয়াছিল। কারণ, উহাতে শক যবন ও পহ্লব এই তিনটি জাতির নাম একত্র পাওয়া যায়। জার্মান পণ্ডিত নোলকি বলেন, যে কোন পুস্তকে শক যবন পহ্লব এই তিনটি নাম একত্র পাওয়া যাইবে, সেই পুস্তক খ্রীষ্টের দুই শত বৎসর পূর্ব হইতে দুই শত বৎসর পর, ইহার মধ্যে লেখা। নাট্যশাস্ত্রে কিন্তু পহ্লব শব্দ উহার অতি প্রাচীন আকারে আছে, অর্থাৎ পাথ্‌ৱ এই আকারে আছে। পার্থিব বা পারদ নামে এক জাতি কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণে আজার্‌-বিজানের পাহাড়ে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০ হইতে খ্রীষ্টের পর ২২২ বৎসর পর্যন্ত তাহারা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। তাহাদের একদিকে রোম, অন্যদিকে ভারত। দুই দিকেই তাহারা আপনাদের রাজ্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিত। ভারতবাসীরা তাহাদের শেষ অবস্থায় তাহাদিগকে পহ্লব বলিত; প্রথম উহাদের নাম ছিল পাথ্‌ৱ। এখন ঐ প্রাচীন জাতিকে পুরাণে পারদ বলে। ভরতস্থত্র

যদি খ্রীষ্টের দুই শত বৎসর পূর্বে লেখা হয় তাহা হইলে তাহারও পূর্বে অনেক নাট্য-সম্প্রদায় ছিল। পাণিনিতে আমরা দুইখানি নটসূত্রের নাম পাই, একখানি শিলালির, অপরটি কৃশাশ্বের। ভাসের নাটকে আছে যে, বৎসরাজ উদয়ন সূত্রকার ভরতকে আপনার পূর্বপুরুষ মনে করিয়া অত্যন্ত গর্বিত হইয়াছিলেন।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের প্রবৃত্তির অনুসারে নাটকের প্রবৃত্তি চারি রকম ছিল। সেই চারিটি প্রবৃত্তির নাম— অবন্তী, দাক্ষিণাত্য, পাঞ্চালী, ও ওড্রমাগধী। দাক্ষিণাত্যের লোকে নাটকে নৃত্যগীত বাদ্য বেশী বেশী দেখিতে ভালবাসিত, তাহারা অভিনয়ও ভালবাসিত, কিন্তু উহা চতুর মধুর ও ললিত হওয়া আবশ্যক ছিল। এইরূপ পূর্বাঞ্চলের লোকেরও একটা প্রবৃত্তি ছিল, তাহার নাম ওড্রমাগধী। ওড্রমাগধী প্রবৃত্তি যেসকল দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার মধ্যে বঙ্গদেশ প্রধান। কারণ, বঙ্গদেশ হইতেই মলচ মল্ল বর্ষক ব্রহ্মোত্তর ভার্গব মার্গব প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুলিন্দ বৈদেহ তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি দেশ নাটকের প্রবৃত্তি গ্রহণ করিত। এই নাটকের প্রবৃত্তি এই যে, ইহারা প্রহসন ভালবাসিত, ছোট ছোট নাটক ভালবাসিত, আর সংস্কৃত পাঠ ভালবাসিত; স্ত্রীর অভিনয় তাহাদের আদৌ ভাল লাগিত না, পুরুষের অভিনয়ই তাহাদের পছন্দ ছিল। তাহারা নাটকে গান বাজনা নাচ এসব ভালবাসিত না।

খ্রীষ্টের দুই শত বৎসর পূর্বেও যদি বাংলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র রীতি চলিয়া থাকে, তাহা বাঙালীর কম গৌরবের নয়।

নৌকা ও জাহাজ

বাংলায় যেরূপ বড় বড় নদী আছে, তাহাতে বাঙালীরা যে অতি প্রাচীনকালেও নৌকা গড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নৌকাও অনেকরূপ ছিল—দোণা ডুণি ডিঙি ভেলা নৌকা বালাম ছিপ ময়ূরপঙ্খী ইত্যাদি। এ সকলই ছোট ছোট নৌকা, সকল দেশেই আছে। বাংলায় কিন্তু বড় জাহাজও ছিল।

বুদ্ধদেবেরও আগে বঙ্গদেশে বঙ্গনগরে একজন রাজা ছিলেন, তিনি কলিঙ্গ দেশের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজার এক অতি সুশ্রী কন্যা হয়; কিন্তু সে অতি দুষ্ট ছিল। সে একবার পলাইয়া গিয়া মগধযাত্রী এক বণিকের দলে ঢুকিয়া যায়। তাহারা যখন বাংলার সীমানায় উপস্থিত হইল, তখন এক সিংহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। বণিকেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। কিন্তু রাজকন্যা সিংহের পিছু লইলেন। তিনি সিংহকে

সেবায় এতদূর তুষ্ট করিলেন যে, সিংহ তাঁহাকে বিবাহ করিল। কালক্রমে রাজকন্যার এক পুত্র ও এক কন্যা হইল। পুত্রের হাত দুইখানি সিংহের মত হইল, এইজন্য তাহার নাম হইল সিংহবাহু।। সিংহবাহু বড় হইলে মা ও ভগিনীকে লইয়া সিংহের গুহা হইতে পলায়ন করিল। বাংলার সীমানায় উপস্থিত হইলে সীমারক্ষক রাজার শালা রাজকন্যা ও তাহার ছেলেমেয়েকে বঙ্গনগরে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে সিংহ গুহায় আসিয়া ছেলেমেয়েদের না পাইয়া বড়ই কাতর হইল। সেও খুঁজিতে খুঁজিতে বাংলার সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যে গ্রামেই যায়, গ্রামের লোক ভয় পাইয়া রাজার কাছে দৌড়িয়া গিয়া বলে সিংহ আসিয়াছে। রাজা ঢেঁটরা দিলেন, যে সিংহ মারিয়া দিতে পারিবে, তিনি তাহাকে যথেষ্ট বক্শিশ দিবেন। কেহই তাহাতে স্বীকার করিল না। রাজা সিংহবাহুকে বলিলেন, "তুমি যদি সিংহ ধরিয়া দিতে পার, আমি তোমাকে রাজা করিয়া দিব।" সে সিংহ মারিয়া আনিল ও রাজা হইল এবং আপনার ভগিনীকে বিবাহ করিল। তাহার অনেকগুলি ছেলেপিলে হইল। বড় ছেলের নাম হইল বিজয়। সে বড় দুরন্ত, লোকের উপর বড় অত্যাচার করে। লোকে উত্যক্ত হইয়া উঠিল, রাজাকে বলিল, "ছেলেটিকে মারিয়া ফেলো।" রাজা সাত শ অনুচরের সহিত বিজয়কে এক নৌকা করিয়া দিয়া সমুদ্রে পাঠাইয়া দিলেন। বিজয়ের ও তাহার অনুচরবর্গের ছেলেদের জন্য আর এক নৌকা দিলেন ও তাহাদের স্ত্রীদের জন্য আরও একখানা নৌকা দিলেন। ছেলেরা একটা দ্বীপে নামিল, তাহার নাম হইল নগ্নদ্বীপ ; মেয়েরা আর একটি দ্বীপে নামিল, তাহার নাম হইল নারীদ্বীপ। বিজয় ঘুরিতে ঘুরিতে, এখন যেখানে বোম্বাই, তাহার নিকটে সুপ্পরাক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল, সংস্কৃতে উহার নাম সুপরার্ক, এখন উহার নাম সুপারা। বিজয় সেখানেও অত্যাচার আরম্ভ করিল। লোকে তাহাকে তাড়া করিল, সেও আবার নৌকায় চড়িয়া পলাইয়া গেল ও লঙ্কাদ্বীপে আসিয়া নামিল। সে যেদিন লঙ্কাদ্বীপে নামে সেদিন বুদ্ধদেব কুশী নগরে দুই শালগাছের মাঝে শুইয়া নির্বাণ লাভ করিতেছিলেন। তিনি ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ বিজয় লঙ্কাদ্বীপে নামিল। সে সেখানে আমার ধর্ম প্রচার করিবে, তুমি তাহাকে রক্ষা করিও।"

সিংহবাহু যে তিনখানি নৌকায় বিজয় ও তাহার লোকজন, উহাদের ছেলেপিলে ও পরিবারবর্গ পাঠাইয়া দেন, সে তিনখানিই খুব বড় নৌকা ছিল।

সাত শ লোক যে নৌকায় যায় সে ত জাহাজ। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব বাংলা দেশে ঐরূপ বড় বড় নৌকা তৈয়ার হইত। বিজয় যে জাহাজে লঙ্কা যান, সে জাহাজের একখানি ছবি অজন্ত-গুহার মধ্যে আছে। তাহাতে মাস্তল ছিল পাল ছিল, ষ্টীম এঞ্জিন হইবার আগে যেসব জিনিস তাহাতে দরকার, সবই ছিল। অনেকে মনে করেন যে, এসব কথা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু সেই ছবিটা ত এখনও আছে, তাহা ত অবিশ্বাস করা যায় না। সে ছবিও অল্পদিনের নয়, অন্তত চৌদ্দ শ বৎসর হইয়া গিয়াছে। তখনও লোকে মনে করিত, বিজয় এইভাবে এইরূপ নৌকায় লঙ্কায় নামিয়াছিলেন।

বুদ্ধের আগেও ভারতবর্ষের অন্যত্র এরূপ অনেক বড় বড় নৌকা ছিল। বোম্বাইয়ের কাছে ভরুকচ্ছ বা ভড়ৌচ একটি বন্দর ছিল। সেখান হইতে বড় বড় জাহাজ ববেরু বা বাবিলন যাইত। সুপারা হইতেও জাহাজ যাইত। এক জাহাজে সাত শত লোক যাইবার কথা অনেক জায়গায় শুনা যায়। কিন্তু তাম্রলিপ্তি বা বাংলা হইতে এরূপ জাহাজ যাইবার কথা বুদ্ধদেবের আগে বা পরেও অনেক বৎসর ধরিয়া আর শুনা যায় না। তথাপি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন, বুদ্ধের সময়ও তাম্রলিপ্তি একটি বড় বন্দর ছিল। অর্থশাস্ত্রে বলে যে, যিনি রাজার 'নাবধ্যক্ষ' থাকিতেন, তিনি 'সমুদ্রযানে'রও অধ্যক্ষতা করিতেন। সুতরাং তখনও যে বঙ্গ মগধ হইতে জাহাজ যাইত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গ মগধ হইতে জাহাজ যাইতে হইলে, তাম্রলিপ্তি ছাড়া আর বন্দরও নাই।

দশকুমারচরিত একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। উইলসন সাহেব মনে করেন যে, উহা খ্রীষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পরে লিখিত। অনেকে কিন্তু মনে করেন, উহা খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বেই লেখা হইয়াছে। উহাতে তাম্রলিপ্তি নগরের বিবরণ আছে। সেখান হইতে অনেক পোত বঙ্গসাগরে যাইত। দশকুমারের এক কুমার তাম্রলিপ্তি হইতে সেইরূপ এক পোতে চড়িয়া দূর সমুদ্রে যাইতেছিলেন। রামেষু নামে এক যবনের পোত তাঁহার পোতকে ডুবাইয়া দেয়। 'রামেষু নাম্নো যবনস্য' পড়িয়া ইজিপ্টের রাজা রামেসিসের কথা মনে পড়ে। দশকুমার যখন লেখা হয় তখনও বোধ হয় রামেসিসের স্মৃতি কিছু কিছু জাগরূক ছিল।

খ্রীষ্টের জন্মের চারি শত বৎসর পরে ফাহিয়ান তাম্রলিপ্তি হইতে এক জাহাজে চড়িয়া চীন যাত্রা করিয়াছিলেন। সে জাহাজে নানা দেশের লোক ছিল। চীন সমুদ্রে ভয়ংকর ঝড় উঠে, জাহাজ ডুবুডুবু হয়, ফাহিয়ান বুদ্ধদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ও ঝড় থামিয়া গেল।

তাহার পরও তাম্রলিপ্তি হইতে চীন ও জাপানে জাহাজ যাইতে শুনা যায়। কিছুদিন পর হইতেই সুমাত্রা যাবা বালি প্রভৃতি দ্বীপে ভারতবাসীরা যাইয়া বাস করেন এবং তথায় শৈব বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহারা কলিঙ্গ ও ভরুকচ্ছ হইতেই গিয়াছিলেন, তাম্রলিপ্তি হইতেও যাওয়া সম্ভব, কিন্তু এখনও তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন বৃত্তান্তে লেখা আছে যে, মগধ হইতে অনেকবার লোক যাইয়া ব্রহ্মদেশ দখল করে ও তথায় সভ্যতা বিস্তার করে। ড্সেল সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ যে, পেগানে বহু পূর্বে মগধ হইতে লোকজন গিয়াছিল ও তথায় ভারতবর্ষের ধর্মপ্রচার করিয়াছিল।

কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন, বাংলার রাজারা নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। পালরাজাদের যে যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা থাকিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। খালিমপুরের ধর্মপালের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ধর্মপালের যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা প্রস্তুত থাকিত, এ কথা স্পষ্ট লেখা আছে। রামপাল নৌকার সেতু করিয়া গঙ্গাপার হইয়াছিলেন, এ কথা রামচরিতে স্পষ্ট লেখা আছে। ইংরাজী ১২৭৬ সালে তাম্রলিপ্তি হইতে কতকগুলি বৌদ্ধভিক্ষু জাহাজে চড়িয়া পেগানে গিয়া তথাকার বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন, এ কথাও কল্যাণী নগরের শিলালেখে স্পষ্ট করিয়া বলা আছে।

কিন্তু মনসা ও মঙ্গল-চণ্ডীর পুঁথিতেই আমরা বাংলাদেশের নৌকাযাত্রার খুব জাঁকালো খবর পাই— চৌদ্দ পনেরো ষোলো খানি জাহাজ একজন সদাগর একজন মাঝির অধীনে ভাসাইয়া লইয়া গঙ্গা বাহিয়া সমুদ্রে পড়িতেন, সমুদ্র বাহিয়া সিংহলে যাইতেন এবং তথা হইতেও চৌদ্দ-পনেরো দিন বাহিয়া মহাসমুদ্রের মধ্যে নানা দ্বীপ-উপদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। চাঁদসদাগরের প্রধান জাহাজের নাম মধুকর। কোন কোন পুঁথিতে লেখে যে, মধুকরের বার শত দাঁড় ছিল। দ্বিজ বংশীদাসের মনসার ভাসানে লেখা আছে, সিংহল হইতে তেরো দিন মহাসমুদ্রে যাওয়ার পর ভীষণ ঝড় উঠিল, তুলারাশির মত ফেনরাশি নৌকার উপর দিয়া চলিতে লাগিল। চাঁদসদাগর কাঁদিয়াই আকুল, "আমার হথাসর্বস্ব এই নৌকাগুলিতে আছে, ইহদের একখানিও দেখিতে পাই না। আমার নিজের প্রাণও যায়।" তিনি মাঝিকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লালিলেন— "তুমি ইহার একটা উপায় করো।" মাঝি তাহাকে ঠাণ্ডা করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, যখন পারিলেন না তখন মধুকর হইতে কতকগুলো তেলের পিপা

খুলিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিলেন, ঢেউ থামিয়া গেল ; দূরে দূরে সব জাহাজগুলি দেখা গেল। চাঁদসদাগর ত আহ্লাদে আটখানা। এই সকল বই লেখার পরও যখন কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্য খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সর্বদাই নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন, অনেক সময় দূর-দূরান্তরও যাইতেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের সহায় ছিল পর্তুগীজ বোম্বেটের দল। ইহার পরেও আবার যখন আরাকানের রাজা ও পর্তুগীজ বোম্বেটেরা বাংলায় বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিল, দেশটাকে সত্যসত্যই 'মগের মুল্লুক' করিয়া তুলিল, তখন আবার বাঙালী মাঝি দিয়াই সায়েস্তা খাঁ তাহাদের শাসন করিলেন। বঙ্গসাগরে বোম্বেটেগিরি থামিয়া গেল।

বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে
মূল সভাপতির অভিভাষণ। চৈত্র ১৩২১
গ্রন্থাকারে প্রকাশ : 'প্রাচীন বাংলার গৌরব'। আশ্বিন ১৩৫৩

বাংলার বৈশিষ্ট্য

বিপিনচন্দ্র পাল

১৮৫৮ - ১৯৩২

বাঙ্গালী বাংলার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বিবেকানন্দ পর্যন্ত বাংলার শ্রেষ্ঠতম মনীষিগণ বাংলায় যে চিন্তা ও ভাবকে তিলে তিলে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, আজিকার বাঙ্গালী যুবকেরা কেবল নহেন অনেক বৃদ্ধেরা পর্যন্ত সে বাংলাকে চেনেন না। বাংলার চিন্তারাজ্য আজ নিস্পন্দ, ভাবের স্রোত বন্ধ, বাংলার যে একটা বৈশিষ্ট্য চিরদিন ছিল, এখনও আছে, যে বৈশিষ্ট্য হারাইলে ভারতবর্ষের সমষ্টিগত চিন্তা ভাব ও কর্মভাণ্ডারে বাংলার আর কিছুই দিবার থাকিবে না, সে বৈশিষ্ট্যের কথা আজিকার বাঙ্গালী কেবল ভুলিয়াছেন তাহা নহে, তাহার উল্লেখমাত্র তাঁহাদিগকে অধীর করিয়া তুলে।

তাঁরা বলেন, আমরা কি প্রাদেশিকতাকে আবার বাড়াইয়া তুলিয়া ভারতের বিরাট জাতীয়-জীবনের ঐক্যকে নষ্ট করিয়া দিব? বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালীত্বের অভিমানে ফাঁপিয়া উঠে, মারাঠী ও পাঞ্জাবী যদি আপন আপন প্রাদেশিক ইতিহাসের গৌরবে মুগ্ধ হইয়া ভারতে আবার নিজকে সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, রাজপুত যদি পাঠান হইতে, তামিল যদি তৈলঙ্গী হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া রাখিতে চাহে, তবে ভারতে আমরা যে বিরাট জাতীয়-জীবনের স্বপ্ন দেখিতেছি, তাহার সফলতার সম্ভাবনা কই? প্রাদেশিকতার যুগ চলিয়া গিয়াছে, জাতীয়তার যুগ আসিয়াছে, এ যুগে আবার বাংলার কথা লইয়া অত বাড়াবাড়ি কেন?

যাঁরা এভাবে ভারতের নূতন জাতীয়-জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহেন তাঁরা যেমন বাংলাকে চেনেন না সেইরূপ ভারতবর্ষকেও চিনেন না। তাঁহারা এখনও য়ুরোপের ইতিহাসের মোহে পড়িয়া আছেন। য়ুরোপ যে পথে তার আধুনিক জাতীয়তা বা Nationalism গড়িয়া তুলিয়াছে, ইঁহারা সেইভাবেই ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ও নানা জাতিকে ভাঙিয়া চুরিয়া এক ছাঁচে ঢালিয়া একটা নূতন ভারতীয় জাতি বা Indian Nation গড়িয়া তুলিতে চাহেন।

ইঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, তাঁহাদের এই ভাবের মধ্যে ইংরাজের ভাবই জয়যুক্ত হইতেছে। ইংরাজ কহেন, ভারতবর্ষ একটা দেশ নহে কিন্তু একটা

মহাদেশ, ভারতবর্ষের এক পর্যায়ে আমরা ইতালী বা ফরাসী, ইংলণ্ড বা জার্মানীকে বসাইতে পারি না। ভারতবর্ষের এক পংক্তিতে বসাইতে হইলে গোটা য়ুরোপকেই বসাইতে হয়। য়ুরোপের মধ্যে যেমন ইংলণ্ড আছে, ফরাসী আছে, ইতালী আছে, অষ্ট্রিয়া আছে, জার্মানী আছে, রুশ আছে, সেইরূপ ভারতবর্ষে বাংলা আছে, পাঞ্জাব আছে, অন্ধ্র আছে, রাজপুতানা আছে, কর্ণাট আছে, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজ আছে। এ-সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যতটা পার্থক্য ও প্রভেদ আছে, য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রেও প্রায় সেইরূপই প্রভেদ আছে। এদের ইতিহাস ভাষা সাহিত্য প্রকৃতি এমন কি সমাজ-গঠন পর্যন্ত পরস্পর হইতে স্বল্পবিস্তর বিভিন্ন। গোটা ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে মোটামুটি ধর্মের একটা ঐক্য আছে বটে; এরূপ ঐক্য য়ুরোপেও আছে। তুরস্ককে বাদ দিলে য়ুরোপের সর্বত্র একই খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত। আর প্রটেস্টেণ্ট, ক্যাথলিক, গ্রীক চার্চ—বা রাশিয়ান চার্চ—এসকলের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, মাদ্রাজের স্মার্ত ও বৈষ্ণব, মহারাষ্ট্রের শৈব ও গাণপত্য, বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব,—এছাড়া নানকপন্থী, কবীরপন্থী, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা কম নহে। এসকলের উল্লেখ করিয়া ইংরেজ কহেন, যাহাকে জাতি বা নেশন কহে, তার উপাদান ভারতে এখন বিদ্যমান নাই। ইংরাজ ভারতের একচ্ছত্র রাষ্ট্রপতি হইয়া এক শাসন-শৃঙ্খলে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে বাঁধিয়া, একখাতে ভারতের আধুনিক ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রবাহকে চালাইয়া ভারতে এই সর্বপ্রথম একটা জাতীয়-জীবনের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। এই পথেই যদি সম্ভব হয় ভবিষ্যতে একদিন ভারতবর্ষেও একটা বিরাট জাতির সৃষ্টি হইতে পারে। হইবেই যে এমনও বলা যায় না। এই অজুহাতেই ইংরাজ এপর্যন্ত আমাদের আধুনিক জাতীয়তার স্পর্ধাকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনার শাসন-শৃঙ্খলাকে সর্বদাই নানা ভাবে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

ইংরাজ কহেন, আমরা চিরদিনের জন্য তোমাদের শাসনভার বহন করিতে আসি নাই। আমাদের দেশ যেমন এক হইয়াছে, এক শাসনে শাসিত, এক ভাষা, এক ধর্ম, এক ভাবের ও ঐতিহাসিক গৌরবের বন্ধনে আবদ্ধ, তোমরা যেদিন সেইরূপ হইবে অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষে যেমন এক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইরূপ এক ভাষা প্রচলিত, এক ধর্ম প্রবর্তিত, এক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, মোটের উপর একই আচার পদ্ধতি, একই রীতিনীতি, একই আদর্শের প্রেরণা গড়িয়া উঠিবে, সেদিন ভারতে জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হইবে। সেদিন তোমাদের নেশনত্বের দাবী মাথা হেঁট করিয়া মানিয়া লইতেই হইবে। সেদিন

আমরা অম্লানবদনে তোমাদের দেশ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ভার তোমাদের হাতে অর্পণ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিব। কিন্তু যতদিন না তোমরা একটা জাতি হইয়াছ, ততদিন আমরা যদি না থাকি—তোমাদের ছাড়িয়া যাই, তোমরা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া দেড় শত বৎসরে দেশে যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিবে এবং আমাদের পরিত্যক্ত রাজদণ্ড অন্য কোনো প্রবলতর প্রতিবেশী আসিয়া নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া আবার তোমাদিগকে নূতন পরদেশী শাসনের অধীন করিবে।

যাঁরা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক জীবনকে পঙ্গু করিয়া ভারতের একতার নামে প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করিয়া য়ুরোপের ছাঁচে ভারতীয় জাতীয়-জীবন গড়িয়া তুলিবার কল্পনা করেন, তাঁরা ইংরাজের এ আপত্তিকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তাঁরা জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক ভারতের জাতীয়-জীবনের গঠনে, য়ুরোপে যে আদর্শে আধুনিক জাতীয়তা বা Nationalityর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে সেই আদর্শেরই অনুসরণ করিতেছেন। তাঁদের য়ুরোপ-বিদ্বেষ যতটা প্রবল হউক না কেন, এই বিদ্বেষের ভিতর দিয়াই তাঁরা সর্বদা শত্রুভাবে য়ুরোপকে সাধন করিয়া য়ুরোপকেই পাইতেছেন। তাঁরা বলেন বটে, ভারতের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করাই ভারতের নূতন জাতীয়তার লক্ষ্য, কিন্তু ভারতের এই বৈশিষ্ট্য কি—এ প্রশ্নটা সম্যক্ অনুধাবন করিয়া দেখেন না।

২

কি ধর্মে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রীয় গঠনে, যখন ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র ছিল—ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও সাধনা জীবনের সকল বিভাগে সর্বদাই সমষ্টির ঐক্যের ভিতরে ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কোথাও কোনো সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া সেই সম্বন্ধের অন্তর্গত ব্যক্তি বা বিষয়ের স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যকে বিনাশ করে নাই। ভারতের দেবতা এক নহেন বহুও নহেন; কিন্তু তিনি সেই এক যাঁহার মধ্যে একের সঙ্গে বহু ও বহুর সঙ্গে একের সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের ধর্ম খ্রীষ্টীয়ান বা মুসলমান ধর্মের মতন ঠিক একটা ধর্ম নহে; এ ধর্মে কোনও এক অনন্যপন্থা, কোনও একটা মাত্র সাধন, কোনও একটা মাত্র প্রামাণ্য শাস্ত্র, কোনও একজন মাত্র ঈশ্বরের প্রবক্তা বা গুরুর প্রতিষ্ঠা হয় নাই। এ ধর্মের বহু শাস্ত্র, সকলেই নিজ নিজ অধিকারে প্রামাণ্য বলিয়া পরিগণিত; বহু পন্থা; কিন্তু নদীসকল যেমন এক সাগরে যাইয়া পড়ে,

সেইরূপ সেই সকল বিভিন্ন পন্থা, যিনি 'নৃণাম্ একো গন্তব্যঃ'—সকল নরের একই গন্তব্য—তাঁহারই পদতলে গিয়া মিশিয়াছে। এ ধর্মের অবতার, নিজ নিজ যুগে সকলেই অনন্যপ্রাধান্য রক্ষা করিয়া সেই একেরই মহিমা প্রচার করিয়াছেন। এ অবতার-ধারা সৃষ্টির অনাদি আদি হইতে আরম্ভ হইয়া আজ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইতেছে! এ ধর্মে অসংখ্য গুরু নিজ নিজ জীবনের প্রামাণ্য ও প্রত্যক্ষ সিদ্ধির পথে মুমুক্ষু-মানবকে লইয়া যাইতেছেন। এত বৈচিত্র্যের মধ্যে এমন অপূর্ব একত্ব, এত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এরূপ বিরাট উদার সমতা, ব্যষ্টিকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করিয়াও সমষ্টির নিরবচ্ছিন্ন ঐক্য এমনভাবে রক্ষিত আর কোথাও দেখিতে পাই না। আর সর্বত্রই প্রায় মানুষকে এক ছাঁচে ঢালিয়া একাকারের উপরে ঐক্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে। সে চেষ্টা সফল হয় নাই মানুষের প্রকৃতিতে এরূপ নিষ্পেষণ সহ্য হয় না। এইজন্য বারংবার মানুষ ধর্মের এই কঠোর শাসনকে ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। কিন্তু ভারতের মনীষা স্মরণাতীত কাল হইতে মানব-প্রকৃতির মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া তাহাকে ধর্মের শাসনে ও সমাজের বন্ধনে বাঁধিয়াও বৈষম্যের মধ্যে সাম্য, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

যেমন ধর্মে সেইরূপ সমাজে। আধুনিক মনুষ্যত্বের আদর্শের দিক দিয়া বিচার করিলে বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে অনেক কথা কহিতে পারা যায়। আমাদের প্রাচীনেরাও যে এই ধর্মাশ্রমকে ধর্মের বা সমাজের শ্রেষ্ঠতম পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। বৈদিক যুগ হইতে জ্ঞানের পথ ও কর্মের পথ—এই দুইটি প্রশস্ত পন্থা বিভাগ হইয়া, কেহ বা জ্ঞানকাণ্ড, কেহ বা কর্মকাণ্ডের আশ্রয়ে নিজ নিজ জীবনের সার্থকতা অন্বেষণ করিয়াছেন। আর জ্ঞানের পথে যাঁহারা চলিতেন তাঁহারা যজ্ঞাদি কর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্ম—উভয়কেই অগ্রাহ্য করিতেন। গীতাতে প্রথমে বর্ণাশ্রমের কর্তব্য বিধান করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন, এই যে বর্ণাশ্রম ধর্ম, ইহা শেষ কথা নহে, প্রকৃত জ্ঞানী যাঁহারা, তাঁহারা সর্বভূতে আত্মদৃষ্টি লাভ করিয়া গরু হাতী কুকুর ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে একই চক্ষে দর্শন করেন। বর্ণাশ্রমের উপরেও কথা আছে; সে কথা—

> সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
> অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।

বর্ণাশ্রমাদি সকল প্রকারের লোকধর্ম উপেক্ষা বা বর্জন করিয়া কেবল মাত্র

সর্বান্তর্যামী ভগবান যে আমি, তাঁহারই শরণাপন্ন হও। আমিই তোমাকে এই বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম পরিত্যাগজনিত যে পাপ তাহা হইতে রক্ষা করিব।

সেই প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের মধ্যে কত ভাঙাগড়া হইয়াছে; কত নূতন মতের প্রতিষ্ঠা, কত নূতন পন্থার প্রচার, কত নূতন সাধনের আবিষ্কার হইয়াছে! ইহারা প্রত্যেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকিয়া একই হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই ভাবে সমাজের কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বাহিরের বর্ণাশ্রম রক্ষা করিয়াও ভিতরে ভিতরে তাহাকে ভাঙিয়া চুরিয়া দিয়াছে। অথচ হিন্দুসমাজ বলিয়া যে বিরাট বস্তু তাহার অঙ্গহানি কেহ করে নাই, করিতে পারে নাই, কাহাকেও করিতে দেওয়া হয় নাই। হিন্দুসমাজ কাহাকেও একান্ত বর্জন করে নাই, সকলকেই আপনার বিশাল অঙ্কে তাহাদের নিজ নিজ কোটে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া রক্ষা করিয়াছে। যেমন হিন্দুধর্মে, সেই-রূপ হিন্দু সমাজজীবনেও এইভাবে স্মরণাতীত কাল হইতে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিগত সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য পরিপূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিয়া সমাজের সাধারণ একতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

যখন হিন্দুর নিজের অধিকারে রাষ্ট্রশক্তি ছিল রাষ্ট্রীয় ঐক্যবন্ধনেও হিন্দু নীতিজ্ঞেরা এবং রাষ্ট্রপতিগণ এই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। হিন্দু মহারাজ-চক্রবর্তীরা রোমান বা আধুনিক য়ুরোপের জাতিদিগের মত এক একটা বৃহদায়তন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন নাই, কিন্তু প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের সঙ্গে সখ্যবদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সকলের অভিমতানুযায়ী তাহাদের অধিনেতৃগণ গ্রহণ করিতেন। কাহারও সঙ্গে বিরোধ হইলে তাহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া পরাজিত রাষ্ট্র আত্মসাৎ করিতেন না, কিন্তু পরাজিত রাষ্ট্রপতির কোনও উপযুক্ত দায়াধিকারীকে শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহারই হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতেন, এবং তাঁহাকে আপনার সমা বা সামন্তরাজরূপে গ্রহণ করিতেন।

এইরূপে কি ধর্মে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে— সর্বত্র হিন্দু বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়াই সাম্যের, স্বাধীনতাকে বজায় রাখিয়াই ঐক্যের, ব্যষ্টির ও ব্যক্তির আত্মবিকাশ ও আত্মচরিতার্থতার পথ অবাধ রাখিয়া সমষ্টির ঘননিবিষ্টতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। মুসলমানেরা যখন এদেশে আসিল তখনও ভারতীয় সাধনার এই বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় নাই। মতবাদের বিরোধ সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান সাধনার সার্বজনীন সত্যকে আপনার করিয়া লইয়াছে; এবং ক্রমে, বিশেষতঃ এই বাংলা দেশে, এমনও দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে হিন্দুরা অকুণ্ঠভাবে মুসলমান

দরগায় সিন্নি দিত এবং মুসলমানরাও সরল ভক্তিভরে হিন্দু দেবদেবীর নিকট বলি আনিয়া দিত। মুসলমান যুগে এইরূপে হিন্দু-মুসলমানের একটা সমন্বয় সাধনের বহুতর চেষ্টা হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমানকে হিন্দু করিতে চাহে নাই, নিজেও মুসলমান হয় নাই, কিন্তু নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির সার্বজনীন সাধনে এবং মানবতার উদার ভূমিতে হিন্দু-মুসলানের একটা ঐক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আর সে চেষ্টা যে নিষ্ফল হয়, এমনও বলা যায় না। আধুনিক য়ুরোপীয় চিন্তা এই আদর্শকেই Federalism নামে অভিহিত করিয়াছে। আধুনিক সভ্যতা ও সাধনা এই আদর্শের অন্বেষণেই চলিয়াছে। এই আদর্শে স্বাধীনতার সঙ্গে বশ্যতার, স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে ঐক্যের, বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমতার সমন্বয় সাধন হইয়াছে। এই আদর্শের সন্ধান য়ুরোপ সবে মাত্র পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ পথ ভারতের চির-পরিচিত পথ।

ভারতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করাই যদি ভারতের জাতীয়তার লক্ষ্য হয়, তবে ভারতের এই নব জাতীয়তার সাধকেরা তাঁহাদের সাধনার এই সনাতন প্রকৃতিকে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভারতের বৈশিষ্ট্য যে কি, ইহা যাঁহারা বোঝেন এবং সর্বদা স্মরণ করিয়া চলেন, তাঁহারা সমগ্র ভারতের ঐক্য সাধনের লোভে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে কখনই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভারতের এই বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান প্রায় লোপ পাইয়াছে বলিয়াই আজ বাঙ্গালী প্রত্যক্ষ বাংলাকে ভুলিয়া, অপ্রত্যক্ষ যে ভারতবর্ষ নামে কল্পিত বস্তু, তাহার পশ্চাতে ছুটিতে চাহে।

৩

ভারতের সমষ্টিগত সমাজ ও চরিত্রের এবং সাধারণ ভারতীয় সাধনার যেমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেইরূপ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক সাধনা ও সভ্যতার তুলনায় বাংলারও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। জগতের বিভিন্ন সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার যেমন একটা বিশেষত্ব আছে, ভারতের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে বাংলার সভ্যতা ও সাধনার সেইরূপ একটা বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বই বাঙ্গালীকে ভারতের অপরাপর জাতি হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, ইহাই বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব। বাংলার ইতিহাসে, বাংলার ধর্মে, বাংলার সাহিত্যে ও শিল্পকলাতে, বাংলার সমাজ-জীবনে— সকল বিষয়ে বাঙ্গালীর এই বিশেষত্বটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিশেষত্বটা আধুনিক নহে—

অতি পুরাতন। যতদিন বাঙ্গালী সৃষ্টি হইয়াছে ততদিন হইতে এই বিশেষত্ব তিলে তিলে ফুটিয়াছে। এই বিশেষত্বকে রক্ষা করিয়া, এই বিশেষত্বের মধ্যে যাহা সার্বজনীন তাহাকে বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া, তাহার দ্বারা ভারতের সাধনা ও জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টি সাধন করাই বর্তমান যুগে বাংলার প্রধান কর্তব্য। বাংলা পাঞ্জাব বা মাদ্রাজ, গুজরাট বা অন্ধ্র নহে বলিয়াই বিচিত্র ভারতীয় সাধনাতে তাহার একটা বিশেষ স্থান আছে। এই স্থানভ্রষ্ট হইলে ভারতবর্ষকে বাংলার কিছু দিবার থাকিবে না, আর যাহার বিশ্বকে কিছু দিবার থাকে না, সে প্রাচীনের স্মৃতিচিহ্নরূপে পড়িয়া থাকিতে পারে; কিন্তু তাহার বাঁচিবার অধিকার থাকে না। বাঙ্গালী যদি বাংলাকে ভুলিয়া যায় তাহা হইলে তাহারও আর জীবনের উপরে কোনও দাবী থাকিবে না। সে বাঁচিল কি মরিল, ইহাতে কি ভারতের, কি জগতের কিছুই আসিয়া যাইবে না। এই কথাটাই আজ বাঙ্গালীকে সকলের আগে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

৪

বাংলা সম্বন্ধে অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে। আধুনিক বাংলাকে ইংরাজই গড়িয়া তুলিয়াছে, ইংরাজের ত এ অভিমান আছেই, অনেক শিক্ষিত ভারতবাসীর মনেও এরূপ একটা সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে যে এ সংস্কার নাই, এমন নহে। এ সকল বাঙ্গালী সহসা প্রাচীনের প্রতি অত্যধিক আসক্তিবশতঃ ভারতচন্দ্রের পরে রাজা রামমোহনের সময় হইতে বাংলায় যে নূতন সাহিত্য ও সাধনা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা ইংরাজের অনুচিকীর্ষার ফল ভাবিয়া তাহাকে অত্যন্ত হেয় মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহারা কল্পনা করেন যে এই আধুনিক বাংলা সত্যকার বাংলা নহে। সে বাংলা ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সুতরাং, এ বাংলার কথা লইয়া আর অত বাড়াবাড়ি কেন?

কিন্তু বাংলা কি সত্যই ইংরাজী শিখিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে? এই ইংরাজী শিক্ষাও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বাংলা না হয় সকলের আগে ইংরাজী সাহিত্য ও য়ুরোপীয় সাধনার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সে সাহিত্য ও সাধনা সমগ্র ভারতবাসীর চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। অথবা, একই ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাঙ্গালী যেভাবে ফুটিয়া উঠে নাই—এমনটা কেন হইল? এ সমস্যার ত সমাধান করা চাই।

এ প্রশ্নটা তুলিলেই আমরা দেখিতে পাই, আধুনিক বাংলার এই বিশেষত্ব কেবল ইংরাজী শিক্ষার ফলে নহে, কিন্তু বাংলার পুরাতন সাধনা ও মনীষার উপরে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষার জ্যোতি পড়িয়া সেই প্রাচীন প্রাণকে অভিনব ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা বাংলায় একটা নূতন যুগ আনিয়াছে, এ কথা মানিতেই হইবে। কিন্তু বাংলার চরিত্র ও ইতিহাসের অনুসন্ধান করিলে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই নূতন যুগেও সেই পুরাতন বাঙ্গালী চরিত্র ও সাধনাই অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র। কেবল রূপের পরিবর্তন হইয়াছে, মূল বস্তু নষ্ট হয় নাই; তাহা যেমন ছিল, তেমনই আছে।

সে মূল বস্তুটি স্বাধীনতা। বাংলা চিরদিন— কি সমাজের কি ধর্মের— সকল প্রকারের বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া মুক্তভাবে আপনার সার্থকতার অন্বেষণ করিয়াছে, প্রাচীন শাস্ত্র মানিয়াও তাহার অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া সেই শাস্ত্র-বন্ধনকে সর্বদা শিথিল করিয়া আসিয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুগণ যেকালে পুরাতন স্মৃতির শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াছিলেন, তখন স্মার্তশিরোমণি রঘুনন্দন নূতন স্মৃতি রচনা করিয়া বাংলার হিন্দু-সমাজকে প্রাচীনের নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতের হিন্দু-সমাজের আর কোথাও এরূপভাবে এত বড় একটা বিপ্লব ঘটিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। ব্যবহার-শাস্ত্র এবং অর্থনীতি সম্বন্ধেও বাংলা প্রাচীনকাল হইতেই আপনার একটা নিজের পথ গড়িয়া তুলিয়াছিল। একাদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর শেষ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, আমাদের দশ-শ-তম শকাব্দে ভট্টনারায়ণের বংশধরব্যবহারবিদ্ ও স্মার্তশিরোমণি জীমূতবাহন বাঙ্গালী হিন্দুর দায়াধিকার নির্ণয় করিয়া দায়ভাগ প্রণয়ন করেন। এই দায়ভাগ কেবল বাংলার হিন্দু-সমাজেই প্রচলিত, ভারতে অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুগণ মিতাক্ষরার অধীন। মিতাক্ষরাতে ধনীর নিজের ধনের উপর সম্পূর্ণ স্বাধীন অধিকার নাই। দায়ভাগেতে ধনীকে তাহার মৃত্যুর পরে বা পূর্বে স্বেচ্ছামত নিজের ধন সম্পর্কিত বা অ-সম্পর্কিত যাহাকে ইচ্ছা দান করিবার অধিকার দিয়াছে; এ বিষয়ে কোন প্রকার বাঁধা-বাঁধি নাই। জীমূতবাহনই যে ইহা নিজে সৃষ্টি করিলেন, এরূপ কল্পনা করা যায় না। সমাজে যাহা প্রচলিত ছিল, সমাজের গতি ও প্রকৃতি যেদিকে চলিতেছিল, তাহার উপরেই তিনি আপনার নূতন বিধান প্রতিষ্ঠিত করেন। জীমূতবাহনের চারিশতাধিক বৎসর পরে স্মার্তশিরোমণি রঘুনন্দন দায়তত্ত্ব প্রচার করিয়া জীমূতবাহনের দায়ভাগই কোনও কোনও বিষয়ে নূতন ব্যাখ্যার দ্বারা আরও উদার করিয়া তুলিলেন। মিতাক্ষরা অনুসারে সম্পত্তি

সমগ্র পরিবারেতে সমষ্টি-ভাবে আবদ্ধ থাকে ; পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন লোকেরা পারিবারিক সম্পত্তির নিজ নিজ অংশ পরিবারের অন্যান্য অংশীদারের অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তরিত করিতে পারেন না। দায়ভাগ অনুসারে বাঙ্গালী হিন্দুর এ অধিকার আছে। ইহাতে বাংলার হিন্দু-সমাজে অর্থ-ব্যবহার সম্বন্ধে এমন একটা স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হয়, যাহা মিতাক্ষরার অধীন হিন্দুসমাজে হয় নাই। মেইন সাহেব কহেন যে, বাংলা অতি প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্য-প্রধান দেশ ছিল বলিয়াই মিতাক্ষরার বাঁধাবাঁধি নিয়ম তাহার সহ্য হয় নাই। জীমূতবাহন কহিয়াছেন যে, শত শাস্ত্র-বচনের দ্বারাও বস্তুর পরিবর্তন সম্ভব নহে। ইহাতেই বাংলার মনীষার সনাতন স্বাধীনতা প্রবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

মুসলমান সভ্যতা ও সাধনার প্রভাবে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে অনেক নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। নানক কবীর প্রভৃতি যে সাধনা প্রবর্তিত করেন, তাহা হিন্দুসাধনার অন্তর্গত হইলেও ঠিক সে সাধনার ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখে নাই। শিখেরা ত সম্পূর্ণরূপেই পৃথক হইয়া পড়েন। কিন্তু ঐ যুগেই মহাপ্রভু বাংলা দেশে যে যুগধর্মের প্রচার করেন তাহাতে হিন্দু সাধনাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই এক নূতন প্রাণতার সঞ্চার করিয়া তাহাকে সে যুগের উপযোগী এক নূতন আকার প্রদান করেন। ফলতঃ বাংলার বৌদ্ধযুগের অবসান হইতে বাঙ্গালী ধর্ম-সাধনে সিদ্ধান্তে মতবাদে ও সামাজিক আচার-ব্যবহারে এমন একটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যাহা ভারতবর্ষের অন্যান্য কোনও হিন্দু-সমাজে দেখা যায় না। সাধক এবং সিদ্ধপুরুষেরা নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এসকল সাধনার লোকেরা সমাজের মধ্যে আপনাদের অন্তরঙ্গ ধর্মজীবনে প্রাচীন শাস্ত্র কিম্বা আচার-বিচারের বন্ধন থাকিয়াই মানিয়া চলেন নাই। সমাজও ইহাদিগকে এই স্বাধীনতা দিয়া আসিয়াছে। কুলগুরুর সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয় লাভ করিয়া স্বাধীনভাবে বক্তিগত ধর্মসাধনার কথা আর কোথাও শুনি নাই। 'লোকের মধ্যে লোকাচার' 'সদ্‌গুরুর কাছে সদাচার' ইহার অনুরূপ কথা অন্যত্র নাই। আপাততঃ কথাটা কেমন কেমন শোনায় বটে—অনেকে ইহাকে মিথ্যাচারও বলিতে পারেন, কিন্তু ইহার ভিতরে যে স্বাধীনতার প্রেরণা আছে, ইহাতে সমাজের বশ্যতার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যে একটা সঙ্গতির চেষ্টা রহিয়াছে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। বামাচারী তান্ত্রিকদিগের চক্রে কোনও প্রকারের জাতিভেদ মানা হয় না। 'প্রবর্তে ভৈরবী চক্রে সর্ববর্ণাঃ দ্বিজোত্তমাঃ'—ভৈরবী চক্রে বসিলে চণ্ডালও শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণের সমান হয় ; তখন চণ্ডালের মুখের অন্ন ব্রাহ্মণ নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ

করিতে পারেন। ইহার মধ্যে কোনও লুকোচুরি ছিল না। অন্যান্য সম্প্রদায়েও সাধনমণ্ডলীতে জাতিবর্ণের বিচার হয় নাই। ইহা বাংলার বিশেষত্ব। এ সকলের দ্বারা স্বাধীনতা-স্পৃহা বাংলার প্রকৃতির ভিতরে কতটা যে বলবতী ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলায় দক্ষিণের শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের মত সমগ্র হিন্দু-সমাজের কোনও অধিনায়ক ছিলেন না এবং নাই। বাংলায় কুলগুরু আছেন, সদ্‌গুরু আছেন, কিন্তু সর্বান্তর্যামী ভগবান ব্যতীত 'জগৎগুরু' বলিয়া কোনও মানুষ বা মোহান্ত নাই। বাংলায় ব্রাহ্মণ আদি বর্ণ আছেন। কিন্তু মাদ্রাজ বা দাক্ষিণাত্যের মত ব্রাহ্মণ্য প্রভাব নাই। বাংলায় চণ্ডালেরা মাদ্রাজ বা মহারাষ্ট্রের 'পারিয়া'-দিগের মত একান্তভাবে কখনও 'অস্পৃশ্য' বলিয়া বিবেচিত হন নাই। পারিয়ারা হিন্দুর দেবমন্দিরের ছায়ার নিকটও যাইতে পারেন না—মন্দিরসংলগ্ন জলাশয় স্পর্শ করিতে পারেন না, মন্দির-পার্শ্ববর্তী পথে বিচরণ করিবার তাঁহাদের অধিকার নাই। বাঙ্গালীর চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণে বাংলার চণ্ডালেরা পূজার সময় দেবতার ভোগ-আরতিকালে ঢোল বাজাইয়া থাকেন। মাদ্রাজে 'দৃষ্টিদোষ' মানা হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের খাদ্যের উপরে অব্রাহ্মণের চক্ষু পড়িলে তাহা অশুচি হইয়া যায়, বাংলায় 'দৃষ্টিদোষ' বলিয়া কোনও বস্তু নাই। এরূপ কি সামাজিক জীবনে, কি ধর্মসাধনে, বাংলার সাধনার মধ্যে বৌদ্ধযুগ হইতেই একটা অপূর্ব স্বাধীনতা-প্রেরণা জাগিয়া আছে। ইহাই বাংলার প্রধান বিশেষত্ব।

বাংলার সনাতন সাধনার আর-একটা বিশেষত্ব—ইহাই মানবতা—ইহাকে আর কি বলিব, সহসা ভাবিয়া পাই না। বাংলায় দেব-বাদ আছে সত্য কিন্তু বাংলায় যে সকল দেবদেবীর পূজা প্রচলিত তাহাদের সকলের মধ্যেই একটা মানবতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালী- দুর্গা, সরস্বতী, ইহাদের কাহারও চারি বা দশ হাত আছে বটে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এ সকল যে অপূর্ব মাতৃমূর্তি ইহা আশ্চর্য-রূপে প্রত্যক্ষ হয়। এই অতিপ্রাকৃত হাতগুলি বাদ দিলে ইহাদিগকে ম্যাডোনার সঙ্গে তুলনা করা যায়। দুর্গা ও সরস্বতীর মুখের অণুতে অণুতে, আমরা যে মাতৃঅঙ্কে লালিত পালিত, সেই সার্বজনীন মানবীয় মাতৃভাব যেন ফাটিয়া পড়ে। দক্ষিণের হিন্দুরা হনুমানের ও গণপতির পূজা করেন। পশ্চিমেতে মহাবীরের আরাধনা বহুলোক-প্রচলিত। কিন্তু বাংলার মূর্তিপূজাতে কেবলমাত্র দুর্গা-প্রতিমার সঙ্গে গণেশের মূর্তি থাকে। জনসাধারণের উপাস্যরূপে আর কোথাও গণপতির পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত নহে, কেবল বাংলার বণিকসম্প্রদায় সিদ্ধি-দাতারূপে গণেশের ছবি আপনাদের খাতার শিরোদেশে অঙ্কিত ও গণেশের

প্রতিমূর্তি ব্যবসায়-স্থানের দ্বারদেশের উপরে স্থাপন করিয়া থাকেন। এছাড়া বাংলার মূর্তিপূজায় বা প্রচলিত দেবোপাসনায় অতিপ্রাকৃতের বা অতিমানবতার প্রভাব অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে কম।

তারপর, বাংলার অবতারবাদকে আশ্রয় করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র ধর্মের গোড়ার অতিপ্রাকৃতের ও অতিমানবতার প্রভাব স্বল্প-বিস্তর ক্ষীণ হইয়া মানুষের আরাধ্য দেবতাকে মানবত্বের ভূমিতে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতবর্ষের পৌরাণিক ধর্মেও অবতারবাদের আশ্রয়ে পরমদেবতা মানবদেহ ধারণ করিয়া মানবত্বের ভূমিতে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। পশ্চিমে ও দাক্ষিণাত্যে এইরূপে শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা ধর্মকে বানবত্বের ভূমিতে আনিয়াছে। কিন্তু বাংলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে এই অবতারবাদ যে অদ্ভূত বিকাশ লাভ করিয়াছে সেরূপ আর ভারতের অন্য কোথাও হয় নাই। ভারতের অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা আছে। কিন্তু এসকল কৃষ্ণোপাসকেরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়াই জানেন। কেবল বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরাই শ্রীকৃষ্ণকে অবতাররূপে নহে, কিন্তু 'অবতারী' রূপে— অর্থাৎ যাহা হইতে সকল অবতার-প্রবাহ প্রকাশিত হয় সেই পরমপুরুষ শ্রীভগবানরূপে— প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'—আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করি, তিনি স্বয়ং ভগবান। শ্রীজীবগোস্বামী 'লঘু-ভাগবতামৃতে' স্পষ্ট করিয়াই কহিয়াছেন যে, যদু-সম্ভূত যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি অন্য। আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের কথা কহি, তিনি এই যদু-সম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ নহেন। যদু-সম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার রাজা ছিলেন, ভারতযুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সহায় ছিলেন, কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের রথের সারথি হইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের যে শ্রীকৃষ্ণ—

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কশ্চিৎ নৈব গচ্ছতি

বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কদাপি তিনি অন্যত্র গমন করেন না।

এই বৃন্দাবন তাঁহার চিদানন্দময় নিত্যধাম। এই শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ বা ষড়্‌ভুজ নহেন—তিনি সর্বদাই দ্বিভুজ। এইরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা বাংলার বৈষ্ণব মহাজনেরা স্বয়ং ভগবানের পরিপূর্ণ মানবত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভগবান নিরাকার নহেন, জড়াকারও নহেন, কিন্তু চিদাকার। তিনি বিদেহী নহেন, অপচয়-উপচয়শীল জড়দেহধারীও নহেন, কিন্তু চিদ্দেহধারী, নিখিল রসামৃত-মূর্তি। তিনি অতীন্দ্রিয় বটেন অর্থাৎ প্রাকৃত মানবীয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, তাই বলিয়া তিনি নিরীন্দ্রিয় নহেন, কিন্তু চিদিন্দ্রিয়-সম্পন্ন। তিনি নিঃসঙ্গ নহেন, কিন্তু তাঁহার নিত্যলীলা পরিজন ও পরিকর সঙ্গে

নিত্যকাল বিরাজিত। এইরূপে বাংলার বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ভগবানের পরিপূর্ণ মানবতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সাধারণ মনুষ্যত্বের ভূমিতে মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে এক নিত্য মাধুর্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীভগবানের অনন্ত লীলা, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি জীবের সঙ্গে তিনি অনন্তভাবে লীলা করিতেছেন।

কিন্তু

কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার সহায়।

এমন কথা ভারতের অন্যত্র কেন, জগতের আর কোথাও কেহ কহিয়াছেন বলিয়া জানি না। এই সিদ্ধান্ত সাধনার ও চিন্তার বলেই বাংলার কবি চণ্ডীদাস দুনিয়ার মানুষকে ডাকিয়া কহিয়াছেন—

শুন হে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

আধুনিক যুগের কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কবি ইহারই যেন প্রতিধ্বনি করিয়া গাহিয়াছেন—

কি আর বলিব রে, কে করিবে প্রত্যয়
এই মানুষে আছে সত্য, নিত্য চিদানন্দময়।

অতি সংক্ষেপে এবং সামান্য ভাবেও বাঙ্গালীর চিন্তার ও সাধনার ইতিহাস লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এক দুর্দমনীয় স্বাধীনতার স্পৃহা এবং সাধনের দ্বারা দেবতাকে মানুষ বলিয়া ধরা এবং মানুষের মধ্যে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করা, ইহাই বাঙ্গালীর পুরাগত সাধনার মূল লক্ষণ বলিয়া দেখিতে পাই। এই স্বাধীনতার ভাব ও মানবতার আদর্শ আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়াছিল বলিয়াই ইংরাজ যখন য়ুরোপের এই যুগের নূতন স্বাধীনতার ও নূতন মানবতার সংবাদ লইয়া আমাদের নিকট আসিল, আমাদের সেই লুপ্তস্মৃতিকে জাগাইয়াই তাহার এই নূতন শিক্ষা আমাদিগকে এমনভাবে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। যদি এই নূতন শিক্ষা আমাদের পুরাতন প্রাণের স্মৃতিকে না জাগাইত, তাহা হইলে কখনও আমরা ইহাকে এমন করিয়া প্রাণ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিতাম না। একই ইংরাজী শিক্ষা ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচারিত হইয়া বাংলায় যেভাবে ফলিত হইয়া উঠিয়াছিল, অন্যত্র সেভাবে হয় নাই, ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল বাংলার পুরাগত সাধনার বৈশিষ্ট্য। বাহিরে নূতন হইলেও

এই শিক্ষার মূলমন্ত্র আমাদের নিকট নূতন ছিল না বলিয়াই প্রাক্তনজন্য বিদ্যার মত ইহা আমাদের মধ্যে এমন অপূর্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

'বঙ্গবাণী'। ১৩২৯

বাংলা ভাষার প্রসার চিন্তা

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

১৮৫৯ - ১৯৫৬

এককালে আশা ছিল, বাংলা ভাষা ভারত-রাষ্ট্র ভাষা হইতে পারিবে। ক্রমশঃ সে আশা নির্মূল হইয়াছে। বাঙ্গালী উদাসীন না হইলে হিন্দীর বিরুদ্ধে লড়িতে পারিত। হিন্দী-ভাষীর সংখ্যাধিক্য, এই একটি গুণ ছিল। বাংলা-ভাষী দ্বিতীয় স্থান পাইত। আর, বাংলার রাষ্ট্রভাষা হইবার বহু যোগ্যতা ছিল। ইহার সোজা ব্যাকরণ, ইহার প্রচুর সংস্কৃতসম শব্দ, ইহার বিপুল সমৃদ্ধ সাহিত্য হিন্দী-ভাষার নাই। অনেক বাংলা পুস্তক হিন্দী-ভাষান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দীর তুলসীদাসী রামায়ণ ব্যতীত আর কোন পুস্তক বাংলা-ভাষান্তরিত হয় নাই।

বাংলা অক্ষরশিক্ষা কঠিন না হইলে ভাল ভাল বাংলা বই অন্য প্রদেশে প্রচারিত হইতে পারিত। শুনিতেছি, 'বিশ্বভারতী' রবীন্দ্রনাথের পুস্তক নাগরাক্ষরে প্রচার করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছে।[১] ইহা উত্তম কল্পনা। যদি কোন বঙ্গভাষা-হিতৈষী গ্রন্থপ্রকাশক বাংলা উত্তম সাহিত্যের অন্যান্য বই নাগরাক্ষরে মুদ্রিত করেন, বাংলা ভাষার প্রসার হইতে পারিবে। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও বিষবৃক্ষ, মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস, স্বামী বিবেকানন্দের 'যোগ' ও বক্তৃতা, শরৎচন্দ্রের দুই-একখানা বই নাগরাক্ষরে প্রচার করিতে পারিলে ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর পড়িবার সুবিধা হইবে। এই সকল বই সংক্ষেপ করিয়া লইতে হইবে এবং আবশ্যকস্থলে বাংলা শব্দের অর্থ লিখিয়া দিতে হইবে। বাংলা ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত পুস্তক আছে কিনা জানি না। পাঠশালার নিমিত্ত পুস্তক চলিবে না। যিনি সংস্কৃত, হিন্দী মারাঠী তামিল তেলেগু কিংবা ইংরেজী জানেন তিনি বই পড়িয়া যাহাতে নিজে নিজে বাংলা শিখিতে পারেন, সেই অভিপ্রায়ে বই লিখিতে হইবে। বাংলা অক্ষরপরিচয়, বাংলা পাঠ ও বাংলা ব্যাকরণের শব্দরূপ ও ধাতুরূপ, এই কয়েকটি বিষয় লইয়া একখানি বই, আর সংস্কৃত শব্দ না দিয়া কেবল বাংলা শব্দের একখানি ছোট কোশ চাই। আমি জানি, বর্তমানে এইরূপ পুস্তক না থাকিলেও অন্য প্রদেশবাসী বাংলা শিখিয়া বাংলা বই পড়িয়া থাকেন।

১ বিশ্বভারতী কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' নাগরাক্ষরে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়েছে ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে।—সম্পাদক।

প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষেও এইরূপ পুস্তকের প্রয়োজন আছে। দুঃখের বিষয়, বাংলা মুদ্রাকরেরা এখনও সেই পুরাতন যুক্ত-ব্যঞ্জনাক্ষর চালাইতেছেন। কলিকাতায় বাংলা-প্রসার-সমিতি আছেন। তাঁহারা সচেষ্ট হইলে বাংলা ভাষা-প্রচার কঠিন হইবে না। অন্যপ্রদেশবাসী দেখিলে বাঙ্গালী হিন্দীতে কথা কহিতে চেষ্টা করেন। এই ব্যবহারের দোষ আছে। ইহা দ্বারা বাংলা-প্রচার ব্যাহত হইতেছে। অন্যপ্রদেশবাসীর সহিত বাংলায় কথা কহা উচিত।

২। বাংলা ভাষার স্বরূপ রক্ষা

ইহার পর অন্য কর্তব্য আছে। যে যে গুণ হেতু ভারতে বাংলা ভাষার আদর হইয়াছে, যাহাতে সে সে গুণ অক্ষুণ্ণ থাকে, যাহাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে বাংলা লেখকদিগের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। যাহাতে বাংলা ভাষার স্বরূপ পরিবর্তিত না হয়, সে বিষয়ে বাংলা লেখকদিগের সর্বদা অবহিত থাকা উচিত। এক্ষণে বাঙ্গালী দুর্বল, ভিন্নপ্রদেশে নগণ্য। একমাত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্বারা বাঙ্গালীর পূর্বগৌরব রক্ষিত হইতে পারিবে।

বর্ষে বর্ষে নানাবিধ বাংলা পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র, বারমাসিক পুস্তক (Magazine) ও সামিতিক পুস্তক, এই ত্রিবিধ পত্র ও পুস্তক বর্তমানে ৩২৯ খানি প্রচারিত হইতেছে। ভারত-পরিষদের এক প্রশ্নের উত্তর হইতে এই সংখ্যা জানিতেছি। বোধহয় বর্তমানে বাংলা-লেখক দেড়-হাজার দুই-হাজার হইবেন। সমিতি-বিশেষ দ্বারা প্রচারিত পুস্তক অতি অল্প। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বিজ্ঞান-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক পুস্তক ও এইরূপ অন্যান্য পুস্তককে আমি সামিতিক পুস্তক বলিতেছি। ইহাদের পাঠকসংখ্যা অল্প। সংবাদপত্র অবশ্য পত্র, বাঁধা পুস্তক নয়। বারমাসিক পুস্তক (সংবাদ = সমূহ ; সমূহের নিমিত্ত মাসিক পুস্তক) বদ্ধপত্র। এই কারণে আমি ইহাকে পুস্তক বলিতেছি। সংবাদপত্র ও বারমাসিক পুস্তক দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রচারিত হইতেছে। এমন বিষয় নাই যাহা বাংলা ভাষার দ্বারা জনসাধারণের নিকট প্রচারিত হয় না। বাংলা গল্পের বই অগণ্য। প্রতি বৎসর নূতন নূতন গল্পের বই ছাপা হইতেছে।

বর্তমান লেখকেরা ইংরেজী-শিক্ষিত। কেহ কেহ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে প্রবীণ ; কেহ বা সর্বদা ইংরেজী সাহিত্য, সংবাদপত্র, বারমাসিক

ইত্যাদি পড়িয়া থাকেন। ইহাদের বাংলা শিক্ষার অবসর হয় না। কেহ বা বাল্যকালে সংস্কৃত ভাষা অল্প শিখিয়াছিলেন, এখন ভুলিয়া গিয়াছেন। কেহ বা বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন ভাবেন নাই। এইরূপ স্থলে তাঁহাদের রচনায় ইংরেজীর অনুকরণ আসা বিচিত্র নয়। শব্দ বাংলা, কিন্তু প্রকাশ বাংলা নয়। উদাহরণ দিতেছি।

ভদ্রতা শিক্ষার উপর 'নির্ভর করে'। পরিশ্রমের উপর সাফল্য 'নির্ভর করে'।

আপনার উপস্থিতি 'প্রার্থনীয়'।

বৌদ্ধ যুগে নারীর 'স্থান'। শিশুশিক্ষায় শিল্পের 'স্থান'। এম-এ পরীক্ষায় প্রথম 'স্থান' অধিকার করিয়াছে।

হিন্দুধর্মে বৌদ্ধধর্মের 'দান'। বাংলাসাহিত্যে ইসলাম সংস্কৃতির 'দান'।

সভার কার্য 'সাফল্যমণ্ডিত করিবেন'।

'ভাষার কার্য হইতেছে মনের ভাব প্রকাশ করা'।

আচার্য যদুনাথ সরকারের[১] বয়স ৭৮ বৎসর 'পূর্ণ হওয়ায়' বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 'পক্ষ হইতে' তাঁহাকে সম্বর্ধনা করা হইয়াছে। 'এই উপলক্ষ্যে' আমরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমরা 'সমবেদনা জানাইতেছি'।

মাতৃভাষার 'মাধ্যমে' শিক্ষাদান।

'দৃষ্টিকোণ' পরিবর্তন করিতে হইবে। মাতৃভাষা শিক্ষার 'বাহন'।

'কাজে যোগদান, গানে যোগদান, প্রার্থনায় যোগদান।' ইত্যাদি।

মনে মনে এই সকল বাক্যের ইংরেজী অনুবাদ না করিলে অর্থবোধ হয় না। এই সকল উদাহরণের বাক্যের ভাব বাংলা ভাষায় অক্লেশে প্রকাশ করিতে পারা যায়। এইরূপ বাক্য বাংলা ভাষার প্রকৃতির সহিত মিশিতে পারে না।

কেহ কেহ ঋজু পথে চলিতে পারেন না। ঋজু ভাষায় ভাবপ্রকাশ করিতে পারেন না। তাঁহাদের ভাষা জটিল হইয়া পড়ে। কেহ বাগ্‌ভঙ্গি না করিয়া, কেহ বা একই বিষয় ঘুরাইয়া পাঠককে অকারণ কষ্ট না দিয়া লিখিতে পারেন না। ইংরেজী সংবাদপত্রের ভাষা ফাঁপা। বাংলা সংবাদপত্রেও তাহার অনুকরণ

১ যদুনাথ সরকার: জন্ম ১৮৭০, মৃত্যু ১৯৫৮।

ঘটিতেছে ; কিন্তু যিনি যাহাই লিখুন রচনায় প্রসাদগুণ ও মাধুর্য না থাকিলে পাঠক পড়িতে ইচ্ছা করেন না।

সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিলা নৌকা বামাস্বর শুনি ॥

বাংলা ভাষার প্রকৃত রূপ এখানে স্পষ্ট হইয়াছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও এইরূপ। আরও পুরাতন বড়ুচণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, তেমন মধুর। ইংরেজী আমলেও প্রথম প্রথম বাংলা ভাষার প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ ছিল। কেবল পদ্যের ভাষা নয়, গদ্যের ভাষাও বাংলা ছিল। সেকালের সংবাদপত্রের ও পত্রপ্রেরকদিগের ভাষা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় বাংলা ভাষার স্বরূপ রক্ষিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল 'সীতার বনবাস' লেখেন নাই, 'কথামালা' লিখিয়াছিলেন। বাল-পাঠ্য-পুস্তকে কথামালার ভাষার লালিত্য কদাচিৎ লক্ষিত হয়। বাংলা ভাষায় নানাবিধ ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কয়খানি ইতিহাসের ভাষায় মাধুর্য আছে? কালী সিংহের মহাভারত পড়ুন, তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্য ও লালিত্য কয়খানা বাংলা ইতিহাসের বইতে আছে?

কেহ কেহ মনে করেন, রচনায় মৌখিক ভাষার সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিলে বর্ণনার বিষয় অতিশয় সুবোধ্য হয়। ইহা এক বিষম ভ্রম। হইতেছে স্থানে হচ্ছে, করিতেছে স্থানে কচ্ছে, দেখিয়াছিলাম স্থানে দেখেছিলাম, লিখিলে বাক্য সুগম হয় না। বাক্য ছোট ছোট হইলে কচ্ছে হচ্ছে কটু শোনায়, পড়িতে ইচ্ছা হয় না। 'মহান্ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে'—এখানে 'গড়ে' পীড়িত করিতেছে। তদুপরি 'মহান্' প্রতিষ্ঠান শুনিলে হতাশ হইতে হয়। কেহ কেহ 'বলে চলে গেল' লিখিয়া মনে করেন ভারি সোজা ভাষা লিখিলেন। কিন্তু এই ভাষা পড়িয়া বুঝিতে হইলে অন্ততঃ দুইবার পড়িতে হয়। কেহ কেহ 'ব'লে চ'লে গেল' লিখিয়া পাঠককে সাবধান করিয়া দেন, 'বলে চলে' নয়, 'বলিয়া চলিয়া' বুঝিতে হইবে। ব ও চ-এর পরে উৎকলা (') লেখার কোনও যুক্তি নাই। হইত স্থানে হ'ত, হইল স্থানে হ'ল ; উৎকলা হ-এর পরে ঠিক বসিয়াছে। তদ্দ্বারা বুঝিতে হয়, একটি ই লুপ্ত বা গ্রস্ত। সেই নিয়মে 'চ'লে ব'লে' পড়িতে হয় 'চইলে বইলে'। ইহা কি পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিতের 'চইল্যা বইল্যা'? করিয়া, সংক্ষেপে আমরা বলি কর্যে, 'কইর্যে' বলি না। এখানে

করে' লিখিলে বুঝি য-ফলা গ্রস্ত হইয়াছে। কবিকঙ্কণে 'র‍্যান্ধা বাড়্যা' আছে। তখনকার উচ্চারণে ঠিক বানান হইয়াছে। এখন আমরা বলি, 'রেঁধে বেড়ে'। উচ্চারণ অনুযায়ী ঠিক বানান করি।

সেদিন 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ কর্তৃক বিতরিত' একখানা 'কথাবার্তা' নামক পত্রে 'খাদ্য পরিস্থিতি' পড়িতেছিলাম (১৯শে জানুয়ারী)। "অসামরিক সরবরাহ সচিব প্রদেশের খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেন, মাথা পিছু দু সের চালের বরাদ্দ যদি চালিয়ে যেতে হয় তবে সরকার এ-বৎসর যে পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করতে মনস্থ করেছেন তাহলেও পঞ্চাশ হাজার টন চাল ও গম ঘাটতি পড়বে।" আর একখানি 'কথাবার্তা'য় (১৬ই ফেব্রুয়ারী) পড়িলাম, "সৌন্দর্য জিনিসটা স্বাস্থ্যের ওপরই বেশী নির্ভর করে। আয়ত টানা টানা দুটি চোখ, সুঠাম টিকোলো একটি নাক এবং ফ্যাকাশে রকমের ফর্সা রঙের অধিকারী মানুষটিকেও ঠিক সুন্দর বলা চলবে না—জ্যোতিহীন চোখের গড়ন যত ভালোই হোক সে চোখ, স্বাস্থ্যের লক্ষণযুক্ত উজ্জ্বল চোখের তুলনায় কম সুন্দর," ইত্যাদি। এইরূপ ইংরেজী-বাংলা ভাষার পাঠক সহজে পাওয়া যাইবে না। মুসলিম-লীগ-মন্ত্রিত্বকালে 'জানবার কথা' নামে একখানা পত্র বিতরিত হইত। তাহার ভাষা মন্দ ছিল না; পড়িতে ও বুঝিতে পারা যাইত। তাহাতে চিত্রে একজন গ্রামবাসী স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রসূতিতত্ত্ব কৃষিতত্ত্ব ইত্যাদি নানা জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইত। কিন্তু লোকটিকে ম্যালেরিয়া-ভোগী, প্লীহারোগী দেখাইত। 'কথাবার্তা'য় একখানি চিত্র আছে; সে চিত্রের মর্ম কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। এক ঘরের উঠানে এক বৈঠক হইয়াছে। এক কথক এক মুসলমানকে কি বলিতেছে। একজন উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছে। একজন ঊর্ধ্বজানু হইয়া বসিয়াছে। আর, দুইজন মারোয়াড়ীর একজন গা ভাঙ্গিতেছে, আর একজন বোধ হয় তাহার নিজের ধান্ধা ভাবিতেছে। এক দ্বারপিণ্ডে দণ্ডায়মানা নারীও শুনিতেছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে 'কথাবার্তা'র শ্রোতা পাওয়া যাইবে কি? এমন অশিষ্ট বাঙ্গালী আছে কি যে এক ভদ্রলোকের পাশে ঊর্ধ্বজানু হইয়া বসে? এখানে ভাষা দেখিতেছি, সৌন্দর্য-বিশ্লেষণ ছাড়িয়া দিলাম।

অনেকদিন পূর্বে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় এক বিজ্ঞাপনের সঙ্গে এক গল্প পড়িয়াছিলাম। বাস্তবিক গল্প নয়। গবর্মেণ্টের এক বিষয়ে কত খরচ হইয়াছে, কেন তত খরচ হইয়াছে, তাহার যুক্তি দেখান হইয়াছে। প্রচারক ঠিকই

বুঝিয়াছেন, গল্প না হইলে কেহ পড়িবে না। ঔষধ তিক্ত, মধুমিশ্রিত না হইলে কেহ সেবন করিবে না। কিন্তু ব্যাপারটি হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে। এই গল্পের পরে স্বাস্থ্য-বিভাগের এক বিজ্ঞাপন আছে। অনাড়ম্বর বিজ্ঞাপন, কিন্তু কাজের হইয়াছে। "স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে অমুক ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।" কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বেঙ্গল গবর্মেণ্টের নাম-গন্ধও নাই।

দুরূহ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখুন, জ্ঞানপ্রচার করুন, কিন্তু জ্যেঠামি করিবেন না। কেহ কাহারও জ্যেঠামি সহিতে পারে না। দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা, ভাষার ভঙ্গিমা, গল্পের ছলনা পাঠকের বিরক্তি সঞ্চার করে। পাঠককে মূর্খ, নির্বোধ না ভাবিলে কেহ জ্যেঠামি করে না।

এতদিন বাংলা ভাষার বাগ্‌রীতি প্রসন্না ছিল। যথা—একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। কিছুকাল হইতে আর দুই রীতি আবির্ভূত হইয়াছে। (১) প্রচণ্ডা। যেমন জ্বর-বিকারে রোগীর হাত-পায়ের আক্ষেপ হয়, ইহা সেইরূপ। যথা—ফুটেছিল হাড় একদা এক বাঘের গলায়। (২) প্রলীনা। যেমন অবসন্ন দেহে ক্লান্তি আসে, দেহ সোজা থাকে না, এলাইয়া পড়ে, ইহা সেইরূপ। যথা—এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল, একদা।

প্রচণ্ডা ও প্রলীনা রীতির প্রয়োজন আছে, কিন্তু যেখানে সেখানে প্রচণ্ডা রীতি দেখিলে রঙ্গমঞ্চে ভীমসেনের গর্জন মনে হয়। কেহ কেহ প্রলীনা রীতিতে কবিত্ব দেখিতে পান। বাস্তবিক, কবিত্ব নয়, জ্যেঠামি। যথা-স্থানে যথাযোগ্য শব্দ বিন্যাস দ্বারা চিন্তা ও মনের ভাব সম্যকরূপে প্রকাশ করিতে না পারিলে রচনা সার্থক হয় না। বাঙ্গালা দেশকে গল্পরূপ ভূত পাইয়া বসিয়াছে। গল্প নয়, কিন্তু বহির নাম গল্প রাখা হইতেছে। গীতার গল্প, চণ্ডীর গল্প, রামায়ণের গল্প, কালিদাসের গল্প, শরীরের গল্প ইত্যাদি নাম হইতে বিষয় বুঝিতে পারা যায় না। বাঙ্গালী পাঠক গল্প পড়িয়া পড়িয়া তরলমতি হইয়া পড়িতেছে। যে রচনা বুঝিতে হইলে ধীরে ধীরে পড়িতে হয়, প্রত্যেক শব্দ বুঝিয়া যাইতে হয়, তাহা পাঠকের প্রীতিকর হয় না। প্রত্যহ লঘু আহার করিলে দেহের পরিপাক-শক্তির হ্রাস হয়, গল্প পড়িয়া পড়িয়া পাঠকের চিত্তও তরল হয়। পরে গল্প পড়িতেও তাহার ধৈর্য থাকে না। গল্প-লেখক কত স্থানে কত অলঙ্কার আনিয়াছেন, মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়াছেন, ভাষার বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন।

কিন্তু পাঠক এ সকল বিষয় লক্ষ্য করেন না। তিনি গল্পের বহির পাতা উল্টাইতে থাকেন। আর তারপর কি, তারপর কি, খুঁজিতে থাকেন। এক বিশেষ কারণে আমাকে এক গল্পের বই পড়িতে হইয়াছিল। জল্পক মহাশয় ভাষাচাতুর্যে ও ইতিহাসজ্ঞানে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। ৪।৫টি গল্পের সমষ্টি। পড়িতে দুই দিনে চারি ঘণ্টা লাগিয়াছিল। সেই বই এক বি-এ পাস তরুণ দুই ঘণ্টায় শেষ করিয়াছিল। গল্পের এই পরিণাম লেখক মহাশয়েরা অবগত আছেন কিনা জানি না।

বিষয় যাহাই হউক, ভাষা ভুল থাকিলে পাঠক বিরক্ত হন। ভুল অনেক প্রকার হইতে পারে। শব্দের বানান ভুল, প্রয়োগ ভুল, অর্থ ভুল, এবং বাক্যের ব্যাকরণ ভুল, বারমাসিক পুস্তকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় সে রকম ভুল লেখকের পুস্তকেও ঘটে। দুই-এক খানা বার-মাসিকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কতকগুলি ভুল দেখিয়াছি।

সংবাদপত্র-প্রচার ও শিক্ষা-বিস্তার দ্বারা বঙ্গের সর্বত্র লৈখিক ভাষার সমতা আসিয়াছে। শব্দের বানান দ্বারা শব্দের রূপ স্থির থাকে। উচ্চারণ সর্বত্র সমান নয়, হইতে পারে না। কোথাও অনুনাসিক চন্দ্রবিন্দু-উচ্চারণ প্রচুর, কোথাও নাই। কোথাও ড় ঢ় অক্লেশে উচ্চারিত হয়, কোথাও হয় না। সামাজিক ব্যবস্থা সর্বদা পরিবর্তনশীল হইলে সমাজের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ভাষা এক সামাজিক উপায়। ইহার একরূপতা রক্ষা না হইলে ইহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। কালান্তরে অল্পে অল্পে পরিবর্তন হইলে সামাজিক অপর ব্যবস্থার তুল্য ভাষা-ব্যবস্থাও সমাজের হিতকর হয়। শব্দের বানান হঠাৎ পরিবর্তন করিলে কিম্বা কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর বা গণের উচ্চারণ অনুসারে শব্দের বানান পরিবর্তন করিলে ভাষা-বিপ্লব ঘটে। যেমন জীবজাতির পরিণাম শ্রেয়স্কর কারণ তদ্দ্বারা সে দেশ ও কালের পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তেমন ভাষার হয়, ভাষার যাবতীয় অঙ্গেরও হয়। ব্যাকরণ ভাষার পরিণাম স্বীকার করিবেন, কিন্তু বিবর্তন স্বীকার করিবেন না। ব্যাকরণ পরিণামের সূত্র রচনা করিবেন, ভাষার রূপ বাঁধিয়া দিবেন, কোশে সে সূত্র অনুযায়ী শব্দের বানান, অর্থ, প্রয়োগ পাওয়া যাইবে। কদাচিৎ বহুল প্রয়োগ রক্ষা করিয়া এই তিনেরই ব্যতিক্রম ঘটে। কিন্তু সাধারণতঃ ভাষাকে রক্ষণশীল হইতেই হইবে।

এতকাল জানিতাম, ক বর্গের অনুনাসিক ঙ, চ বর্গের ঞ, ট বর্গের ণ, ত

বর্গের ন, প বর্গের ম, এবং য র ল ব শ ষ স হ, এই আট অবর্গ বর্ণের অনুনাসিক ং (অনুস্বার)। এখন দেখিতেছি অনুনাসিক ঙ স্থানে ং লেখা হইতেছে। পূর্বে সম্ উপসর্গের ম্ স্থানে কোন কোন শব্দে ং লেখা হইত। প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে আমি একখানা বইতে 'সংখ্যক' লিখিয়াছিলাম। মুদ্রাকর আমার বানান কাটিয়া 'সঙ্খ্যক' করিয়াছিলেন। তৎকালে সংখ্যা, সংগ্রাম, সংগ্রহ, সংক্ষেপ বা সংক্রান্তি ইত্যাদি মাত্র কয়েকটি শব্দে ং দেখা যাইত। সংস্কৃত পুস্তকে ক বর্গের পূর্বে একটা শব্দও থাকিত না। এখনও থাকে না। পাঁচ-সাত বৎসর হইতে নব্য লেখকেরা অনুনাসিক ঙ বর্জন করিয়া সকল শব্দেই ং লিখিতেছেন। শংকা কলংক মংগল সংগীত সংঘ ইত্যাদি শব্দের বহু প্রচলিত ঙ স্থানচ্যুত হইতেছে। ইহার একটি কারণ, ক'এর মস্তকে শয়ান ঙ অক্ষর স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং সকলে লিখিতেও পারেন না। গ অক্ষরের মস্তকে ঙ পরস্পর যুক্ত হইয়া গিয়াছে, সকলে ঙ্গ লিখিতেও পারেন না। তাঁহারা স্পষ্ট ঙ লিখিয়া পাশে ক কিম্বা গ স্বচ্ছন্দে লিখিতে পারেন। ঙ্খ ঙ্ঘ সেইরূপই লেখা হইয়া থাকে। দিঙ্‌নির্ণয়, দিঙ্‌মুখ শব্দেও ঙ স্পষ্ট। এইরূপ ঙ্ক ঙ্গ লিখিলে ং লিখিবার কোন হেতু থাকে না। সংস্কৃত ব্যাকরণে, কিম্বা বাংলা ব্যাকরণে ঙ স্থানে ং, এই বিকল্প বিধি নাই। বিকল্প বিধির দোষ এই, লেখককে অকারণ ভাবনায় পড়িতে হয়। কেহ দিল্লী যাইতেছেন ; কিছুদূর গিয়া দেখিলেন, দিল্লী যাইবার আর এক পথ আছে। তখন তাঁহাকে ভাবিতে হয়, তিনি কোন্ পথে যাইবেন। বুদ্ধিমান্ হইলে 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ,' অর্থাৎ বহুজন যে পথে গিয়াছে সেই পথই ধরিবেন। 'বাংলা', এই বানান ঠিক। কিন্তু বাংলা লিখিবার কি যুক্তি আছে? বঙ্গ হইতে বঙ্গাল, বঙ্গালা, বাঙ্গালী। অপর প্রদেশে আমরা বাঙ্গালী নামে পরিচিত। তাঁহারা বাঙাল জানেন না। প্রায় সাত কোটি বাংলাভাষীর কয় জন 'বাঙলা বাঙালী' উচ্চারণ করিতে পারেন? সত্য কথা বলিতে কি, 'বাঙালী' দেখিলে আমি 'বাওঁআলী' পড়ি। কারণ, বাঙন (বামন), শাঙন (শ্রাবণ), কুঙার (কুমার), কাঙরূপ (কামরূপ), 'পাখীজাতি যদি হঙ, পিয়াপাশে উড়ি যাঙ,' 'ধামসা ধাঙ ধাঙ' ইত্যাদি উদাহরণে ঙ অক্ষরের উচ্চারণ স্পষ্ট হইয়াছে। সুখের বিষয়, সকলে 'বাঙলা' 'বাঙালী' লেখেন না।

সংস্কৃত যে সকল শব্দে অনুনাসিক আছে, বাংলা রূপান্তরে সে সকল শব্দে চন্দ্রবিন্দু লেখাই বিধি। যেমন, দন্ত দাঁত, অঙ্ক আঁক। দুই-একটা ব্যতিক্রম

আছে। যেমন, লম্ফ লাঁফ নয়, লাফ। কিন্তু দেখি, বিমান 'ঘাঁটি'। ঘট্ট হইতে ঘাট, ঘাটি, ঘাটিয়াল বা ঘেটেল, ঘাটোয়াল শব্দ আসিয়াছে; একটাতেও চন্দ্রবিন্দু নাই। নূতন কলসীতে জল চুইয়া পড়ে, 'চুঁইয়া' পড়ে না। ভাত চুঁইয়া যাইতে পারে। জোয়ার-'ভাঁটা' নয় 'জোয়ার-ভাটা'। সংস্কৃত খুজ ধাতু হইতে বাংলা খুজ ধাতু। পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য লোক 'খুজি, খোজাখুজি' বলে, 'খুঁজি, খোঁজাখুঁজি' বলে না। বোঝার উপর শাকের আঁটি হইবে 'বোঝার উপর শাগের আটি' (বাংলা শাগ ও সংস্কৃত শাক এক দ্রব্য নয়)। কিন্তু, আমের আঁঠি, পায়ের আঁঠু।

অন্তঃস্থ-ব (ব) পরে থাকিলে সম্ উপসর্গের ম্ স্থানে অনুস্বার হয়। কারণ ং অবর্গবর্ণের অনুনাসিক। এইরূপে সংস্কৃতে 'কিংবা' 'বশংবদ' 'সংবাদ' লিখিত হয়। কিন্তু বাংলায় অন্তঃস্থ-ব উচ্চারিত হয় না। আমরা বর্গীয়-ব জানি। ম ইহার অনুনাসিক। সেই হেতু লিখি, সম্বৎসর সম্বরণ সম্বলিত সম্বাদী সম্বর্ধনা। পূর্বে 'সংবাদ' ছিল না, সম্বাদ ছিল। কিম্বা বশম্বদ এখনও আছে। কিংবা, বশংবদ লেখা পাণ্ডিত্যমাত্র।

ইংরেজী and-এর নানারকম বাংলা বানান দেখিতে পাই। এণ্ডবানান প্রচলিত ছিল। কিন্তু atom শব্দের বাংলা বানান য়্যাটম, অ্যাটম, এ্যাটম, এইরূপ দেখি। আমি এ্যাটম লেখা সঙ্গত মনে করি। কিছুদিন হইতে 'মাস্টার' 'স্টেশন' দেখিতেছি। কিন্তু আমরা বলি, মাষ্টার, এষ্টেশন, ষ্ট্রীট; এই বানানই ঠিক। ইংরেজী কি অপর ভাষার শব্দের উচ্চারণ আমরা সে সে ভাষা অনুযায়ী করি না। আমরা ইস্তেহার গোমস্তা খোসামোদ তমশুক নোটিশ পুলিশ ইত্যাদি বলি ও লিখি! এ পর্যন্ত কেহ আমাদের উচ্চারণ-দোষ ধরেন নাই।

সেদিন দেখিতেছিলাম, কেহ লিখিয়াছেন, 'তাদেরকে পাঁচ টাকা দিও'। 'তাদেরকে' 'আমাদেরকে' ইত্যাদি স্থানবিশেষের গ্রাম্য প্রয়োগ শুদ্ধ ভাষায় চলিতে পারে না। 'তাদের বলে ধরে এনো'। এই বাক্যের কি অর্থ হইবে কে জানে? সে বল্লো, আমি যাবো, দেখবো; সে যেতো, দেখতো; দেখলো, হলো, ইত্যাদি বারমাসিকের পৃষ্ঠায় দেখিয়াছি। 'মশারা জলে ডিম পাড়ে' 'গাছেরা রোদে পাতা মেলিয়া দেয়', এইরূপ ভাষা দেখিলে মনে হয় বাংলা প্রেসে প্রুফ-রীডার অর্থাৎ প্রুফ-শোধকও নাই। থাকিলে, সাধু ভাষার ওপর, ভেতর বের ইত্যাদি স্থান বিশেষের ভাষা দেখিতাম না। 'তাদের ভেতর কেহ সাহসী

ছিল না', 'দশদিনের ভিতর দেখা করিবে,' 'ছোট বেলায় দেখিয়াছি', 'অনেকগুলি বই পড়িতে হয়', 'সব কিছু বাকি আছে,' 'অনেক কিছু করিবার আছে', 'তাদেরকে ডাক' ইত্যাদি প্রয়োগ স্থান বিশেষের ভাষা, বাংলা নয়। 'একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন', 'একটা ভয় বোধ করিলেন' ইত্যাদি প্রয়োগ ইংরেজী না বাংলা, বুঝিতে পারা যায় না। হাজার হাজার ছাত্র পরীক্ষা 'দিতেছে'। কেহ পাস 'করে', কেহ ফেল 'করে'। কেহ ট্রেন মিস 'করে'। কাহারও হার্ট ফেল 'করে'। এইরূপ ভাষা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, লেখকেরা চিন্তা করেন না। ছাত্রেরা পরীক্ষা 'দেয়' না নেয়? ছাত্রেরা আপনাদিকে পাস করে ফেল করে, না, পরীক্ষক করেন? বাংলা ভাষায় ইংরেজী ক্রিয়াপদ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। হার্ট ফেল হয়, ট্রেন মিস হয়, কেহ পাস হয়, কেহ ফেল হয়, ইত্যাদি। পরীক্ষকেরা পরীক্ষা দেন, ছাত্রেরা তাহা গ্রহণ করে।

আমরা বাংলা ভাষার গৌরব করি। যাহাতে সে ভাষা স্বকীয় রূপ পরিত্যাগ না করে, লেখক মাত্রেরই দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। নূতন শব্দ আসুক, দেশী বিদেশী শব্দ ও ভাব আসুক, তদ্দ্বারা বাংলা-সাহিত্য পুষ্ট হইবে। কিন্তু দেখিতে হইবে, বাংলা ভাষার ধাতুর সহিত, বাংলা ভাষার ঐতিহ্যের সহিত মিশিতেছে। নচেৎ অন্য প্রদেশের পাঠকের নিকট বাংলা ভাষা অপাঠ্য হইয়া থাকিবে।

৩। ইংরেজীর বাংলা

বঙ্গের দৈনিক সংবাদপত্রের বিস্ময়কর ক্ষমতা জন্মিয়াছে। কেহ সন্ধ্যাবেলায় ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলেন; পরদিন সকালবেলায় দেখি দৈনিক সংবাদপত্রে তাহার বাংলা ভাষান্তর বাহির হইয়াছে। বক্তৃতার পরেই বাংলা অনুবাদ হইয়াছে; রাত্রে রাত্রে ছাপা হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ, কেহ সন্ধ্যাবেলা বাংলায় বক্তৃতা করিলেন, পরদিন প্রাতে সে বক্তৃতা ইংরেজীতে পড়িতেছি। ইংরেজী যেমন তেমন ভাষা নয়, আর বক্তৃতাও এক বিষয়ে নয়। অনুবাদ কোথাও কোথাও ভুল থাকিতে পারে। কিন্তু তদ্দ্বারা অনুবাদকের ক্ষমতার লঘুতা হয় না।

দৈনিক পত্রের সম্পাদক ও বাংলা অনুবাদক ভাবিবার সময় পান না। অনেক ইংরেজী শব্দ বাংলা অক্ষরে লিখিতেছেন। অনেক ইংরেজী শব্দের বাংলা অনুবাদ করিতেছেন, ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত শব্দের অর্থান্তর ঘটাইতেছেন। দেখি,

গণ-পরিষদ্, গণতন্ত্র, গণশিক্ষা, গণসমিতি। 'গণ' শব্দ সংস্কৃত এবং ইহার সংস্কৃত অর্থ বাংলা ভাষায় বহু প্রচলিত আছে। যেমন, বালকগণ, অর্থাৎ বালক নামে যে গণ (group বা genus) আছে তাহাকে বুঝায়। অতএব 'জন' শব্দের পরিবর্তে 'গণ' বলিতে পারি না। লৈখিক ভাষায় ভ্রম একবার প্রবেশ করিলে তাহার সংশোধন অতিশয় দুঃসাধ্য হয়। যাঁহারা পুস্তক রচনা করেন ও বারমাসিক পুস্তকে প্রবন্ধ লেখেন তাঁহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিবার অবকাশ পান। তাঁহাদের ভুল নিন্দনীয়, স্বীকার করিতে হইবে।

ইংরেজী ভাষা অতিশয় সমৃদ্ধ। তাহার তুলনায় বাংলা কিছুই নয়। দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক নাম ও পরিভাষা ছাড়িয়া দিলেও সামান্য সংসারযাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নাম এবং দ্রব্যের গুণ ও ক্রিয়ার ভেদ বাচক শব্দ এত আছে যে, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তাহার শতাংশও নাই। Plan, Scheme, Design, Project শব্দগুলির অর্থ এক নয়। কিন্তু বাংলায় এক 'পরিকল্পনা' আশ্রয় লইয়াছে। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষার শব্দ অল্পে অল্পে বাড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা সে সুযোগ পাইতেছি না। হঠাৎ নদীর বন্যার মত নানাজাতীয় ভাব ও ক্রিয়া-বাচক শব্দ আসিয়া পড়িয়াছে। বাংলা ভাষার প্রসার করিতে হইলে নূতন নূতন শব্দ সঙ্কলন ও রচনা করিতে হইবে। কয়েকজন বিজ্ঞ এই কর্মে রত থাকিলে অল্পে অল্পে বাংলা ভাষার বর্তমান দৈন্য দূরীভূত হইতে পারিবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ্ বাংলা ভাষার পুষ্টিসাধনে ব্রতী হইতে পারেন।

ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দুই প্রকারে রচনা করিতে পারা যায়। (১) শব্দান্তর; (২) শব্দের ভাবানুবাদ। যে শব্দ দ্বারা ইংরেজী শব্দের ভাব রক্ষিত হয় সেই শব্দই শুদ্ধ। ইংরেজী Use শব্দের বহু অর্থ আছে। বাংলায় সর্বত্র 'ব্যবহার' লিখিলে বাংলা ভাষার স্বরূপ রক্ষিত হয় না। আমরা ভাত খাই, কাপড় ও জুতা পরি; চশমা পরি; গাড়ীতে চড়ি ইত্যাদি স্থলে 'ব্যবহার' লিখিলে বাংলা হয় না। এইরূপ প্রত্যেক শব্দের ভাবানুবাদ করিয়া লইতেহয়। এখানে কয়েকটা ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বিচার করিতেছি।

Situation—পরিস্থিতি শব্দটি মন্দ নয়, কিন্তু অনাবশ্যক। অবস্থা শব্দ বহু প্রচলিত Food Situation-খাদ্য পরিস্থিতি॥ অর্থাৎ বলিতেছি, খাদ্যের অবস্থা। কিন্তু বলিতে চাই, অন্নকষ্ট।

Damodar Valley Project—দামোদর বাঁধ পরিকল্পনা॥ ইহা

অপেক্ষা 'দামোদরের আড়বাঁধ প্রযুক্তি' ভাল মনে হয়। Plan—উপায়-কল্পনা, উপায়-সন্ধান। Ten Year Plan—দশ বৎসরের উপায় নির্দেশ। Scheme, আমি প্রকল্প করিয়াছি।

Inflation—মুদ্রাস্ফীতি॥ মুদ্রা স্ফীত হইবে কেমন করিয়া? মুদ্রা শূন্যগর্ভ হইলে স্ফীত হইতে পারিত। Inflation—মুদ্রাবাহুল্য। কলিকাতায় হিন্দীভাষী বাংলা ভাষার রূপান্তর ঘটাইতেছেন। কাপড় ধোলাই, মদ চোলাই, কাগজওয়ালা, মিঠাইওয়ালা, পাহারাওয়ালা ইত্যাদি বাংলা শব্দ নয়। 'চাহিদা' কোথা হইতে আসিল? শব্দটির বাংলা রূপ দিলে চাহ (প্রার্থনা) + তি=চাহ্‌তি, বা চাহতা হইতে পারে। Demand and Supply, চাহতি ও যোগানি, চলিতে পারে।

Vitamin—খাদ্যপ্রাণ॥ ইহা এক অদ্ভুত আবিষ্কার। খাদ্যের প্রাণ, না খাদ্য-রূপ প্রাণ, না আর কিছু? আশ্চর্যের বিষয়, বালকের পাঠ্যপুস্তকেও বহুকাল হইতে 'খাদ্যপ্রাণ' চলিয়াছে। কে এই শব্দের জনক জানি না। নিশ্চয়, তিনি ডাক্তার নহেন। তিনি জানেন, প্রাণ সুলভ নয়, দুই এক আনায় কিনিতে পাওয়া যায় না। বহুকাল পূর্বে আমি পাললীয় (পলল হইতে পালো, Carbohydrate), পলীয় (পল মাংস, protein), স্নেহ (fat), পার্থিব (mineral), এই নাম চতুষ্টয় প্রস্তাব করিয়াছিলাম। এইরূপ শব্দের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ভাইটামিন শব্দের 'পোষ', এই নাম রাখা যাইতে পারে।

Basic Education—বুনিয়াদী শিক্ষা॥ ইহা আর এক আশ্চর্য শব্দ। বনিয়াদী ঘর জানি, বুনিয়াদি ঠাট জানি। বনিয়াদী (বাংলায় বুনিয়াদী নয়) সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু Basic Education সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা নয়। বনিয়াদী শিক্ষা বলিলে বুঝি, যে শিক্ষার বনিয়াদ বা মূল আছে। কিন্তু Basic Education তাহা নহে। যে শিক্ষা প্রথম বা আদ্য, যাহার পরে অন্য শিক্ষা আসে, সেই শিক্ষা বুঝায়। অতএব Basic Education প্রাথমিক শিক্ষা বা আদ্যশিক্ষা। এই শিক্ষার রূপ কি হইবে, বিদ্যাশ্রয়ী অথবা কলাশ্রয়ী হইবে, সে কথা ভিন্ন। গান্ধিজীর শিক্ষাপ্রকল্পে এই প্রশ্নের একটা উত্তর ছিল। তিনি চাহিতেন, শিশুকে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্মাণ শিক্ষা দিতে হইবে এবং তাহাকে আধার করিয়া শিশুকে সুশীল ও জ্ঞানবান্ করিতে হইবে। শিশু বুঝিবে, সে এমন দ্রব্য নির্মাণ করিতেছে যাহা লোকে চায় ও কেনে। অর্থাৎ,

তাহার মনে এমন ভাব জাগাইতে হইবে যে সে মানুষ হইয়াছে। সে চরকায় সুতা কাটিবে কি শাগপালা রুইবে তাহা শিক্ষক বিবেচনা করিবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের নির্মিত দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা বিদ্যালয়ের আংশিক ব্যয় নির্বাহ হইতে পারিবে। তাঁহার প্রকল্পে ইহাও উদ্দেশ্য ছিল।

Scheduled Caste—তপশীলী জাতি॥ 'অনুন্নত জাতি' এই সংজ্ঞায় উদ্দিষ্ট জাতি বুঝিতে অসুবিধা হইত না। ব্রিটিশরাজ Scheduled Caste বলিয়া এই নূতন জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। 'অনুন্নত' সংজ্ঞা অপেক্ষা 'তপশীলী' আরও অবজ্ঞা-জনক। এই নামে বুঝায়, এই জাতি হিন্দুসমাজের বহির্ভূত। মহাত্মা গান্ধীর "হরিজন" সংজ্ঞা করুণা প্রকাশ করে। বঙ্গদেশে ইহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। মহানির্বাণ তন্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য, এই পাঁচ জাতিতে হিন্দুসমাজ বিভক্ত। 'সামান্য জাতি' Common People ; এই সংজ্ঞা নির্দোষ মনে হয়।

Chief guest of a meeting—সভার প্রধান অতিথি॥ দশ বারো বৎসর হইতে সভায় বক্তৃতা করিবার নিমিত্ত chief guest বা guest-in-chief নামক এক নূতন পদের আবির্ভাব হইয়াছে। সভা করিতে গেলে একজন উদ্‌বোধক চাই। তিনি সভাপতি নহেন। আর একজন Guest চাই, তিনি সভার উদ্দেশ্যের ও কৃতকার্যের প্রশংসা করিবেন। বোধহয় পূর্বকালে মাগধ সূত বা ভাটেরা এই কর্ম করিতেন। তাঁহারা বৃত্তিভোগী ছিলেন! Chief guest বৃত্তিভোগী নহেন ; তিনি ভাটক পান না, তিনি অবৈতনিক বক্তা। তিনি যাহাই হউন, অতিথি নহেন। যতদিন বঙ্গদেশে অতিথিশালা, অতিথিসেবার নিমিত্ত ভূমি আছে, ততদিন সভার প্রধান বক্তা অতিথি হইতে পারেন না। আমি জানি, পূর্ববঙ্গে গৃহে অভ্যাগত, আগন্তুক, নিমন্ত্রিত, কুটুম্ব, বন্ধু ইত্যাদি সকলকেই অতিথি বলা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ইহাদিগকে অতিথি বলিলে ইহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইবেন। Chief guest আমন্ত্রিত।

Pre-Historic—প্রাগৈতিহাসিক॥ পণ্ডিত শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী প্রবাসীতে এই প্রাক্ শব্দের অপপ্রয়োগ দেখাইয়াছিলেন। তিনি আরও কতকগুলি শব্দের ভুল ধরিয়াছিলেন। যেমন, অর্ধবাৎসরিক। কিন্তু কার কথা কে শুনে? ইতিহাসের পূর্ব যুগে, চৈতন্যদেবের পূর্বে, লেখাই ঠিক।

গঠনমূলক কর্ম, বাধ্যতামূলক শিক্ষা, ইত্যাদির 'মূলক' বর্জন না করিলে,

বাংলা পুষ্ট হয় না। গঠনমূলক কর্ম, গঠন কর্ম ভিন্ন আর কি? বাধ্যতামূলক শিক্ষা, Compulsory Education, আমার মতে আবশ্যক শিক্ষা বলা ভাল।

বস্তুতান্ত্রিক, এই নবনির্মিত শব্দটির অর্থ বুঝিতে পারি নাই। রাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্র বুঝি। চরক আয়ুর্বেদতন্ত্র, আর্যভট জ্যোতিষতন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। শাক্ততন্ত্র প্রসিদ্ধ। তন্ত্র শব্দের প্রথম অর্থ তাঁতের টানা। তাঁতে যেমন টানা পড়িয়ান দিয়া বস্ত্র নির্মিত হয়, সেইরূপ যে শাস্ত্রে সূত্রের পরস্পর যোগদ্বারা কোন বিদ্যা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় সে শাস্ত্রের নাম তন্ত্র। তন্ত্র Systematic Knowldege, System না থাকিলে তন্ত্র বলা চলে না। এই মূল অর্থ হইতে তন্ত্র শব্দের বহুবিধ অর্থ আসিয়াছিল। সেখানেও System অন্তর্নিহিত আছে। বস্তুতন্ত্র বলিলে কি অর্থ দাঁড়ায়, বুঝিতে পারি না।

এইরূপ নূতন নূতন অসংখ্য শব্দ রচিত হইতেছে। ইংরেজী শব্দের ভাবার্থ লক্ষ্য রাখিয়া নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হইবে। শব্দান্তররীতি গ্রহণ করিলে বহু শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। ইংরাজীতে অনুবাদ না করিয়া যে নবরচিত শব্দ বুঝিতে পারা যায় সেই শব্দই টিকিবে। যেমন প্রতিক্রিয়াশীল যে অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে শব্দ হইতে সে অর্থ আসে না। নৈতিক জীবন, সাহিত্যিক জীবন, পাঠ্যজীবন, কর্মজীবন, কবিজীবন, জাতীয় জীবন ইত্যাদি এক জীবনে কত অতিদেশ করা যাইবে? অনুকরণদ্বারা কোন ভাষা শক্তিশালী হইতে পারে না।

৪। সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা

ভারত স্বাধীন হইবার পর পশ্চিমবঙ্গরাজ ঘোষণা করিয়াছিলেন, অতঃপর বালাভাষায় রাজকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। কিন্তু এই আদেশ পালন করা সোজা নয়। অসংখ্য রাজকর্মচারী, অসংখ্য পদ, এযাবৎ আমরা ইংরেজীতে শুনিয়া আসিতেছি। এখন হঠাৎ বাংলা শব্দ কোথায় পাওয়া যাইবে? এক পরিভাষাসংসদ আবশ্যক পরিভাষা নির্মাণ করিয়াছেন। তাহার প্রথম স্তবক দেড় বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। অধিকাংশ শব্দ উত্তম হইয়াছে। সংসদের বিদ্যাবত্তা, ধৈর্য ও বিচক্ষণতা প্রশংসনীয়।

এই স্তবকে প্রায় আটশত শব্দ আছে। তন্মধ্যে প্রায় চল্লিশটি ফার্সী ও চল্লিশটি ইংরেজী। অর্থাৎ সাতশতের অধিক শব্দ সংস্কৃত। পরিভাষা যে সংস্কৃত

হইবে, ইহাতে নূতন কিছুই নাই। বাংলা ভাষাই ত সংস্কৃত ভাষার এক প্রাকৃত রূপ। কিন্তু প্রথম চিন্তা আসিতেছে, এত যত্নের পরিভাষা টিকিতে পারিবে কি? দেখিতেছি, ভারতরাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানী অথবা উর্দু-হিন্দী হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়াছে। তখন মন্ত্রী মহাশয় উজীর হইবেন কি আর কিছু হইবেন, গবর্নর থাকিবেন কি সুবেদার হইবেন, কিছুই জানিতে পারিতেছি না। দ্বিতীয়তঃ, সকল প্রদেশে Judge, Magistrate, Commissioner, Superintendent of Police ইত্যাদি অসংখ্য পদ থাকিবে। উচ্চ পদের একই নাম না থাকিলে এক প্রদেশের বার্তা অন্য প্রদেশে বুঝিতে পারা যাইবে না। কথাটা দাঁড়াইতেছে, পদের নামের অথবা অধিকৃতের নামের সমতা কে রক্ষা করিবে? এই ক্ষমতা ভারতরাষ্ট্রের আছে, রাষ্ট্রের অধীন রাজ্যের নাই। সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হইলে পরিভাষার যে আকার হইত, হিন্দুস্থানী বা উর্দু-হিন্দী হইলে সে আকার থাকিবে না। তৃতীয়তঃ, ইংরেজ রাজত্ব গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার প্রভাব ও লক্ষণ আমাদের অন্তরে বাহিরে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। উচ্চ-শিক্ষিতেরা আধা-ইংরেজ, বাংলায় ভাবিতে পারেন না। বাংলায় কিছু লিখিতে হইলে প্রথমে ইংরেজীতে লেখেন। শিক্ষিত মহিলা ইংরেজী শব্দ অন্তঃপুরে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বেশে তাঁহার ভূষণে ইংরেজের প্রভুত্ব প্রকটিত আছে। ফলে কি দাঁড়াইবে, বুঝিতে পারা যাইতেছে না। তথাপি সংসদ-কৃত পরিভাষা সম্বন্ধে দুই পাঁচটা টিপ্পনী করিতেছি।

সপ্তশতাধিক সংস্কৃত শব্দের মধ্যে 'সরকার' শব্দ 'হংসমধ্যে কাকো যথা' হইয়াছে। বহুকাল হইতে 'সরকারী' শুনিয়া আসিতেছি, যেমন, সরকারী রাস্তা, সরকারী উকিল, সরকারী ডাক্তার ইত্যাদি। কিন্তু সরকার যে কে, তাহা অব্যক্ত থাকিত। গ্রামে পাঠশালার গুরুমশায় সরকার, কলিকাতায় বাজার সরকার, শিপ সরকার ইত্যাদি আছে। পরিভাষাসংসদ রোক সরকার, আদায় সরকার, করিয়াছেন। ইহাদের সহিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিরূপ মানাইবে?

অনেক কাল পূর্বে অসহযোগ আন্দোলনের সময় অনেক ভদ্রলোকের ছেলে কারারুদ্ধ হইয়াছিল। কারার এক বিধি ছিল, কর্তাকে দেখিলে কয়েদীকে দাঁড়াইয়া "সরকার সেলাম" বলিতে হইত। ছেলেরা বিদ্রোহী হইয়াছিল। এখানে 'সরকার' অর্থে প্রভু, এবং তাহাই সরকার শব্দের মূল অর্থ। আর এক অর্থ প্রদেশ; যেমন, ভারতের উত্তর সরকার। গ্রামবাসী গবর্মেণ্ট জানে বুঝে,

কিন্তু সরকার অদ্যাপি শুনে নাই। কোন কোন সংবাদপত্রে সরকার শব্দ দেখিয়াছি, এই পরিভাষা প্রকাশের পর হইতে এই ব্যবহার দেখিতেছি। পূর্বে গবর্মেণ্ট (গবর্নমেন্ট নয়) লেখাই রীতি ছিল। সরকার শব্দে আর এক গুরুতর আপত্তি আছে। এই শব্দের সহিত Govern, Governor, Governing body ইত্যাদির কোন সংশ্রব নাই। রাজকার্যে সরকার শব্দ একক থাকিবে, অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইতে পারিবে না।

মহামহিম (His Excellency) গবর্নরকে 'দেশপাল' বলিলে তাঁহাকে অপর নানাবিধ 'পালে'র এক পাল, অর্থাৎ রক্ষক মনে হয়। কোট্টপাল (কোতোয়াল), দিকপাল (দিগার, বর্তমান চৌকিদার), ঘট্টপাল (ঘাটোয়াল) ইত্যাদি শব্দের অর্থে রক্ষক। আর পরিভাষাসংসদ অনেক প্রকার 'পাল' আনিয়াছেন। পরিষৎপাল Speaker of an Assembly, নগরপাল Commisioner of Police, বনপাল Conservator of Forests ইত্যাদি। ভূপাল নৃপাল শব্দে রাজা বুঝি, কিন্তু নামে তাঁহারা একটা ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা নহেন। গবর্নরকে রাজা না বলিলে কাহার মন্ত্রী, কাহার রাজস্ব, রাজপুরুষ, রাজকর্মচারী, রাজভৃত্য, রাজমার্গ, রাজকোষ ইত্যাদি? স্বরাজ, রামরাজ, ব্রিটিশরাজ, রাজনীতি, রাজভাষা ইত্যাদি শব্দ কোথায় পাই? রাজা বলিতে না পারিলে দেশপালক বা রাজ্যপালক বলা যাইতে পারে। কলিকাতা কি পশ্চিম-বঙ্গের রাজধানী নয়? নগর অনেক আছে, কলিকাতাকে শুধু নগর বলিলে চলিবে না। Police Commissioner নগরপাল, না রাজধানীপাল? Government রাজ, স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি। রাজকার্য, রাজকীয় কার্য, Official business, Non-official business লৌকিক কার্য। সরকারী শব্দ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু অন্য অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহার ক্রমশঃ হ্রাস হইবে।

Minister মন্ত্রী, ঠিক। কিন্তু Secretary সচিব না হইয়া 'কর্মসচিব' কেন হইল, তাহা বুঝিতে পারি না। সচিব সহায়, তিনি নিশ্চয় কোন কর্মের নিমিত্ত নিযুক্ত। কেহ অকর্মসচিব থাকিলে অন্যকে কর্মসচিব বলিতে পারা যাইত। বাংলা ভাষায় সাচিব্য শব্দও গ্রামে প্রচলিত আছে। সেখানে অর্থ, ক্রেতার সাহায্য। যেমন, গুড় সাচিব্য হইয়াছে, অর্থাৎ গুড়ের দাম কমিয়াছি।

Home Department—স্বরাষ্ট্র বিভাগ॥ কিরূপে হইল? রাষ্ট্র বলিলে

ভারতরাষ্ট্রই বুঝিতেছি। যেমন রাষ্ট্রভাষা। পশ্চিমবঙ্গ কি একটি রাষ্ট্র, না রাজ্য? Home Minister কি করেন জানি না, বোধ হয় দেশশাসন তাঁহার মুখ্য কর্ম। অতএব Home Department শাসনবিভাগ বলা সঙ্গত।

Engineer—(Civil and Irrigation) বাস্তুকার ॥ ইহা চলিতে পারে না, ভুলও হইয়াছে। বাস্তুশাস্ত্রে সূত্রগ্রাহী Engineer তিনি 'সর্বকর্মবিশারদ, সূত্রদণ্ডপ্রপাতজ্ঞ, মানোত্থানপ্রমাণবিৎ' ইত্যাদি। যাহাতে লোকে বাস করে তাহা বস্তু বা বাস্তু। যে ভূমিখণ্ডে বাস করে তাহা বাস্তু। তদুপরি নির্মিত যাহা কিছু, সে সব বস্তু, Structures। এইরূপে কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে বাস্তু শব্দের অর্থ গৃহ, ক্ষেত্র, আরাম, সেতুবন্ধ, তড়াগ ও আধার করিয়াছেন। এই সকলের নির্মাণের নাম শিল্প ছিল। তদনুসারে শ্রীসুকুমার শিল্পরত্ন নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। যাহারা নির্মাণ করে তাহারা শিল্পী। শিল্পী চতুর্বিধ,—স্থপতি, সূত্রগ্রাহী, তক্ষক ও বর্ধকী। প্রতিমা-নির্মাণ ও চিত্রকলাও শিল্প। শুক্রনীতি-সারেও সেই অর্থ। যথা—"প্রাসাদ প্রতিমারামগৃহবাপ্যাদি সৎকৃতিঃ," যে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে তাহার নাম শিল্পশাস্ত্র। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে, যেমন বঙ্গদেশীয় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে, শিল্পজীবী নয় জন,—কর্মকার, স্বর্ণকার, কাংসকার, চিত্রকার ইত্যাদি। উত্তর-ভারতে, যেমন আলমোড়ায়, শিল্পকার শব্দ প্রচলিত আছে। যেখানে শিল্পকার অর্থে বঙ্গদেশের ছুতার। অতএব Engineer শিল্পবিৎ বা শিল্পজ্ঞ। Engineer নানাপ্রকার আছেন। Mechanical Engineer, Chemical Engineer, Electrical Engineer, ইত্যাদি সকল Engineerই শিল্পবিৎ বা শিল্পজ্ঞ। বাস্তুকার নামে আর এক আপত্তি আছে। বাস্তু শব্দের প্রচলিত অর্থ, গৃহ নির্মাণযোগ্য ভূমি। এই অর্থ অমরকোশে আছে, অন্য অর্থ নাই। বাস্তুকার বলিলে বুঝাইবে, যিনি গৃহনির্মাণযোগ্য ভূমি প্রস্তুত করেন।

এই সঙ্গে Industry শব্দেরও একটা প্রতিশব্দ চাই। Industry কেবল শিল্প নহে। Agricultural Industry, Fishing Industry, Mining Industry প্রভৃতিকে শিল্প বলিতে পারি না। শিল্প বস্তুনির্মাণে। কিন্তু কৃষিকর্মে শিল্প কোথায়? Industry কেবল manufacture নয়, occupation bussiness বা tradeও বুঝায়। সংস্কৃতে অবিকল 'ব্যবসায়'। ব্যবসায় কেবল বাণিজ্য নয়। আমরা Trade অর্থে ব্যবসা বা ব্যবসায় বলি বটে, কিন্তু manufactureও বুঝি। Manufacture অর্থে কলা পদ প্রচলিত ছিল।

প্রকৃতিদত্ত পদার্থের রূপান্তর করণের নাম কলা। শুক্রনীতিসারে কলা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কলা অসংখ্যা। যেমন, কাচকলা glass manufacture, বস্ত্রবয়ন কলা textile Industry ইত্যাদি। Cottage Industry শব্দের সংস্কৃত নাম কৌটকলা। পাণিনিতে কৌট শব্দ আছে। কৌটতক্ষ স্বাধীন ছুতার। কলা art Manufacture মাত্রেই art ; সমুদ্র-জল শুকাইয়া লবণ পৃথক করা একটা art, শিল্প নয়। নৃত্যগীত বাদ্য শিল্প নয়, কলা। Fine art ললিতকলা না বলিয়া কান্তকলা বলিলে ভাল হয়।

Labour—শ্রম॥ এখানে Labour শব্দ দ্বারা নিশ্চয় Labourer বা Labouring class উদ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা সকলেই শ্রম করি, আমরা শ্রমিক, কিন্তু Labourer নই। বাংলায় বেরুনিয়া শব্দ প্রচলিত ছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে, অদ্যাপি বাঁকুড়ায় আছে। ভরণীয় শব্দ হইতে বেরুনিয়া ; wages ভরণ। কাজেই যে ভরণ করে সে ভর্তা, employer ধনিক ও ভৃতিক, দুইটি শব্দ একত্র না পাইলে, ভৃতিক যে labourer, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ভৃতি, ভাতা pension, allowance ইত্যাদি। ভূমি, ভর্তা, ভৃতিক বা ভরণীয়, এই তিন ভ কার পণ্য-উৎপাদনের ত্রিপাদ। ইহাদের সহিত সামাযোগ (organization) পাইলেই পণ্য-উৎপাদন চলিতে থাকে। কিন্তু বাংলায় ভর্তা শব্দ চলিবে না। অতএব ধনিক ও ভৃতিক, অথবা ধনিক ও শ্রমিক, রাখাই ঠিক হইবে। কর্মী worker, কার্মিক workman, কারু Artisan।

Librarian—গ্রন্থাগারিক॥ গ্রন্থপাল বলা ভাল।

৬০।৭০ বৎসর পূর্বে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীবাণু ইত্যাদি নাম চলিতে পারিত। কিন্তু বিজ্ঞান দ্রুত বাড়িতেছে। এখন এ সকল শব্দ আমাদের জ্ঞানের অনুগামী হইতেছে না। রাজাজ্ঞা দ্বারা এইরূপ নাম বাঁধিয়া রাখা কর্তব্য হইবে না। Chemist প্রাণরসায়নী॥ পড়িলে প্রাণরসায়নী বটিকা মনে আসিবে। শ্রুতিরসায়নী ভাষা, নেত্ররসায়নী শোভা বলা অপ্রচলিত নয়। শুধু রসায়ন বলিলে আয়ুর্বেদের রসায়ন মনে হয়। রসায়নবিদ্যা বলিলে রস (পারদ) হইতে কোন রকমে টানিয়া Chemistry বুঝাইতেছে। তেমনই পদার্থবিদ্যা না বলিয়া শুধু পদার্থ বলিলে অন্য অর্থ হইয়া যায়। Physicist অর্থে পদার্থী বলাও চলে না। প্রাণ কি কোন বস্তু যে তাহার রসায়ন থাকিবে ?

Pathology—বিকারতত্ত্ব॥ ঠিক মনে হইতেছে না কিসের বিকার ? বোধহয় রোগতত্ত্ব। Pathogenic রোগজনক।

Professor—অধ্যাপক ॥ অধ্যাপক টোলের। তাঁহারা ধনবানের শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রিত হন। তাঁহাদের এই সামান্য সম্মান ক্ষুণ্ণ করা উচিত হইবে না। এতকাল Professor শব্দে অধ্যাপক চলিতেছিল বটে কিন্তু এক্ষণে রাজানুমোদিত হইয়া উপাধিস্বরূপ হইতেছে। অমুক কলেজের অধ্যাপক বলা যে কথা, অধ্যাপক অমুক বলা সে কথা নয়। Professor অধিশিক্ষক।

Lecturer—উপাধ্যায় ॥ উপাধ্যায় বৃত্তিভোগী ছিলেন, কিন্তু তিনি শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন। মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি ম্লেচ্ছভাষা শিখাইতেন না। lecturer বরং অন্ত্যশিক্ষক, Secondary School teacher মধ্য-শিক্ষক, Primary School teacher আদ্যশিক্ষক।

Post and Telegraph—প্রৈষ ও তার—Postmaster General মহাপ্রৈষাধিকারিক; বড় ডাককর্তা—প্রৈষ শব্দ চলিবে না, ঠিকও হয় নাই। ডাক শব্দ রাখিতেই হইবে। কিন্তু Post office, Post master কই? Post office ডাকঘর; Post master ডাককর্তা; Post master General ডাকের অধিকর্তা।

দেখিতেছি কয়েকটা সামান্য শব্দও পারিভাষিক হইয়াছে। যেমন, Bearer, বাহক, বেহারা ॥ Bearer বাহক বটে, কিন্তু বেয়ারা নয়, বেহারা। Peon পিয়ন, চাপরাসী ॥ সকল পিয়ন চাপরাস রাখে না। যাহারা চাপরাস রাখে, তাহারাও পিয়ন নামে তুষ্ট হয়। Bottle washer বোতল ধাবক; কুপী ধাবক ॥ এই শব্দে সংস্কৃত প্রীতির আতিশয্য হইয়াছে। আমি বলি, বোতল-ধুইয়ে। Telegraphic—তারিক ॥ এখানে বাংলা শব্দে সংস্কৃত ইক প্রত্যয় হইয়াছে। যদি এইরূপ শব্দ চলিতে বাধা না হয়, তবে Constable পাহার-ওয়ালা না হইয়া পাহারী (প্রহরী) হইতে পারে। Gasman গ্যাসী। যেমন, দপ্তরী, কাগজী ইত্যাদি।

Officer অধিকারিক ॥ কিন্তু office কই? বোধহয় এই শব্দের প্রতিশব্দ অধিকার। যদি তাহাই হয়, তবে officer অধিকারী করিলে দোষ কি? কিন্তু অধিকার শব্দ এত অধিক প্রচলিত যে তদ্দারা office বুঝাইবে না। Government office রাজকার্য, রাজকার্যালয়। officer কার্যচারী কর্মচারী শব্দ বহু প্রচলিত। Clerk করণিক না করিয়া করণী করিলে ভাল হয়। সংস্কৃত করণ কায়স্থ = Clerk আছে।

এইরূপে তালিকার শব্দ বিচার করিবার অবসর নাই, স্থানও নাই। সামন্ত

রাজ্যে অনুসন্ধান করিলে অনেক রাজকর্মচারীর নাম পাওয়া যাইবে। উড়িষ্যায় দেখিয়াছি রাজার ব্যবহর্তা, চলিত ভাষায় বেঅর্তা, আছেন। তিনি রাজার Secretary, ছামুকরণ অর্থাৎ সম্মুখকরণ রাজার জমাখরচ লেখেন। গঁতাঘর Treasure house, সংস্কৃতগ্রন্থ ধন শব্দ হইতে গঁতা। বাঁকুড়ায় গঁতাইত রাজার Store keeper, ইত্যাদি।

পরিভাষাসংসদ সংস্কৃত শব্দ বাছিয়া মনে মনে আশা করিয়াছেন, ভারতরাষ্ট্র-ভাষা সংস্কৃত হইবে। কিন্তু বহু প্রচলিত কোন কোন ইংরাজী নাম রাখিতেই হইবে। বিশেষতঃ সে-সকল সংস্কৃত শব্দ হ্রস্ব নয়, সুখোচ্চার্য নয়, সুবোধ্য নয়, সে সকল শব্দ চলিবে না।

'প্রবাসী'। আষাঢ় ১৩৫৬

নূতন মূর্তি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৬১ - ১৯৪১

শ্রীচরণেষু

দাদামহাশয়, এবার কিছুদিন ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। এই সুদূরবিস্তৃত মাঠ, এই অশোকের ছায়ায় বসিয়া, আমাদের সেই কলিকাতা শহরকে একটা মস্ত ইটের খাঁচা বলিয়া মনে হইতেছে। শত সহস্র মানুষকে একটা বড়ো খাঁচায় পুরিয়া কে যেন হাটে বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। স্বভাবের গীত ভুলিয়া সকলেই কিচিকিচি ও খোঁচাখুঁচি করিয়া মারিতেছে। আমি সেই খাঁচা ছাড়িয়া উড়িয়াছি, আমি হাটে বিকাইতে চাহি না।

গাছপালা নহিলে আমি তো বাঁচি না। আমি ষোলো আনা 'ভেজিটেরিয়ান'। আমি কায়মনে উদ্ভিদ সেবন করিয়া থাকি। ইট-কাঠ চুন-সুরকি মৃত্যুভারের মতো আমার উপর চাপিয়া থাকে। হৃদয় পলে পলে মরিতে থাকে। বড়ো বড়ো ইমারতগুলো তাহাদের শক্ত শক্ত কড়ি বরগা মেলিয়া হাঁ করিয়া আমাকে গিলিয়া ফেলে। প্রকাণ্ড কলিকাতাটার কঠিন জঠরের মধ্যে আমি যেন একেবারে হজম হইয়া যাই। কিন্তু এখানে এই গাছ পালার মধ্যে প্রাণের হিল্লোল। হৃদয়ের মধ্যে যেখানে জীবনের সরোবর আছে, প্রকৃতির চারিদিক হইতে সেখানে জীবনের স্রোত আসিয়া মিশিতে থাকে।

বঙ্গদেশ এখান হইতে কত শত দূরে! কিন্তু এখান হইতে বঙ্গভূমির এক নূতন মূর্তি দেখিতে পাইতেছি। যখন বঙ্গদেশের ভিতরে বাস করিতাম, তখন বঙ্গদেশের জন্য বড়ো আশা হইত না। তখন মনে হইত বঙ্গদেশ গোঁফে-তেল গাছে-কাঁঠালের দেশ। যতবড়ো-না-মুখ ততবড়ো-কথার দেশ। পেটে পিলে, কানে কলম ও মাথায় শামলার দেশ। মনে হইত এখানে বিচিগুলাই দেখিতে দেখিতে তেরো হাত হইয়া কাঁকুড়কে অতিক্রম করিয়া উঠে। এখানে পাড়াগেঁয়ে ছেলেরা হাত-পা নাড়িয়া কেবল একটা প্রহসন অভিনয় করিতেছে, এবং মনে করিতেছে, দর্শকেরা শুদ্ধ কেবল আড়ি করিয়া হাসিতেছে, হাসির কোনো যুক্তিসংগত কারণ নাই। কিন্তু আজি এই সহস্র ক্রোশ ব্যবধান হইতে বঙ্গভূমির মুখের চতুর্দিকে এক অপূর্ব জ্যোতির্মণ্ডল দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশ আজ মা হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহার কোলে বঙ্গবাসী নামে এক সুন্দর শিশু— তিনি হিমালয়ের পদপ্রান্তে সাগরের উপকূলে, তাঁহার শ্যামল কানন তাঁহার

রাজ্যে অনুসন্ধান করিলে অনেক রাজকর্মচারীর নাম পাওয়া যাইবে। উড়িষ্যায় দেখিয়াছি রাজার ব্যবহর্তা, চলিত ভাষায় বেঅর্তা, আছেন। তিনি রাজার Secretary, ছামুকরণ অর্থাৎ সম্মুখকরণ রাজার জমাখরচ লেখেন। গঁতাঘর Treasure house, সংস্কৃতগ্রন্থ ধন শব্দ হইতে গঁতা। বাঁকুড়ায় গঁতাইত রাজার Store keeper, ইত্যাদি।

পরিভাষাসংসদ সংস্কৃত শব্দ বাছিয়া মনে মনে আশা করিয়াছেন, ভারতরাষ্ট্র-ভাষা সংস্কৃত হইবে। কিন্তু বহু প্রচলিত কোন কোন ইংরাজী নাম রাখিতেই হইবে। বিশেষতঃ সে-সকল সংস্কৃত শব্দ হ্রস্ব নয়, সুচোচ্চার্য নয়, সুবোধ্য নয়, সে সকল শব্দ চলিবে না।

'প্রবাসী'। আষাঢ় ১৩৫৬

নূতন মূর্তি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৬১ - ১৯৪১

শ্রীচরণেষু

দাদামহাশয়, এবার কিছুদিন ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। এই সুদূরবিস্তৃত মাঠ, এই অশোকের ছায়ায় বসিয়া, আমাদের সেই কলিকাতা শহরকে একটা মস্ত ইটের খাঁচা বলিয়া মনে হইতেছে। শত সহস্র মানুষকে একটা বড়ো খাঁচায় পুরিয়া কে যেন হাটে বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। স্বভাবের গীত ভুলিয়া সকলেই কিচিকিচি ও খোঁচাখুঁচি করিয়া মরিতেছে। আমি সেই খাঁচা ছাড়িয়া উড়িয়াছি, আমি হাটে বিকাইতে চাহি না।

গাছপালা নহিলে আমি তো বাঁচি না। আমি ষোলো আনা 'ভেজিটেরিয়ান'। আমি কায়মনে উদ্ভিদ সেবন করিয়া থাকি। ইট-কাঠ চুন-সুরকি মৃত্যুভারের মতো আমার উপর চাপিয়া থাকে। হৃদয় পলে পলে মরিতে থাকে। বড়ো বড়ো ইমারতগুলো তাহাদের শক্ত শক্ত কড়ি বরগা মেলিয়া হাঁ করিয়া আমাকে গিলিয়া ফেলে। প্রকাণ্ড কলিকাতাটার কঠিন জঠরের মধ্যে আমি যেন একেবারে হজম হইয়া যাই। কিন্তু এখানে এই গাছ-পালার মধ্যে প্রাণের হিল্লোল। হৃদয়ের মধ্যে যেখানে জীবনের সরোবর আছে, প্রকৃতির চারিদিক হইতে সেখানে জীবনের স্রোত আসিয়া মিশিতে থাকে।

বঙ্গদেশ এখান হইতে কত শত দূরে! কিন্তু এখান হইতে বঙ্গভূমির এক নূতন মূর্তি দেখিতে পাইতেছি। যখন বঙ্গদেশের ভিতরে বাস করিতাম, তখন বঙ্গদেশের জন্য বড়ো আশা হইত না। তখন মনে হইত বঙ্গদেশ গোঁফে-তেল গাছে-কাঁঠালের দেশ। যতবড়ো-না-মুখ ততবড়ো-কথার দেশ। পেটে পিলে, কানে কলম ও মাথায় শামলার দেশ। মনে হইত এখানে বিচিগুলাই দেখিতে দেখিতে তেরো হাত হইয়া কাঁকুড়কে অতিক্রম করিয়া উঠে। এখানে পাড়াগেঁয়ে ছেলেরা হাত-পা নাড়িয়া কেবল একটা প্রহসন অভিনয় করিতেছে, এবং মনে করিতেছে, দর্শকেরা শুদ্ধ কেবল আড়ি করিয়া হাসিতেছে, হাসির কোনো যুক্তিসংগত কারণ নাই। কিন্তু আজি এই সহস্র ক্রোশ ব্যবধান হইতে বঙ্গভূমির মুখের চতুর্দিকে এক অপূর্ব জ্যোতির্মণ্ডল দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশ আজ মা হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহার কোলে বঙ্গবাসী নামে এক সুন্দর শিশু— তিনি হিমালয়ের পদপ্রান্তে সাগরের উপকূলে, তাঁহার শ্যামল কানন তাঁহার

পরিপূর্ণ শস্য-ক্ষেত্রের মধ্যে, তাঁহার গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের তীরে, এই শিশুটি কোলে করিয়া লালন করিতেছেন। এই সন্তানের মুখের দিকে মাতা অবনত হইয়া চাহিয়া আছেন, ইহাকে দেখিয়া তাঁহার মুখে আশা ও আনন্দের আভা দীপ্তি পাইয়া উঠিয়াছে। সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিয়া আমি মায়ের মুখের সেই আশার আলোক দেখিতে পাইতেছি। আমি আশ্বাস পাইতেছি এ সন্তান মরিবে না। বঙ্গভূমি এই সন্তানটিকে মানুষ করিয়া ইহাকে একদিন পৃথিবীর কাজে উৎসর্গ করিতে পারিবেন। বঙ্গভূমির কোল হইতে আজ মাঝে মাঝে শিশুর হাসি, শিশুর ক্রন্দন শুনিতেছি— বঙ্গভূমির সহস্র নিকুঞ্জ এতদিন নিস্তব্ধ ছিল, বঙ্গভবনে শিশুর কণ্ঠধ্বনি এতদিন শুনা যায় নাই, এতদিন এই ভাগীরথীর উভয় তীর কেবল শ্মশান বলিয়া মনে হইত। আজ বঙ্গভূমির আনন্দ-উৎসব ভারতবর্ষের চারিদিক হইতে শুনা যাইতেছে। আজ ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে যে নব জাতির জন্ম-সংগীত গান হইতেছে, ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পশ্চিমঘাটগিরির সীমান্তদেশে বসিয়া আমি তাহা শুনিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশের মধ্যে থাকিয়া যাহা কেবলমাত্র অর্থহীন কোলাহল মনে হইত এখানে তাহার এক বৃহৎ অর্থ দেখিতে পাইতেছি। এই দূর হইতে বঙ্গদেশের কেবল বর্তমান নহে, ভবিষ্যৎ— প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলিমাত্র নহে, সুদূর সম্ভাবনাগুলি পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছি। তাই আমার হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আশার সঞ্চার হইতেছে।

মনের আবেগে কথাগুলো কিছু বড়ো হইয়া পড়িল। তোমার আবার বড়ো কথা সয় না। ছোটো কথা সম্বন্ধে তোমার কিঞ্চিৎ গোঁড়ামি আছে— সেটা ভালো নয়। যাই হোক, তোমাকে বক্তৃতা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, আসল কথা কী জানো? এতদিন বঙ্গদেশ শহরতলিতে পড়িয়া ছিল, এখন আমাদিগকে শহর-ভুক্ত করিবার প্রস্তাব আসিয়াছে। ইহা আমি গোপনেসংবাদ পাইয়াছি। এখন আমরা মানব-সমাজ নামক বৃহৎ মিউনিসিপ্যালিটির জন্য ট্যাক্স দিবার অধিকারী হইয়াছি। আমরা পৃথিবীর রাজধানী ভুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছি। আমরা রাজধানীকে কর দিব এবং রাজধানীর কর আদায় করিব।

মানুষের জন্য কাজ না করিলে মানুষের মধ্যে গণ্য হওয়া যায় না। এক দেশবাসীর মধ্যে যেখানে প্রত্যেকেই সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ, সকলের দায় সকলেই নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করে, সেখানেই প্রকৃতরূপে জাতির সৃষ্টি হইয়াছে বলিতে হইবে। আর যাঁহারা স্বজাতিকে অতিক্রম করিয়া মানবসাধারণের

জন্য কাজ করেন তাঁহারা মানবজাতির মধ্যে গণ্য। আমরা স্বজাতি ও মানবজাতির জন্য কাজ করিতে পারিব বলিয়া কি আশ্বাস জন্মিতেছে না? আমাদের মধ্যে এক বৃহৎ ভাবের বন্যা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছে, আমাদিগকে সর্বসাধারণের সহিত একাকার করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেকে বিলাপ করিতেছে 'সমস্ত একাকার হইয়া গেল'; কিন্তু আমার মনে আজ এই বলিয়া আনন্দ হইতেছে যে, আজ সমস্ত 'একাকার' হইবারই উপক্রম হইয়াছে বটে। আমরা যখন বাঙালি হইব তখন একবার 'একাকার' হইবে, আর বাঙালি যখন মানুষ হইবে তখন আরও 'একাকার' হইবে। বিপুল মানবশক্তি বাংলা-সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে, ইহা আমি দূর হইতে দেখিতে পাইতেছি। ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে কে পারে? এ আমাদের সংকীর্ণতা, আমাদের আলস্য ঘুচাইয়া তবে ছাড়িবে। আমাদের মধ্যে বৃহৎ প্রাণসঞ্চার করিয়া সেই প্রাণ পৃথিবীর সহিত যোগ করিয়া দিবে। আমাদিগকে তাহার দূত করিয়া পৃথিবীতে নূতন নূতন সংবাদ প্রেরণ করিবে। আমাদের দ্বারা তাহার কাজ করাইয়া লইয়া তবে নিস্তার। আমার মনে নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, বাঙালিদের একটা কাজ আছেই। আমরা নিতান্ত পৃথিবীর অন্নধ্বংস করিতে আসি নাই। আমাদের লজ্জা একদিন দূর হইবে। ইহা আমরা হৃদয়ের ভিতর হইতে অনুভব করিতেছি।

আমাদের আশ্বাসের কারণও আছে। আমাদের বাঙালির মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘাকাঠার মধ্যেই বাস করিতেন না, তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন তো বাংলা পৃথিবীর এক প্রান্তভাগে ছিল, তখন তো সাম্য ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি কথাগুলোর সৃষ্টি হয় নাই, সকলেই আপন-আপন আহ্নিক তর্পণ ও চণ্ডীমণ্ডপটি লইয়া ছিল—তখন এমন কথা কী করিয়া বাহির হইল—

মার খেয়েছি না হয় আরও খাব।
তাই বলে কি প্রেম দিব না? আয়!

এ কথা ব্যাপ্ত হইল কী করিয়া? সকলের মুখ দিয়া বাহির হইল কী করিয়া? আপন-আপন বাঁশ-বাগানের পার্শ্বস্থ ভদ্রাসনবাটীর মনসা-সিজের বেড়া ডিঙাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে কে আহ্বান করিল এবং সে আহ্বানে সকলে সাড়া দিল কি করিয়া? একদিন তো বাংলাদেশে ইহাও সম্ভব হইয়াছিল। একজন

বাঙালি আসিয়া একদিন বাংলাদেশকে তো পথে বাহির করিয়াছিল। একজন বাঙালি তো একদিন সমস্ত পৃথিবীকে পাগল করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং বাঙালিরা সেই ষড়যন্ত্রে তো যোগ দিয়াছিল। বাংলার সে এক গৌরবের দিন। তখন বাংলা স্বাধীনই থাকুক আর অধীনই থাকুক, মুসলমান নবাবের হাতেই থাকুক আর স্বদেশীয় রাজার হাতেই থাকুক, তাহার পক্ষে সে একই কথা। সে আপন তেজে আপনি তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

আসল কথা, বাংলায় সেই একদিন সমস্ত একাকার হইবার জো হইয়াছিল। তাই কতকগুলো লোক খেপিয়া চৈতন্যকে কলসীর কানা ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। কলসীর কানা ভাসিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে এমনি একাকার হইল যে, জাতি রহিল না, কুল রহিল না, হিন্দু-মুসলমানেও প্রভেদ রহিল না। তখন তো আর্যকুলতিলকেরা জাতিভেদ লইয়া তর্ক তুলে নাই। আমি তো বলি তর্ক করিলেই তর্ক উঠে। বৃহৎ ভাব যখন অগ্রসর হইতে থাকে তখন তর্কবিতর্কে খুঁটিনাটি সমস্তই অচিরাৎ আপন-আপন গর্তের মধ্যে সুড়্‌সুড়্‌ করিয়া প্রবেশ করে। কারণ, মরার বাড়া আর গাল নাই। বৃহৎ ভাব আসিয়া বলে, সুবিধা-অসুবিধার কথা হইতেছে না, আমার জন্য সকলকে মরিতে হইবে। লোকেও তাহার আদেশ শুনিয়া মরিতে বসে। মরিবার সময় খুঁটিনাটি লইয়া তর্ক করে কে বলো।

চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলা দেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এককণ্ঠবিহারী বৈঠকি সুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল? তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গ-হিল্লোল সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগরাগিণী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, এক জনকে ছাড়িয়া সহস্র জনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নূতন কীর্তন উঠিল। যেমন ভাব তেমনি তার কণ্ঠস্বর—অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দনধ্বনি। বিজন কক্ষে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া একটিমাত্র বিরহিণীর বৈঠকি কান্না নয়, প্রেমে আকুল হইয়া নীলাকাশের তলে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্বজগতের ক্রন্দনধ্বনি।

তাই আশা হইতেছে—আর একদিন হয়তো আমরা একই মত্ততায় পাগল হইয়া সহসা একজাতি হইয়া উঠিত পারিব—বৈঠকখানার আসবাব ছাড়িয়া সকলে মিলিয়া রাজপথে বাহির হইতে পারিব, বৈঠকি ধ্রুপদ খেয়াল ছাড়িয়া রাজপথী কীর্তন গাহিতে পারিব। মনে হইতেছে—এখনি বঙ্গদেশের প্রাণের

মধ্যে একটি বৃহৎ কথা প্রবেশ করিয়াছে, একটি আশ্বাসের গান ধ্বনিত হইতেছে, তাই সমস্ত দেশটা মাঝে মাঝে টল্‌মল্ করিয়া উঠিতেছে। এ যখন জাগিয়া উঠিবে তখন আজিকার দিনের এই সকল সংবাদপত্রের মেকি সংগ্রাম, শতসহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তর্কবিতর্ক ঝগড়াঝাঁটি সমস্ত চুলায় যাইবে—আজিকার দিনের বড়ো বড়ো ছোটোলোকদিগের নখে-আঁকা গণ্ডিগুলো কোথায় মিলাইয়া যাইবে! সেই আর-একদিন বাংলা একাকার হইবে।

প্রকৃত স্বাধীনতা ভাবের স্বাধীনতা। বৃহৎ ভাবের দাস হইলেই আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত সুখ ও গৌরব অনুভব করিতে পারি। তখন কেই বা রাজা, কেই বা মন্ত্রী! তখন একটা উঁচু সিংহাসনমাত্র গড়িয়া আমাদের চেয়ে কেহ উঁচু হইতে পারে না। সেই গৌরব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলেই আমাদের সহস্র বৎসরের অপমান দূর হইয়া যাইবে, আমরা সকল বিষয়ে স্বাধীন হইবার যোগ্য হইব।

আমাদের সাহিত্য যদি পৃথিবীর সাহিত্য হয়, আমাদের কথা যদি পৃথিবীর কাজে লাগে, এবং সে সূত্রেও যদি বাংলার অধিবাসীরা পৃথিবীর অধিবাসী হইতে পারে, তাহা হইলেও আমাদের মধ্যে গৌরব জন্মিবে—হীনতা ধূলার মতো আমরা গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিব।

কেবলমাত্র বন্দুক ছুঁড়িতে পারিলেই যে আমরা বড়োলোক হইব তাহা নহে, পৃথিবীর কাজ করিতে পারিলে তবে আমরা বড়োলোক হইব। আমার তো আশা হইতেছে আমাদের মধ্যে এমন-সকল বড়োলোক জন্মিবেন যাঁহারা বঙ্গ-দেশকে পৃথিবীর মানচিত্রের সামিল করিবেন ও এইরূপে পৃথিবীর সীমানা বাড়াইয়া দিবেন।

তুমি নাকি বড়ো চিঠি পড় না, তাই ভয় হইতেছে পাছে এই চিঠি ফেরত দিয়া ইহার সংক্ষেপ মর্ম লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ কর। কিন্তু তুমি পড় আর নাই পড় আমি লিখিয়া আনন্দলাভ করিলাম। এ যেন আমিই আমাকে চিঠি লিখিলাম, এবং পড়িয়া সম্পূর্ণ পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম।

সেবক
শ্রীনবীনকিশোর শর্মণঃ

'চিঠিপত্র'। ১২৯৪ বঙ্গাব্দ
রবীন্দ্ররচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড

বাঙ্গালী

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

১৮৬১ - ১৯৩০

যাহারা বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইতে লজ্জাবোধ করে; তাহারা বলে—বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিলেই বাঙ্গালী হয় না। যাহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকে; তাহারা বলে—বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্তা কহিলেই বাঙ্গালী হয় না। তবে কাহাকে বাঙ্গালী বলিব?

যাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে বাঙ্গালা দেশে বংশানুক্রমে বাস করিয়া আসিতেছে, কদাপি বাঙ্গালার চতুঃসীমার বাহিরে পদার্পণ করে নাই, কেবল তাহারাই কি বাঙ্গালী? সে হিসাবে গারো কুকী এবং সাঁওতালেরাই খাঁটি বাঙ্গালী, বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি সভ্যজাতি বিদেশাগত উপনিবেশ-নিবাসী মাত্র।

জন্মস্থান এবং মাতৃভাষা লইয়া বিচার করিতে হইলে বঙ্গদেশ-প্রসূত বঙ্গ-ভাষাভাষী ব্যক্তিমাত্রকেই এখন বাঙ্গালী বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। কাহার পূর্বপুরুষ কোন্ অজ্ঞাত পুরাকালে বাঙ্গালা দেশে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন সে কথা এখন বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু জন্মস্থান নির্ণয় করিবার পূর্বে কোন্ ভূভাগকে বাঙ্গালা নামে অভিহিত করিব, তদ্বিষয়ে নানা তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে। যেখানে বাঙ্গালা ভাষাই সচরাচর কথোপকথনের ভাষা, তাহাকে বাঙ্গালা দেশ বলিতে হইলে—আসাম উৎকল বিহার ও ছোটনাগপুর পরিত্যাগ করিয়া রাজসাহী বর্ধমান ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের কয়েকটি জেলা লইয়াই বাঙ্গালা দেশের সীমা-নির্দেশ করিতে হইবে। এই সকল জেলার জনসাধারণের সচরাচর কথোপকথনের ভাষা বাঙ্গালা,—এখানে যে অল্পসংখ্যক ভিন্ন-ভাষা-ভাষী অন্য লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা তীর্থের কাক, দুই দিনের প্রবাসী, দেশের ভূমির সহিত তাহাদের কোনরূপ স্থায়ী সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় নাই। ইহারা অদ্যাপি শারীরিক শ্রম বা শিল্পকৌশল বিনিময়ে জীবিকার্জন করিবার জন্য বাঙ্গালা দেশে ইতস্ততঃ

বিচরণ করিতেছে। বাঙ্গালার এই চারিটি বিভাগকে যথাক্রমে উত্তর পশ্চিম পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। উত্তরবাঙ্গালার উত্তরে পার্বত্য জনপদে ভিন্ন ভাষা ভিন্ন জাতি, সুতরাং উত্তরবাঙ্গালার উত্তরাংশ খাঁটি বাঙ্গালা নহে। পশ্চিমবাঙ্গালার পশ্চিমে বিহার ও ছোটনাগপুর, দক্ষিণে উৎকল; সুতরাং পশ্চিমবাঙ্গালার পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ খাঁটি বাঙ্গালা নহে। পূর্ববাঙ্গালার উত্তরে আসাম, পূর্বে ব্রহ্ম রাজ্য; সুতরাং পূর্ববাঙ্গালারও উত্তর এবং পূর্বাঞ্চল খাঁটি বাঙ্গালা নহে। কেবল দক্ষিণবঙ্গই এই হিসাবে খাঁটি বাঙ্গালা। খাঁটি বাঙ্গালা হউক, কিন্তু দক্ষিণবঙ্গ আধুনিক জনপদ—পুরাকালে ইহার অস্তিত্ব পর্যন্ত সমুদ্র-নিহিত ছিল। উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব-বাঙ্গালা যখন শৌর্যে বীর্যে সাহিত্যে শিল্পে সদাচারে ও সভ্যতায় ভারতবর্ষের সর্বত্র সুপরিচিত, দক্ষিণবাঙ্গালা তখনও গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের স্রোতবিধৌত বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গতাড়িত নবোদ্গত বালুকাতট ভিন্ন আর কিছু নহে! সেই বালুকাতটগুলি কালক্রমে মানব-নিবাসের উপযোগী হইয়া প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপোপদ্বীপ ও পরে সুবিস্তৃত সমতল রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। ভূগর্ভ খনন করিবার সময়ে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিবার সময়েও ইহার কিছু কিছু পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস প্রথমে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা উচিত; দক্ষিণবঙ্গের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাল লইয়া ইতিহাসের কাল বিভাগ করা যাইতে পারে। দক্ষিণবঙ্গ অভ্যুদিত হইবার পূর্বকালে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, সে দেশে কাহারা বাস করিত, তাহাদের দ্বারা বাঙ্গালা দেশে কোন্ কোন্ কীর্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল—সে কত দিনের কথা এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তৎকালে আর্যাবর্তে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এই তিনটি প্রাচ্য জনপদের নাম পরিচিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। তন্মধ্যে বঙ্গ বলিতে কেবল পূর্ববাঙ্গালাকেই বুঝাইত; পশ্চিমবাঙ্গালা কলিঙ্গের ও উত্তরবাঙ্গালা মিথিলা বা ত্রিহুতের অভিভুক্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয়।

অঙ্গ রাজ্যের পূর্বে কলিঙ্গ রাজ্যের এক দেশে বনখণ্ডের অভ্যন্তরে আরণ্য গজের প্রাদুর্ভাব ছিল; পশ্চিমবঙ্গের লোকে সেই আরণ্যগজ সুশিক্ষিত করিয়া রণক্ষেত্রে দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থে ইহারাই গঙ্গারাঢ়ীর নামে পরিচিত। তৎকালে উত্তরবঙ্গ মিথিলা বা ত্রিহুতের অন্তর্গত

থাকিয়া কৃষি শিল্প ও সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত ছিল, পূর্ববঙ্গ একপ্রান্তে আসাম ও অপরপ্রান্তে ব্রহ্মরাজ্যের অধিবাসিবর্গের সহিত নিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া আত্মরক্ষা করিত। পুরাকালে পশ্চিম ও পূর্ব-বাঙ্গালায় শৌর্য বীর্য এবং উত্তর-বাঙ্গালায় শিল্প ও সাহিত্যোন্নতির এই অনুমান নিতান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয় না। শিল্প ও সাহিত্যের ক্রমোন্নতির জন্য যে শান্তি ও বিশ্রাম-সুখের প্রয়োজন, পূর্ব ও পশ্চিম-বাঙ্গালায় তাহা তখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম-বাঙ্গালা অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া জলপথে নানা দিগ্দেশে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তদুপলক্ষে সমুদ্রপথে প্রশান্ত-মহাসাগরমধ্যস্থ দ্বীপপুঞ্জে ও চীনরাজ্যে যে ভারতীয় সভ্যতা সুবিস্তৃত হয়, পূর্ব ও পশ্চিম-বাঙ্গালার লোকেরাই তাহার প্রধান নিদান। তাহাদের বীরবাহু স্বদেশরক্ষার্থ নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া স্বদেশের পণ্যভাণ্ডার বিদেশে বহন করিয়া বিদেশের রত্নরাশি স্বদেশে আনয়ন করিত। ইহার ফলে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল নানা দূরদেশেও সুপরিচিত হইয়াছিল।

তৎকালে আর্যাবর্তের সহিত পশ্চিম ও উত্তর-বাঙ্গালার যেরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধ বর্তমান ছিল, পূর্ববাঙ্গালার সেরূপ সংশ্রব লাভের সুযোগ ছিলনা। পূর্ববাঙ্গালা আর্যাবর্তের সুসভ্য আর্য নিবাস হইতে বহুদূরে বিচ্ছিন্নভাবে বিন্যস্ত বলিয়া, তথায় যাহা কিছু সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল, তাহা একরূপ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবেই বিকশিত হইয়াছিল। বোধ হয় এই সকল কারণে তৎকালে বঙ্গ বলিতে কেবল পূর্ববঙ্গকেই বুঝাইত ; পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গ বঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইত না। পূর্ব-বঙ্গের প্রতাপ জলে স্থলে পরিব্যাপ্ত হইবার পর হইতেই কালক্রমে উত্তর ও পশ্চিম -বাঙ্গালাও বঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

বঙ্গ বহুদিনের সভ্য জনপদ। এখানকার ভাষা, এখানকার লিখন-প্রণালী, এখানকার গৃহনির্মাণ-কৌশল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে পৃথক্। উত্তর ও পশ্চিম-বঙ্গের বাঙ্গালা ভাষা যখন সংস্কৃতসংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া ভিন্নরূপধারণ করিতেছিল, পূর্ববঙ্গের ভাষায় তখনও সংস্কৃতের ছায়া সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইত, অদ্যাপি তাহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। লিখন-প্রণালী পুরাতন পালি বা দেবনাগরী বা মৈথিলী আকার পরিত্যাগ করিয়া যে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাও পূর্ববাঙ্গালা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়

পূর্ববঙ্গের গৃহনির্মাণ-কৌশল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের কেন—উত্তর ও পশ্চিম -বাঙ্গালার গৃহনির্মাণ-কৌশল হইতেও বিভিন্ন ; বরং এতদ্বিষয়ে উত্তর ও পশ্চিম -বাঙ্গালা প্রায় একরূপ, কেবল পূর্ববাঙ্গালাই পৃথক। পূর্ববাঙ্গালার শিল্পোন্নতিও পৃথক পথে ধাবিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। যাহারা নিয়ত মাতৃভূমির সহিত সংলগ্ন থাকিয়া তাহার আদর্শের অনুকরণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তাহারা ভিন্নদেশে বাস করিবার সময়েও সে দেশের নূতন দ্রব্যাদির ফললাভ করিতে পারে না। যাহারা জন্মভূমি হইতে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহারা বাধ্য হইয়া নূতন দেশের নূতন দ্রব্যাদির আত্মকার্যে নিয়োগ করিবার জন্য বুদ্ধিকৌশলে নব-শিল্পের অবতারণা করিয়া থাকে। শিল্পালোচনা করিলে পূর্ববঙ্গেরও যে একদা এইরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিবে না। পশ্চিম ও উত্তর-বাঙ্গালা কৃষিজাত দ্রব্যে সুসম্পন্ন বলিয়া তাহারই বিনিময়ে ধনোপার্জন করিবার জন্যই ধাবিত হইত। পশ্চিমবঙ্গের রত্নবণিগ্ বর্গ আমলকি হরিতকির ছড়াছড়ি করিতেন ; তাহারই বিনিময়ে বিদেশ হইতে ধনাহরণ করিতেন। উত্তরবঙ্গের লোকেও কৃষিজাত দ্রব্যের আদান-প্রদান দ্বারা ধনোপার্জনে ব্যস্ত ছিলেন। পূর্ববঙ্গের কৃষিদ্রব্য অধিক হইলেও, কৃষিজাত রূঢ়দ্রব্য শিল্পকৌশলে রূপান্তরিত হইয়া ধনোপার্জনের সহায়তা করিত। যাহারা ধরিত্রীকে যেরূপ অবস্থায় পাইয়াছিল সেইরূপ অবস্থায় রাখিয়া যায়, তাহারা অলস ও মূর্খ। যাহারা ধরিত্রী হইতে ধনাহরণকালে কৃষির সঙ্গে শিল্পের সংযোগ করিয়া লয়, তাহারা কর্মী ও সুপণ্ডিত। এই হিসাবে পূর্ববঙ্গ কর্মঠ ও সুপণ্ডিত বলিয়া সম্মানের পাত্র। অতি পুরাকালে স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেই বাঙ্গালীর ভ্রমণনৈপুণ্য বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখনকার বাঙ্গালী ষ্টীমারে চড়িয়াও পদ্মাপার হইতে আশঙ্কা বোধ করে, তখনকার বাঙ্গালী ভেলায় সমুদ্র পার হইত— তৎকাল-প্রচলিত অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া সাহস সহিষ্ণুতা ও বাহুবলমাত্র সম্বল করিয়া দ্বীপোপদ্বীপে বিচরণ করিত। তখন গৃহে অন্ন সংস্থানের অভাব ছিল না, তথাপি বাঙ্গালী গৃহকোণে জীবনপাত না করিয়া নানা দিগ্দেশে বিচরণ করিত কেন? স্বদেশে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া চর্ব্য চোষ্য উপভোগ করিবার সুবিধা থাকিতে ও তরঙ্গসঙ্কুল সাগর-যাত্রায় অনশন অর্ধাশন বা উপবাস ক্লেশ সহ্য করিবার জন্য লালায়িত হইত কেন?

যাহারা সমুদ্রতীরে বাস করে, তাহারা কৌতূহল ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াই

প্রথমে সমুদ্রবেলায় বিচরণ করে ; পরে কূলে কূলে পরিভ্রমণ ও ক্রমশঃ সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পোতাদি নির্মাণ করিতে থাকে ; অবশেষে সমুদ্রই তাহাদের শৌর্য বীর্য ও ধনাগমের নিদান হইয়া পড়ে—স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেই অধিক অনুরাগ বর্ধিত হইয়া থাকে। নিত্য নূতন দেশে পদার্পণ, নিত্য অপরিজ্ঞাতপূর্ব শোভাসন্দর্শন, নিত্যনবোৎসাহে ধনাহরণ এবং নিত্য নব-কীর্তি সংস্থাপনের লোভে সমুদ্রকূলনিবাসী মানবসমাজ সমুদ্রভ্রমণে সুদক্ষ হইয়া উঠে। পৃথিবীর সমুদ্রকূলনিবাসী সমস্ত জনপদেই ইহার পরিচয় প্রকাশিত রহিয়াছে, বাঙ্গালার সমুদ্রকূলেও ইহার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল ; এখনও তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

দক্ষিণবাঙ্গালা সমুদ্রনিহিত থাকিবার সময়ে মুরশিদাবাদের নিকটবর্তী রাঙ্গামাটি নামক স্থানে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় ; তৎকালে রাঙ্গামাটির পদ ধৌত করিত এবং সিংহলের অর্ণবপোত বাণিজ্য-উপলক্ষে রাঙ্গামাটি পর্যন্ত গতায়াত করিত। এই স্থানে একটি জলযুদ্ধ সংঘটিত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিলুপ্ত কাহিনীর পুনরুদ্ধার সাধিত হইলে এইরূপ আরও কত পুরাতন বন্দরের পরিচয় প্রকাশিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ?

অন্যান্য দেশের ন্যায় বঙ্গদেশের সভ্যতা আধুনিক নহে ; ইহার শৌর্যবীর্যের কথা, ইহার শিল্পগৌরবের কথা, ইহার শিল্পশালাসঞ্জাত বিচিত্র পণ্যদ্রব্যের পরিচয় প্রাচীন গ্রীক ও রোমক রাজ্যেও সুপরিজ্ঞাত ছিল। তৎকালে বাঙ্গালার পশ্চিম ও উত্তরাংশের পুরাতন জনপদের স্থানে স্থানে যে সকল বৌদ্ধ কীর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার নিদর্শনের অভাব নাই ; চৈনিক ভ্রমণকারি-গণও তাহা দর্শন করিবার জন্য এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখনও পূর্বোপ-সাগরের বাণিজ্যপোত বাঙ্গালীর শাসন ও পরিচালন কৌশলের অধীন ছিল। যাহারা তৎকালে বাঙ্গালাদেশে বাস করিত, তাহাদের ভাষা ও সাহিত্য কিরূপ ছিল তাহার নিদর্শন বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। বাঙ্গালাদেশে তাহার নিদর্শন দুর্লভ, কিন্তু সমুদ্রবেষ্টিত যবদ্বীপ বালিদ্বীপ প্রভৃতি পুরাতন জনপদে তাহা অদ্যাপি দেদীপ্যমান।

ভারতবর্ষের মধ্যে আর্যাবর্ত-ই সর্বাপেক্ষা পুরাতন সভ্য জনপদ। আর্যাবর্ত যখন শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতায় সমুন্নত, দাক্ষিণাত্য তখন তালীবন-সমাচ্ছন্ন অজ্ঞানতার ঘনান্ধকারে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন। তাহার পর ক্রমে দাক্ষিণাত্যেও আর্যোপনিবাস সংস্থাপিত হইয়া দুই একটি করিয়া গ্রাম নগর সংস্থাপিত হইতে

আরম্ভ করে। দাক্ষিণাত্য এইরূপে আর্যনিবাসে পরিণত হইবার পর আর্যাবর্তের পূর্বসীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ববাঙ্গালা পর্যন্ত পূর্বে ও কলিঙ্গ পর্যন্ত পূর্ব-দক্ষিণে আর্য প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালে বঙ্গোপকূলে তিনটি সম্পন্ন জনপদ বিদেশে কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল; সংক্ষেপে উড়িষ্যা হইতে আরাকানের উপকূল পর্যন্ত কলিঙ্গের অধিকার ছিল। এই কলিঙ্গ জনপদের অধিবাসিবর্গই প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে আর্যসভ্যতা আর্যভাষা আর্যসাহিত্য ও আর্য-প্রতাপ সুবিস্তৃত করে। যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপের হিন্দু অধিবাসিবর্গের বিশ্বাস, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ এই কলিঙ্গ রাজ্য হইতেই দ্বীপে দ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সে সকল আর্যোপনিবেশের ভাষা ও লিখন-প্রণালীর পরিচয় অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। সে ভাষার নাম ছিল কবিভাষা, লিখন-প্রণালীতে সংস্কৃতের অনুরূপ ক খ গ ঘ ঙ ইত্যাদি সুপরিচিত বর্ণ বিন্যস্ত। কবিভাষার শব্দাবলী বিকৃত উচ্চারণে যৎকিঞ্চিৎ বিকৃত হইলেও বাঙ্গালীর পক্ষে একেবারে দুর্বোধ্য নহে। কবিভাষানিবদ্ধ সাহিত্য ও ভারতবর্ষের সুপরিচিত রামায়ণাদি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সাহিত্যে ও লিখন-প্রণালীতে সংস্কৃতের সম্পূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য ও লিখন-প্রণালীতেও সেই প্রভাব বর্তমান। সুতরাং সেকালের বাঙ্গালা দেশেও যে সংস্কৃতের প্রভাব বর্তমান ছিল, তাহাই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। আর্যাবর্তের সংস্কৃত হিন্দীতে ও এদেশের সংস্কৃত কালক্রমে বাঙ্গালায় রূপান্তরিত হইয়াছে। লিখন-প্রণালীও সংস্কৃতের অক্ষরমালার আদর্শেই গঠিত, কেবল স্থান ও কালের পার্থক্যে ক্রমশঃ পৃথক হইয়া পড়িতেছে।

বিহার ও উৎকলের ন্যায় বাঙ্গালাদেশে পালি অক্ষরের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায় না; পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপালবর্গের শাসনলিপিতেও মৈথেলী অক্ষরের প্রাদুর্ভাব; তাহাই বাঙ্গালার পুরাতন লিপিপ্রণালী ছিল বলিয়া বোধ হয়। সেই লিপিপ্রণালীলিখিত যে সকল অতি পুরাতন তাম্র বা প্রস্তরফলক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত; সচরাচর কথোপকথনের ভাষা সংস্কৃত হইতে কতদূর স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা না জানিলেও, ধর্ম ও রাজ-কার্যে ব্যবহৃত ভাষা যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছিল, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। মধ্যভারতে পালি ভাষাই সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল, পূর্বভারতে তখনও সংস্কৃতের প্রভাব বর্তমান ছিল।

বৌদ্ধাবির্ভাবের পূর্ববর্তী যুগে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার যৎসামান্য সাধারণ আভাস ভিন্ন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হইবার আশা নাই। বৌদ্ধাবির্ভাবের পরবর্তী যুগে বাঙ্গালার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময়ে মগধ রাজ্য গৌরবের উচ্চচূড়া স্পর্শ করিয়াছিল; মগধেশ্বরের নাম ও কীর্তিকাহিনী পৃথিবীর বহু দূরদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এশিয়াখণ্ডের নানাস্থানে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অথবা ধর্মনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দক্ষিণবঙ্গ এই যুগে সমতট নামে পরিচিত, লোকনিবাসে পরিণত ও কৃষিকার্যের উপযোগী হইয়াছিল। পশ্চিম ও পূর্ব-বঙ্গ এই সময়ে সমুদ্রপথে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ধনোপার্জনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। উত্তরবঙ্গ এই সময়ে বহু বৌদ্ধকীর্তিতে সুসজ্জিত হইয়া ভারতবর্ষের সর্বত্র সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধপ্রভাব বর্ধিত হইবার সময়ে উত্তরবঙ্গের পূর্বোত্তরাংশে কামরূপের পুরাতন জনপদ ভিন্ন বাঙ্গালার সকল স্থানই বৌদ্ধাচারে দীক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এইরূপে সৌরাষ্ট্র ও মগধের ন্যায় পুরাতন ধর্মমত পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

ভাষা ও সাহিত্য, ধর্ম ও লোকাচার বৌদ্ধপ্রভাব সময়ে সকল স্থানেই যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল; বাঙ্গালাদেশেও তাহার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশের সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য জনপদের কলহ বিবাদের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময়ে বাঙ্গালা কখন মগধের, কখন কলিঙ্গের, কখন অঙ্গের, কখন বা বঙ্গের অধীন হইয়াছে। আবার বাঙ্গালীরা কখন বাহুবলে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মিথিলা গুর্জর ও কাশ্মীর পর্যন্তও রাজনৈতিক প্রবল প্রতাপ বিস্তৃত করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই সংঘর্ষ উপলক্ষে বাঙ্গালাদেশে প্রতিনিয়ত নানা দেশের নানা জাতির লোক প্রবেশ করিয়াছে। কেহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, কেহ বা সপরিবারে বাঙ্গালায় বাসস্থান স্থাপন করিয়াছে, কেহ আবার বাঙ্গালীর সহিত বৈবাহিকসূত্রে মিলিত হইয়া বাঙ্গালীর দলপুষ্টি করিয়াছে। আজ যাহারা বাঙালী নামে পরিচিত, তাহারা এইরূপে কতবার নবাগত অতিথিগণকে আপনাদিগের দলভুক্ত করিয়া লইয়াছে, তাহার তথ্যানুসন্ধান করা এখন অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

কালক্রমে মোসলমানেরা আসিয়া বাঙ্গালীর দলপুষ্টি করিয়াছেন। এখন হিন্দু এবং মোসলমানেরাই বাঙ্গালার প্রধান অধিবাসী। যাহারা একদা হিন্দু

বলিয়া পরিচিত ছিল, তন্মধ্যে বহু লোকের ইস্লামের ধর্মগ্রহণে মোসলমানের সংখ্যা অল্পদিনের মধ্যেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখন বাঙ্গালার সুখদুঃখের সহিত যাহাদের চিরসংশ্রব তাহারা মিশ্রজাতি—কেহ হিন্দু—কেহ মোসলমান, কেহ বা খৃষ্টীয়ান, কিন্তু সকলেই বাঙ্গালী। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বকালের বাঙ্গালার ইতিহাসে কেবল হিন্দুর কথা, তৎপরবর্তীকাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর কিয়দংশ পর্যন্ত হিন্দু ও মোসলমানের কথা, এবং তাহার পর হইতে হিন্দু মোসলমান ও খৃষ্টীয়ানের কথা। এই ত্রিবিধ যুগেই বাঙ্গালীর অগৌরবের অনেক পরিচয় বাহির করিতে পারা যায়। সেরূপ অগৌরবের কথা কোন্ জাতির ইতিহাসেই বা একেবারে নাই? কিন্তু এই ত্রিবিধ যুগেই বাঙ্গালীর অনেক গৌরবের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই; সুতরাং বাঙ্গালীর কীর্তিকাহিনী সাধারণ্যে সুপরিচিত নহে। বর্তমান যুগে বাঙ্গালী নানা দেশে বাসস্থান নির্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহারা প্রবাসী তাহারা ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আচার ব্যবহারে জড়িত হইয়াও আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া কত ভাবে আত্মপ্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে, এতদিনের পর তাহার কাহিনী সঙ্কলিত হইবার উপায় হইল। প্রবাসী বাঙ্গালী মাতৃভাষার পুষ্টি সাধনের জন্য মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতেছেন, ইহা বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে নিরতিশয় আশা ও আনন্দের সমাচার। বাঙ্গালীর অতীত যাহাই হউক, ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। সে ভবিষ্যৎ সোনার সোপান গঠন করিবার ভার কেবল স্বদেশবাসী বাঙ্গালীর উপরেই ন্যস্ত নহে; প্রবাসী বাঙ্গালীকেও তাহার জন্য শ্রম স্বীকার করিতে হইবে। প্রবাসী এতদিন অর্থোপার্জনে ব্যস্ত ছিলেন, এখন স্বদেশ ও স্বজাতির কথা স্মরণপথে পতিত হইয়াছে। ভগবান এই নবজাত সাধু সংকল্পের সহায় হউন।

'প্রবাসী'। ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ

জামাই-ষষ্ঠী

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

১৮৬১ - ১৯০৭

আগামী শুক্রবার জামাই-ষষ্ঠী। এই জামাই-ষষ্ঠীর কথা মনে হইলে আমার মনে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হয়।

জামাই হওয়া আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। পাতানো সম্পর্কেও কেহ কখন আমাকে জামাই বলিয়া ডাকে নাই। আর এ কাঠামোয় যে জামাই হইব সে আশাও নাই। চুল সাদা হইয়া আসিয়াছে—গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে—দাঁতগুলি হল হল করিয়া নড়িতেছে। দেহটি রসবিহীন পল্লববিরহিত পাদপের ন্যায় কোন প্রকারে তিষ্ঠিয়া আছে। বসন্তের মলয়ানিলে অঙ্গ আর শিহরিয়া উঠে না। বিহগকূজন আর প্রাণকে আলোড়িত করে না। এখন প্রাণে যা মাঝে মাঝে সাড় হয় তাহা কেবল কাঠঠোকরার ঠকঠকানির জ্বালা বই আর কিছু নয়।

এত রসহীন এত শুষ্ক তবুও ষষ্ঠীবাটার ঘটায় মন পুলকিত হইয়া উঠে। ল্যাংড়া বোম্বাই মধুফলে বা বাগবাজারের রসগোল্লায় বা কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়ায় আমার মন যে উথলিয়া উঠে তাহা নহে। আমি ধ্যানবলে মাতৃরূপিণী শ্বশ্রূ-ঠাকরুণদের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারি। ঐ কোমল হৃদয় কি তুরুতুরু দুলিতেছে—কি সকরুণ উদ্বেলনে আলোড়িত হইতেছে। নব জামাতাকে আদর করিবার জন্য শাশুড়ী ঠাকরুণ কতই না আয়োজন করিতেছেন। কত বকাবকি ঝকাঝকি ডাকাডাকি লইয়াই না ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন—কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের প্রীতি সদাই অচলা। এই প্রীতির কথা যখন আমি ভাবি তখন আমার পুলকরোমাঞ্চ হয়। ঐ প্রীতি কি অপত্যস্নেহ? তাহা তো বটেই। কিন্তু উহাতে অন্য ভাবও সংমিশ্রিত আছে। আমার প্রাণপ্রতিম কন্যাকে সৎকুলে প্রদান করিয়াছি; আমার দুহিতা সেই কুলীন পরিবারের অলংকাররূপে গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিবে। অবশেষে জননীরূপে সেই কুল রক্ষা করিবে। ইহা কি কম গর্বের কথা। এইরূপে ধর্মসংগত সম্প্রদানের কথা মনে করিলে স্বাভাবিক ক্ষুদ্র স্নেহ বড়ই এক উদারভাব ধারণ করে। সেই উদার ভাব জামাই-ষষ্ঠীর দিন বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়।

এই শুভদিনে কুলশীলসম্পন্ন সৎপাত্র আসিবেন। তিনি আত্মজার বর। আজ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে। কত আমোদ। শ্যালিকারা ঠাট্টাতামাসা করিয়া জামাতার প্রাণকে মধুমাখা করিয়া তুলিবে, আর ক্রীড়াময়ী লতারূপিণী নববধূ আজ কি এক অজানিত আনন্দে বিবশা হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই আনন্দের উচ্ছ্বাসের মধ্যে শ্বশ্রূঠাকরুণ উপবাসী থাকিবেন। তিনি ষষ্ঠীপূজা করিবেন, এ আনন্দের ভিতর আবার উপবাস কেন— পূজা কেন— বিধিনিষেধের বাধাবাধি কেন। ষষ্ঠীপূজা ও নারায়ণের উপাসনা না হইলে আমোদ-প্রমোদ সমস্তই বৃথা হইবে।

হিন্দুর বিবাহ এক যজ্ঞ। সংসাররক্ষার মহাব্রতে আমার ভোগসুখকে বলিদান দিতে হইবে। ইহাই বিবাহের উদ্দেশ্য। তাই হিন্দুর গৃহে উদ্বেলযৌবন দম্পতির চাপল্যকে ধর্মবিধির দ্বারা সংযত করা হয়। দাম্পত্যের মধুর ভাববিলাস যাহাতে মঙ্গলময় জনকত্বের গাম্ভীর্যে পরিণত হয় তাহারই জন্য এই উপবাস— এই ষষ্ঠীপূজা। কন্যাসম্প্রদান যাহাতে সফল হয় তাহারই জন্য এই উৎসবের দিনে শ্বশুর শাশুড়ী নবদম্পতি শ্যালক-শ্যালিকা আত্মীয় কুটুম্বিনী সকলে ষষ্ঠীমাতার শরণাপন্ন হন ও তাঁহার প্রসাদলাভ করিয়া উৎসবের আনন্দ ভোগ করেন। বিবাহযজ্ঞে যে লোকরক্ষারূপ মঙ্গলকামনা করা হইয়াছিল তাহারই সিদ্ধির জন্য সুখময় ষষ্ঠীবাটা অনুষ্ঠিত হয়।

শাশুড়ী ঠাকরুণ অত ভাবনা চিন্তা করিয়া তাঁহার ষষ্ঠীবাটার আয়োজন করেন না বটে, কিন্তু তিনি হিন্দুরমণী—তাঁহার ঐ মঙ্গল-সংস্কার অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। স্বভাবতই ঐ উৎসবের দিনে তাঁহার এক অভূতপূর্ব উদারপ্রীতির সঞ্চার হয়। সেই প্রীতি যে বুঝিতে পারে সেই জানে যে হিন্দুর আদর্শ কি উচ্চ।

ষষ্ঠীবাটার মত অনুষ্ঠান আর কোথাও দেখা যায় না। হে সংস্কারক— একবার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে হিন্দুর আচার-ব্যবহারগুলি দেখ। অনেক আবর্জনা আছে সত্য—আর আবর্জনা কোথায় বা নাই—কিন্তু দেখিবে হিন্দু আসলে খাঁটি সোনা।

বাংলার উন্নতি চিন্তা

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

১৮৬১ - ১৯৪৪

আপনারা আজ আমাকে আপনাদের প্রদর্শনীর দারোদ্ঘাটন করতে আহ্বান করেছেন বলে আমি আপনাদের ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারছি না। আমি একজন ক্ষীণজীবী ভগ্নস্বাস্থ্য, তা আমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন; তবে বিধাতার কৃপায় কোনরূপে জীবনধারণ ক'রে আছি। এইরূপ ভগ্নশরীর সত্ত্বেও যে কোন কাজে আহূত হই তা উপেক্ষা করতে পারি না। আমার বাঁকুড়া আগমন শিক্ষার্থীভাবে, উপদেষ্টা ভাবে নয়—আজ আমি আপনাদের কাছ থেকে অনেক জিনিস শেখবার সুযোগ পেয়েছি। প্রথমেই আপনাদেব ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। খুলনা জেলায় আমার বাড়ী। অনেকদিন আগে খুলনায় তখনকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হার্ট খুলনার প্রদর্শনীর জন্য আমাকে আহ্বান্ করেছিলেন। কিন্তু আমরা বাঙ্গালী ম্যাজিস্ট্রেটকে সুন্দরবনের Royal Bengal Tiger কেঁদো বাঘের চেয়েও বেশী ভয় পাই, আমাদের কাছে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ বাঘের অপেক্ষাও ভীষণ বলে' মনে হয়,—আমরা বাঘের সামনে যেতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে যেতে প্রস্তুত নই। জেলার কর্মকর্তা মানে ধরপাকড় নয়, জেলে দেওয়া নয়, জরিমানা নয়, তাঁর ইচ্ছায় একটা জেলার হাওয়া বদলে যেতে পারে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন হচ্ছে কাউন্সিল বা মন্ত্রী-পরিষৎ হচ্ছে, কিন্তু কর্মকর্তা যদি ভাল না হন তবে সবই পণ্ডশ্রম মাত্র। কিন্তু এখানের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তার কার্য সত্যই সুন্দর। ইনিও গভর্ণমেণ্ট চাকুরে, এসব না করলেই পারতেন, সরকারের চাকরী সুখের—বসে' থাক, প্রমোশন বা উন্নতি ধাপে ধাপে আসবেই, সময়ক্রম-মোতাবেক (Time Scale) তাঁদের পদ (Grade) বাড়বেই, এক কথায় They are simply kicked upstairs—লাথিয়ে তাঁদের উঁচিয়ে দেওয়া হবে! কেবল মাঝে মাঝে বড় সাহবকে সেলাম দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু এখানে দত্ত সাহেব যা করেছেন তা আদর্শ—এই রকম ত চাই-ই। তার কর্মপ্রণালী অতি প্রশংসনীয়। আমি রাজনীতি চর্চা করছি না, কোন দলের হয়েই আমি কিছু বলছি না—আমি ঠিক বলতে পারছি না দত্ত সাহেব

দেশের প্রকৃত হিতসাধন করছেন কিনা ; কেননা তাঁর জিম্মায় যে জেলা দেওয়া হয়েছে তার মঙ্গল-কামনার জন্য একাগ্র চেষ্টায় তিনি নন্-কোঅপারেশনের বিষদাঁত ভেঙে দিচ্ছেন। সকল জেলার কর্তা এরকম হলে অসহযোগ উড়ে যাবে।

এখন কথা হচ্ছে বাঁকুড়াতে ছুভিক্ষ হয় কেন? এখানকার ছুভিক্ষে ও খুলনা-যশোহরের ছুভিক্ষে অনেক প্রভেদ আছে। খুলনার ছুভিক্ষ এখনও শেষ হয় নি, এ বছরেও অজন্মা, কি হবে, লোকগুলো কি করে বাঁচবে জানি না। তবে খুলনার ছুভিক্ষ সমগ্র-জেলা-ব্যাপী হয় না—যতদূর নদীর নোনা জল যায়, ততদূর অজন্মা হয় ; তার ফলেই ছুভিক্ষ। আগে নদীতে মিঠা জল এসে চাষ-আবাদের স্থবিধা করে' দিত। কিন্তু এখন সে-সব নদীতে চড়া পড়ে' গেছে, সে-সব নদী কেটে জল আনা এখন বহুব্যয়সাধ্য। তাই বলছিলাম খুলনাকে নদীর উপর নির্ভর করতে হয় বলেই তার ছুভিক্ষ দৈবায়ত্ত। কিন্তু বাঁকুড়ার ছুভিক্ষ সহজে নিবারণীয়।

এই বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর দেড়-শ বছর আগে গৌরবের স্থান ছিল—মহারাষ্ট্র-দুর্ধর্ষ বীর ভাস্কর পণ্ডিত বিষ্ণুপুর রাজাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন—সে-সব গৌরব আজ কোথায়? এক-শ দেড়-শ বছর আগে আপনাদের বিষ্ণুপুর কত সমৃদ্ধিশালী ছিল—পলাশীর যুদ্ধের সময় বিষ্ণুপুরের কি গৌরবই ছিল! আর আজ বাঁকুড়া বাংলার মধ্যে দরিদ্রতম নিঃস্বতম জেলা। দশ বৎসরে এগার লক্ষ লোকের মধ্যে এক লক্ষ লোক কমে গিয়েছে—এ যেন মরণ-অভিশপ্ত দেশ। কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন—আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন—যে, আমরা মরণোন্মুখ জাতি, লুপ্ত হবার পথের পথিক। বাঙালী যে কেন মরণাপন্ন জাতি, তার কারণ বাংলার সংস্থান, জল-হাওয়া, ব্যবসাবাণিজ্য, অর্থসমস্যা প্রভৃতি আলোচনা ক'রে আমাদের নির্ণয় করতে হবে।

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর পূর্বে যে এত বেশী সমৃদ্ধিশালী ছিল তার কারণ কি?—প্রধান কারণ এখানকার ক্ষেতে জল-সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত। যাঁরা ক্ষেতে জল-সেচনের ব্যাপারটি বোঝেন বা জানেন তাঁরা বলেন হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের সময়ে জল-সেচনের নিখুঁত ব্যবস্থা ছিল।—তখন এ জেলায় ত্রিশ চল্লিশ হাজার বাঁধ দীঘি প্রভৃতি ছিল ; এখন সে সব দীঘি পুকুর সব শুকিয়ে গেছে, অনেক মজে গিয়ে ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আজ যদি এইসব দীঘি বাঁধ ভাল অবস্থায় থাকতো, তাহলে এখানকার ছুভিক্ষ অনেক নিবারণ হতো।—

এখন পুরাতন মজা বোজা পুকুর বাঁধ দীঘি আবার ঝালিয়ে কাটিয়ে সজল করে তুলতে হবে। সেই সমস্ত দীঘির পুনরুদ্ধার করতে হবে। বাঁকুড়া এখন দুর্ভিক্ষের লীলাভূমি হয়েছে। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হয়; বাঁকুড়াতেও তার ভীষণ প্রকোপ দেখা গিয়েছিল। ১৮৭৪ সালে এখানে আবার দুর্ভিক্ষ হয়। তারপর ১৮৮৫ ও ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষের কথা আমরা সকলেই জানি। ১৯১৪-১৫ সালের উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষে যে ভীষণ অবস্থা হয়েছিল তা এখনও আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। আবার ১৯১৯ সালেও দুর্ভিক্ষ হয়েছে।

ইচ্ছা করলেই আমরা এ দুর্ভিক্ষ বন্ধ করতে পারি; এই সব বাঁধ দীঘি পুকুর কাটিয়ে আবার জলের সুবন্দোবস্ত করতে পারি। বাঁধ দিয়ে জল ধরে রেখে সেই জল যেদিকে ইচ্ছে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগাতে পারা যায়। এই সমস্ত বাঁধ বাঁধার জন্য সমবেত চেষ্টা চাই। দুই-পাঁচটা গ্রামের লোক মিলে সেই সেই গ্রামের জল সরবরাহের জন্য বাঁধ তৈয়ারী করতে হবে। সকলের স্বার্থ সেই বাঁধে থাকবে। এই সমস্ত কাজের জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক চাই। খুলনায় প্রথম আমাদের বাড়ীতে একটা ব্যাঙ্ক হয়। যামিনীবাবু অধ্যক্ষ হয়ে তার কাজ আরম্ভ করেন। আমার মধ্যম ভ্রাতা রায়সাহেব নলিনীকান্ত তাঁর সহায়তা করেন। এখন সেই ব্যাঙ্কের অধীনে প্রায় এক-শটা ছোট ছোট ব্যাঙ্ক হয়েছে—এখন ক্রমেই এর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এখানে যাতে এরকম ব্যাঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে তার চেষ্টা করা উচিত।

খুব সুখের বিষয়, আপনাদের এখানে সমবায়-প্রথায় দুই চারিটি বাঁধ হয়েছে ও কাজও ভাল চলেছে। উপকার বুঝতে পেরে প্রজারা আনন্দের সহিত টাকা দিতে রাজী হয়েছে। শালবাঁধের যে বাঁধ তৈরী হচ্ছে তাতে সাতাশখানা গ্রামের আট হাজার বিঘা জমি উদ্ধার হবে। আমাদের একটা দোষ যে আমরা সব কাজেই গভর্ণমেণ্টের দিকে চেয়ে থাকি। অবশ্য গভর্ণমেণ্ট আমাদের কাছ থেকে যখন খাজনা আদায় করেন তখন আমাদের সমস্ত অভাব পূরণ করতে তাঁরা বাধ্য ন্যায়তঃ ধর্মতঃ। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যদি কিছু না করে দেয়, তবে কি আমরা চিরকাল শিশুর মত অসহায় থাকবো, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখবো না? আমরা তবে কি করে আত্মনির্ভরতা শিখবো?—আমরা সবাই যেন এক-একটি ঝিনুকে-দুধ-খাওয়া খোকা!

আমার মনে হয় বাংলা দেশের বুদ্ধি ও বল পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে। মল্লভূমি বীরভূম, আজ মল্লশূন্য বীরশূন্য। আজ বাঁকুড়ার লোক সাঁওতাল

বলুন—বাউরী বলুন—ম্যালেরিয়াগ্রস্থ ও কঙ্কালসার। খাদ্যের অভাবই ম্যালেরিয়ার কারণ। ডাক্তার বেণ্টলী বলেন—malaria is a hunger disease—ম্যালেরিয়া ক্ষুধার ব্যাধি।

এখানে আসবার আমার আর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে—চরকা ও তাঁতের প্রচলন করাই আমার এখন অভিপ্রায়। এখানে যে রকম কার্পাস চাষ আছে আর শহরেও অনেক চরকা চলতে দেখেছি, তাতে এখানে অল্প চেষ্টাতেই কার্পাস চাষ বাড়াতে পারা যায়। বাঁকুড়ায় দশ লক্ষ লোকের অন্ততঃ এক কোটী টাকার কাপড় লাগে ; ঐ টাকা যদি বাঁকুড়াতেই থাকে তা হলে কি হয় ভাবুন দেখি।

আমি একজন ব্যবসাদার, ছয় সাতটি ব্যবসায়ে আমি লিপ্ত আছি ; তার মূলধন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। আমি ব্যবসায়ীভাবেই কথা বলছি। আজ যদি বাঁকুড়ায় প্রত্যেক ঘরে দশ-পনেরটা রাম-কার্পাসের গাছ থাকে, আর দিনে প্রত্যেক ঘরে চার-পাঁচ ঘণ্টা ক'রে চরকা চালান যায়, তাহলে আমরা আমাদের বস্ত্রসমস্যার সমাধান করতে পারি। মেয়েরা চরকা না ধরলে চলবে না। ছেলেরা প্রথমে চরকা কেটে মেয়েদের লজ্জা দেবে, মেয়েদের শেখাবে। আমি এই যে কাপড় পরে আছি, এ আমার গ্রামবাসীর দান—দেশের কার্পাসে দেশের মেয়েদের হাতে ঘরের চরকায় কাটা সূতায় দেশের তাঁতীর দেশী তাঁতে তৈয়ারী। কাপড়খানা খুব মোটা সত্যি, কিন্তু এ কাপড় আমি মাথায় করে রেখেছি— রজনীকান্তের কথায় 'এ যে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়—মাথায় তুলে নে রে ভাই'। আমার দেশবাসী এই কাপড়ের পরিবর্তে যদি কাপড়ের ওজনে সোনা দিতেন তাতে আমি তৃপ্ত হতুম না। মোটা কাপড়ে দোষ কি? আমরা যতই সভ্য হচ্ছি ততই অধঃপাতে যাচ্ছি। আমার এই কথা শুনে মনে করবেন না যে আমি একেবারে পশ্চিমের সম্পর্কই বর্জন করতে চাচ্ছি। ভারত যদি 'নিশ্বাস রুধে দুচক্ষু মুদে' পশ্চিমের দিকে পিছন ফিরে বসে ও পশ্চিমের জ্ঞানবিদ্যা-শিক্ষাচর্চার সম্পর্ক ত্যাগ করে, তবে ভারতের পক্ষে সে দুর্দিন হবে ; কিন্তু কচের ন্যায় বিদ্যা অর্জন করতে হবে শুক্রাচার্যের কাছে, স্বদেশে স্বদেশীর হিতসাধনের জন্যেই। দৈনিক পাঁচ ছয় ঘণ্টা চরকা চালালে অন্নবস্ত্র দুয়েরই সংস্থান হয়। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ইত্যাদি অনেকে এই চরকা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। তিনি লিখেছেন যে একজন বৃদ্ধা একদিনে তিন ছটাক পর্যন্ত সূতা কেটে দিয়েছেন। তিনি এত সূতা কাটছেন যে তার লাভে মহাজনের কিছু

কিছু ঋণও শোধ হচ্ছে। আমাদের দেশের দুর্ভিক্ষ হয় অর্থের অভাবে, খাদ্যের অভাবে নয়। যদি চরকার প্রচলন হয় তবে একটা লোক সাত আট পয়সা দিন উপায় করতে পারে, আর চার পয়সায় আধসের চালে একটা লোকের পেট ভরে যেতে পারে। বাঙ্গালায় সাড়ে চার কোটি লোকের বাস। তার মধ্যে সাড়ে তিন কোটি লোক ছেড়ে দিয়ে এক কোটি চরকা চালাবে; এই যদি আমরা ধরি, আর প্রত্যেক দিনে দুই পয়সা আয় করে, তাহলে বৎসরে আমরা বারো কোটি টাকা বাংলায় রাখতে পারি। তাই যদি আমরা পারি, তাহলে আমাদের ভাবনা কি? এখন আর কেবল ম্যাঞ্চেস্টার লাঙ্কাশায়ার নয়,—জাপান বোম্বাই আমাদের ধনে ধনী হচ্ছে। নিজেরা খেতে পাই না, যা কিছু আছে তাও পরকে তুলে দিচ্ছি। আপনারা বলতে পারেন—বোম্বাই তো আমাদের নিজের দেশের লোক। আমি এরকম স্বদেশী হতে চাই না; বাংলা না খেতে পেয়ে বোম্বাইকে ধনী করবে। যদিও বোম্বাই দুর্ভিক্ষের সময় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে; তবু আমি এ সহ্য করব না যে বাংলার অর্থ শোষণ করে' বোম্বাই ধন সঞ্চয় করবে, ফিরে মুষ্টিভিক্ষা দেবার জন্যে। মিলের কাপড়ের দাম তিন চার গুণ বেড়েছে। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগে যখন মিল ছিল না, তখন কি আমরা উলঙ্গ দিগম্বর হয়েছিলুম, তখন কি আমাদের কাপড় ছিল না? আজ যদি আমাদের ঘরে ঘরে চরকা থাকতো, আমি জোর করে বলতে পারি, তাহলে একটি লোকও না খেতে পেয়ে মারা পড়তো না। তাই আমি নিবেদন করি—সকলেই দৃঢ় পণ করুন যাতে তুলার চাষ বাড়ে ও চরকা প্রচলন হয়। এখানে এমন কে আছেন যাঁর বাড়ীতে দশ-পনেরটা কার্পাস গাছ লাগাবার জমি নেই? আগে আমি চরকার পক্ষপাতী ছিলুম না; কিন্তু এখন আমি বুঝতে পেরেছি এর উপকারিতা; চরকার সম্বন্ধে ছোট একটা পুস্তিকা লিখেছি। তাই এত জোর করে বলছি বাংলার অন্য সব জেলা আপনাদের কাছ থেকে শিক্ষা করুক, কেমন করে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তুলা তুলে চরকা চালিয়ে তাঁত বুনে নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে ধনী হতে হয় ও দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য রাক্ষসকে বধ করতে হয়।

আর একটা বিশেষ কথা। কৃষির উন্নতি চাই। জমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমেই কমে যাচ্ছে; সারের প্রচলন করতেই হবে। গোবরসার আমাদের প্রধান সার। কিন্তু এই সারটা আমরা যেভাবে রাখি ও ব্যবহার করি, তাতে সেটা অসার হয়ে যায়। একটা গর্ত করে গর্তের উপরে একটা ছাউনি

দিয়ে যদি গোবরটা রাখা যায় তাহলে আমরা সারের ফল পাই। এ ছাড়া ধনচে সবুজসার আমরা সহজেই প্রচলন করতে পারি—এতে জমির উর্বরতা যথেষ্ট বাড়ে।

তারপর নানারকম নূতন ফসলের প্রচলন করতে হবে। ফরিদপুরে যখন গিছ্‌লুম তখন কৃষি-বিভাগের দেবেন্দ্রবাবু আমাকে একরকম আক দেখিয়েছিলেন তার নাম টানা আক—শিয়ালে শূয়োরে এ আক খায় না, ফলন অনেক বেশী। চিনির বাজার যেরকম, তাতে আকের চাষ বাড়াতেই হবে ; আর টানা আকের চাষে দেশে যথেষ্ট ধনাগম হবে। আলু আর-একটি লাভবান ফসল। যত্ন করে সার সেঁচ দিয়ে আলুর চাষ করলে এক এক বিঘা থেকে এক-শ মন পর্যন্ত আলু পাওয়া যেতে পারে। চীনাবাদামের চাষ ডাঙ্গাজমিতে বেশ হয়। এ ছাড়া খেজুরগাছ লাগিয়ে গুড় তৈরী করে, কুল পলাশ গাছে গালার চাষ করে, কত না অবস্থার উন্নতি করতে পারা যায়। এসব সহজ কাজ, অল্প চেষ্টাতেই হয়। কিন্তু আমরা করব না—কী ভীষণ কুঁড়ে আমরা তাই ভাবি। গলিভারের ভ্রমণকাহিনীতে পড়েছিলুম যিনি একটি ঘাসের স্থানে দুইটি ঘাস জন্মাতে পারেন তিনি দেশের বড় বড় রাজনীতিকের চেয়ে বেশী কাজ করেন। আগে অন্ন বস্ত্র, তারপর স্বরাজ। দেবেন্দ্রবাবু এখানে রয়েছেন। তিনি উদ্যমশীল উৎসাহী। আপনারা তাঁর ও অন্য অন্য কৃষি-বিভাগের কর্মচারীদের পরামর্শ নিয়ে কৃষির উন্নতি করুন—কৃষিকাজই দেশের প্রকৃত কাজ—চাষকে আর চাষার কাজ বলে ঘৃণা করলে চলবে না—ফিরে কর চাষ আর ফিরে ধর চরকা—এখন এই হচ্ছে আমার মন্ত্র।

এই বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে তসর রেশম ও সূতার কাপড় যথেষ্ট হতো ; পিতল কাঁসার জিনিস, গালা প্রভৃতির জন্য এই জেলা প্রসিদ্ধ ছিল। ১৯০৩-৪ সালে কেবল সোনামুখী থেকেই পাঁচ হাজার মন গালা কলকাতায় রপ্তানী হয়েছিল। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের হলোওয়েলের লেখা থেকে দেখা যায় যে এই বিষ্ণুপুর থেকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত গালা সরবরাহ হতো। এখন তার অবস্থা কি হয়েছে ভাবলে কান্না পায়। এসব শিল্পের পুনরুদ্ধার করুন।

আমাদের দেশের কৃষকের মাসিক আয় গড়ে আড়াই টাকা—রমেশ দত্ত ঠিক করেছিলেন দুই টাকা, লর্ড কর্জন অনেক হিসাবপত্র দেখিয়ে ভারতবাসীকে ধনী প্রতিপন্ন করবার জন্য বলেছিলেন দুই টাকা নয়— আড়াই টাকা! সুতরাং কৃষিকাজের উন্নতি করে, চরকায় সূতো কেটে শিল্পের পুনরুদ্ধার করে আমরা যদি

দৈনিক চার-পাঁচ পয়সাও আয় বাড়াতে পারি তাহলে কত না কাজ হয়। দেশের আয় দ্বিগুণ হয়।

আমরা ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ছি। এইসব রোগের একটা কারণ হচ্ছে আমাদের বাসস্থান বাড়ীটাকে আমরা সিন্দুকের মত করে রাখি, আলো বাতাস আসবার পথ রাখি না—রুদ্ধ বায়ু, রুদ্ধ জল, রোগ শোক মৃত্যুর নিদান। আমি একজন রাসায়নিক; অক্সিজেন গ্যাসের প্রতি আমার মমতা ও বিশ্বাস আছে—তাই বলছি একটু বাতাস-আলোর পথ রাখতে হবে। পুকুরগুলোকে আমরা কি করে ব্যবহার করি? যেন আঁস্তাকুড়! পুকুর-গুলোকে মলমূত্র থেকে নিরাপদ করতে হবে। এইমাত্র আমি এখানকার কলেজে গিয়েছিলুম—কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ টম্‌সন্ এখানে রয়েছেন—আমি সেখানে কি দেখলুম? কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পরিচ্ছন্নতা দেবত্বের সোপান—ওঁরাই বোঝেন, আর সেইভাবে কাজ করেন। আর আমরা হিন্দুজাতি কেবল মুখে বলে বেড়াই আমরা পবিত্র, আমরা শুদ্ধ জাতি; কাজে আমরা ম্লেচ্ছেরও অধম। আমি বিপ্লবপন্থী বিদ্রোহী—পলিটিক্‌সে নয়—সামাজিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে। যুবকদের তাই বলছি সামাজিক উন্নতি করতে হবে। আমরা আধ্যাত্মিক জাতি বলে গর্ব করি; আর ওদের বলি বিষয়াসক্ত বস্তুতন্ত্র। যথা—বিলেত থেকে টাকা এনে এখানে কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছে বিদেশী লোক; আর আমরা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত লোকদের স্পর্শ করি না, এমনকি তাদের ছায়াও মাড়াই না—আমাদের তাহলে পাপ হয়—আমরা বলি, ওরা পাপ করেছিল কর্মফল ভোগ করছে, আমরা কি করবো। মায়ের কাজ সোজা নয়, বাহবা নেওয়া উদ্দেশ্য নয়, সেবাধর্মে দীক্ষিত হতে হবে, সেই হচ্ছে আসল দেশ সেবা। এর চেয়ে মহত্তর কাজ আর কিছুই নেই।

বাঁকুড়ার দুর্ভাগ্য যে এখানকার বেশীর ভাগ জমিদারই প্রবাসী। নিজের জমিদারীতে তারা বাস তো করেনই না, পদার্পণও কখনো করেন কিনা সন্দেহ। তাঁরা এখান থেকে যতদূর সম্ভব আদায় করে নিচ্ছেন, কিন্তু এখানকার মঙ্গলের কাজ কিছুই করেন না। এই সমস্ত প্রবাসী জমিদারদের ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়; জমিদারদের আমি জোর গলায় জানাতে চাই যে যদি তাঁরা আমার বন্ধু মহারাজাধিরাজ বর্ধমানাধিপতির মতন নিজের জমিদারী থেকে গ্রহণ করেন প্রচুর ও জমিদারীর ও প্রজাদের উন্নতির জন্য অভাব মোচনের জন্য ব্যয় করেন সামান্য, তাহলে প্রজাদের মধ্যে বল্‌শেভিক মত প্রচার করবার

বিরুদ্ধে বলবার মুখ কোথায়? জমিদারেরা প্রজার কষ্টার্জিত অর্থ শোষণ করে কলকাতায় বসে বিলাস ঐশ্বর্যে ডুবে পরের ধনে পোদ্দারী করবেন—এ আর চলবে না; এরকম করার অধিকার জমিদারদের নেই—এ প্রকারান্তরে পরদ্রব্য অপহরণ—লুণ্ঠন। আমি বিজ্ঞানসেবী—সত্য আমার সেবনীয় বন্দনীয়; কাজেই আমাকে অনেক সময় অনাবৃত খোলাখুলি সোজা সত্য কথা বলতে হয়—অপ্রিয় হলেও আমি বিপ্লবের সম্ভাবনা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মচারীদের সামনে স্পষ্ট ভাষায় উচ্চকণ্ঠে বলছি।

যাই হোক, এখন আমাদের প্রধান কাজ গ্রামে গ্রামে সমবায় কৃষি ও হিতসাধন সমিতি করে দেশের উন্নতি করা। আপনাদের ম্যাজিস্ট্রেট দত্ত সাহেব এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছেন, খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। এইরকম সমিতি করেই দেশের পরম মঙ্গল সাধন করা যাবে—চাই একাগ্রতা কর্তব্যনিষ্ঠা আর স্বদেশপ্রেমিকতা। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ করে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করুন—এই আমার বিনীত অনুরোধ।

বাঁকুড়া শিল্প-প্রদর্শনী উদ্ঘাটন, মৌখিক বক্তৃতার সারাংশ
'প্রবাসী'। চৈত্র ১৩২৮

বাঙ্গালা ভাষা

স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৬৩ - ১৯০২

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 'উদ্বোধন' পত্রের সম্পাদককে লিখিত পত্র থেকে উদ্ধৃত

আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূত-কিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষায় যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে কর্‌তে হবে—যেন সাফ্ ইস্পাৎ, মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক-চাল—নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।

যদি বল ওকথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করবো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে

পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ এক কল্‌কেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কল্‌কেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ কল্‌কেতার ভাষাই চলবে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট, সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিত্‌ছে সেইটি দেখ। যখন দেখ্‌তে পাচ্ছি যে কল্‌কেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান অবশ্যই কল্‌কেতার ভাষাকে ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা—ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরে মতির সাজপরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়? সংস্কৃতর দিকে দেখ দেখি। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর মীমাংসা ভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ—আচার্য শঙ্করের মহাভাষ্য দেখ, আর অর্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ।—এখুনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচাভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ্‌রে, সে কি ধুম—দশ পাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পরে দুম করে—'রাজা আসীৎ'!!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!!—ও সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নাতে লতাপাতা চিত্রবিচিত্রর কি ধুম!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম! সে কি আঁকা বাঁকা ডামাডোল্—ছত্রিশ নাড়ীর টান তায় রে বাপ। তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব! এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝ্‌বে যে যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প সে সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝ্‌বে

যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আস্‌বে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু'হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই। তখন দেবতার মূর্তি দেখ্‌লেই ভক্তি হবে, গহনা পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগ্‌মগ্‌ করবে।

উদ্বোধন ১৩০৬ আষাঢ়
'ভাববার কথা'। ১৩৫৮

পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ এক কল্‌কেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কল্‌কেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ কল্‌কেতার ভাষাই চলবে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট, সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিত্‌ছে সেইটি দেখ। যখন দেখ্‌তে পাচ্ছি যে কল্‌কেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান অবশ্যই কল্‌কেতার ভাষাকে ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ কর্‌বেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা—ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরে মতির সাজপরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়? সংস্কৃতর দিকে দেখ দেখি। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর মীমাংসা ভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ—আচার্য শঙ্করের মহাভাষ্য দেখ, আর অর্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ।—এখুনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচাভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ্‌রে, সে কি ধুম—দশ পাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পরে দুম করে—'রাজা আসীৎ'!!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!!—ও সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নাতে লতাপাতা চিত্রবিচিত্রর কি ধুম!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম! সে কি আঁকা বাঁকা ডামাডোল্—ছত্রিশ নাড়ীর টান তায় রে বাপ। তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব! এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝ্‌বে যে যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প সে সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝ্‌বে

যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আস্‌বে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। ছুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু'হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই। তখন দেবতার মূর্তি দেখ্‌লেই ভক্তি হবে, গহনা পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগ্‌মগ্‌ করবে।

উদ্বোধন ১৩০৬ আষাঢ়
'ভাববার কথা'। ১৩৫৮

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

১৮৬৪ - ১৯১৯

বন্দে মাতরম্। বাঙলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্তে নেমে নিজের মাটীতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ কাশী পার হ'য়ে মা পূর্ববাহিনী হ'য়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ ক'রে মা সেখানে শতমুখী হলেন। শতমুখী হ'য়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা দেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগ্‌ল। লোকের গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, গাল ভরা হাসি হ'ল। লোকে পরম সুখে বাস করতে লাগল। এমন সময় মর্তে কলির উদয় হ'ল। লোকে ধর্ম কর্ম ছাড়্‌তে লাগ্‌ল। ব্রাহ্মণ-সজ্জনে অনাচারী হ'ল। সন্ন্যাসীরা ভণ্ড হ'ল। সকলে বেদবিধি অমান্য করতে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি চঞ্চল হ'লেন। লক্ষ্মী ভাবলেন—হায়, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; আমাকে বুঝি বাঙলা ছাড়্‌তে হ'ল। তখন বাঙলাতে রাজা ছিলেন, তাঁর নাম আদিশূর। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; বাঙলায় অনাচার ঘটেছে; আমি বাঙলা ছেড়ে চললেম। রাজা কেঁদে বললেন,—না মা, তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়োনা; যাতে বাঙলায় সদাচার ফিরে আসে, তা আমি কর্‌ছি। রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে বস্‌লেন। দরবারে ব'সে পশ্চিম দেশে কনোজে লোক পাঠালেন; কনোজ থেকে পাঁচজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনালেন। তাঁদের সঙ্গে পাঁচজন সজ্জন কায়েত এলেন। রাজা তাঁদের রাজ্যের মধ্যে বাস করালেন। তাঁরা বাঙলা দেশে বেদবিধি নিয়ে এলেন, সদাচার নিয়ে এলেন। তাঁদের ছেলেমেয়ে বাঙলার গাঁয়ে গাঁয়ে বাস করতে লাগ্‌ল। তাঁদের দেখাদেখি দেশে বেদবিধি সদাচার ফিরে এল। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা জুড়ে বস্‌লেন। ধনে ধানে দেশ পূর্ণ হ'ল।

চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি আবার চঞ্চল হ'লেন। বাঙলার ধন দেখে ধান দেখে মোছলমান বাঙলায় এলেন। তখন বাঙলার রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল লক্ষ্মণ সেন। তাঁর রাজ্য গেল। মোছলমান বাঙলার

রাজা হ'লেন। হিঁদুর জাতি ধর্ম নষ্ট হ'তে লাগ্‌লো। হিঁদুর ঠাকুরঘর ভেঙে মোছলমান মস্‌জিদ্ তুলতে লাগলেন। অর্দ্ধেক হিঁদু মোছলমান হ'ল। হিঁদু-মোছলমানে এক গাঁয়ে এক ঠাঁয়ে বাস ক'রে মারামারি কাটাকাটি করতে লাগল। লক্ষ্মী ভাবলেন, হায়, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, আমাকে বুঝি বাঙলা ছাড়তে হ'ল। তখন বাঙলাতে গৌড়ের পাঠান-বাদ্‌শা রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হোসেন শা। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; আমার হিঁদুও যেমন মোছলমানও তেমনি; হিঁদু মোছলমান ভাই-ভাই যখন মারামারি-কাটাকাটি করতে লাগ্‌ল আমি বাঙলা ছেড়ে চললেম্। পাঠান রাজা কেঁদে বল্লেন—মা, তুমি যেতে পাবে না; আমি হিঁদু মোছলমান সমান দেখবো; তাদের ভাই-ভাই এক ঠাঁই করব; তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়োনা। লক্ষ্মী বল্লেন—আচ্ছা তাই হবে, আমি এখন থাক্‌ব; দিল্লীতে মোগল বাদ্‌শা হ'বেন। দিল্লীর বাদ্‌শা বাঙলার রাজা হবেন, সেই রাজা হিঁদু মোছলমান সমান দেখবেন; তখন হিঁদু মোছলমান ভাই-ভাই হবে, ঝগড়া বিবাদ মিটে যাবে। রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে বস্‌লেন। দরবারে ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে মহাভারত শোনালে। মোছলমান রাজা ব্রাহ্মণকে মান্য ক'রে রাজমন্ত্রী করলেন। হিঁদু গিয়ে মোছলমানের পীর-তলায় সিন্নি দিতে লাগ্‌ল। এমন সময় মহাপ্রভু নদীয়ায় অবতার হলেন। তিনি যবন ব্রাহ্মণ সবাইকে ডেকে কোল দিলেন। পাঠানের পর দিল্লীর মোগল বাদ্‌শা বাঙলার রাজা হ'লেন। তিনি হিঁদু মোছলমানকে সমান চোখে দেখতে লাগলেন। হিঁদু মোছলমান ভাই-ভাই হ'ল, ঝগড়া বিবাদ মিটে গেল। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা জুড়ে বসলেন। ধনে ধানে দেশ পূর্ণ হ'ল।

এইরূপে বহুদিন গেল। চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি আবার চঞ্চল হ'লেন। দিল্লীর তখনকার বাদ্‌শা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল আলম্‌গীর। তিনি হিন্দু-মোছলমানে তফাত করতে গেলেন। বর্গী এসে বাদ্‌শার রাজ্য লুঠ করতে লাগল। সাতসমুদ্র পার হ'য়ে খৃষ্টান ইংরেজ সদাগর বাংলায় বাণিজ্য করতে এসেছিল। দিল্লীর বাদ্‌শা তাদের আদর ক'রে নিজের রাজ্যমধ্যে জায়গা দিয়েছিলেন। বাঙলার ধন দেখে, ধান দেখে তাদের লোভ হ'ল। লক্ষ্মী তখন আলমগীরের বংশের দিল্লীর বাদ্‌শাকে ছেড়েছেন। বাদ্‌শা ইংরেজকে বাঙলার দেওয়ান ক'রে দিলেন। বাদ্‌শার দশা দেখে বাদ্‌শাকে খাজনা দেওয়া বন্ধ ক'রে তারাই হ'ল বাঙলার রাজা। তারা এসেছিল সদাগর, হ'য়েছিল বাদ্‌শার দেওয়ান, হ'য়ে গেল দেশের রাজা। রাজা হ'ল; কিন্তু রাজ্যে

বাস করল না। বাঙলা দেশের ধন নিয়ে ধান নিয়ে সাত সমুদ্রপারে আপন দেশে চল্‌ল। সাগরের জাত কিনা, মেজাজ ঠাণ্ডা, তীক্ষ বুদ্ধি, অতিশয় ধূর্ত। তারা চোর ডাকাত দমন করল, মিষ্টি মিষ্টি কথা কইতে লাগল, আবার নিজের দেশ হ'তে খেলনা এনে, পুঁতুল এনে প্রজার মন ভোলাতে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী যখন চঞ্চল হন্, তখন মানুষের বুদ্ধি লোপ হয়। বাঙলার লোকের বুদ্ধিলোপ হ'ল। বুড়ো মানুষ শিশু সাজ্‌ল; ইংরাজের দেওয়া খেলনা-পুতুল নিয়ে ছেলেখেলা করতে লাগ্‌ল। সদাগর রাজা কাঁচ এনে দিলেন। বাঙলার প্রজা কাঞ্চন বদলে সেই কাঁচ নিতে লাগ্‌ল। দেশের জিনিসে লোকের মন উঠে না। ঝুঁটোমণির রঙ দেখে দেশের সাচ্চামণিকে অনাদর করতে লাগ্‌ল। রাজা যত আদর দেন সোহাগ করেন, দেশের লোক ততই খোকা সাজ্‌তে লাগ্‌ল। রাজা হাততালি দিতে লাগ্‌লেন; দেশের যত বুড়ো হামাগুড়ি দিয়ে আধ-আধ কথা বল্‌তে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী বল্‌লেন, আর না, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, বাঙলার লোকের এই দশা, আমার আর বাঙলায় থাকা চল্‌লো না।

লক্ষ্মী চঞ্চলা। চঞ্চল হয়ে বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা ছেড়ে চললেন্। আঁধার রাতে কালপেঁচা ডেকে উঠ্‌ল। তখন সাত কোটি বাঙালী কেঁদে উঠল। রাজার দোষে লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে চল্‌লেন ব'লে রাজার দোষ দিয়ে সকলে কেঁদে উঠ্‌ল, ইংরেজ রাজা সেই কাঁদন শুনে বিরক্ত হ'লেন। ইংরেজ রাজার তখন একটা ছোকরা নায়েব ছিল; সে আপন দেশে ছিল কেরাণী, হয়ে এসে ছিল নায়েব। নায়েবী পেয়ে সে ধরাকে সরা জ্ঞান কর্‌ত। আলমগীর বাদ্‌শার তক্তে ব'সে সে আপনাকে আলমগীরের নাতি ঠাওরা'ত। সে বললে এরা বড় ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছে, যাক, এদের দু-দল ক'রে দিচ্ছি; এক দিকে যাক মোছলমান, একদিকে থাক্ হিঁদু। এরা ভাই-ভাই এক ঠাঁই থেকে বিরক্ত কর্‌ছে; এদের ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই ক'রে দাও, এদের জোট ভেঙ্গে দাও। এই ব'লে তিনি বাঙালীকে দু'দল করে দিলেন,—একদিকে গেল হিঁদু, একদিকে গেল মোছলমান। পূবে-উত্তরে গেল মোছলমান, পশ্চিমে-দক্ষিণে থাক্‌ল হিঁদু।

লক্ষ্মী দেখ্‌লেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; আর আমার নিতান্তই বাঙলায় থাকা চল্‌ল না। আমার হিঁদু যেমন মোছলমান তেম্‌নি। হিঁদু মোছলমান যখন ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হ'ল, তখন আর আমার বাঙলায় থাকা চল্‌ল না।

১৩১২ সাল আশ্বিন মাসের তিরিশে, সোমবার কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, সেদিন

বড় দুর্দিন, সেইদিন রাজার হুকুমে বাঙলা দু-ভাগ হবে ; দু-ভাগ দেখে বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা ছেড়ে যাবেন। পাঁচকোটি বাঙালী আছাড় খেয়ে ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে ডাকতে লাগ্‌ল—মা, তুমি বাঙলার লক্ষ্মী, তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর ; বিদেশী রাজা আমাদের সুখ দুঃখ বোঝেন না, তাই ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই করতে চাইলেন ; আমরা ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হব না ; মা, তুমি কৃপা কর ; আমরা এখন থেকে মানুষের মত হ'ব ; আর পুতুলখেলা করব-না, কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ কিনব না ; পরের দুয়ারে ভিক্ষা কর্‌ব না ; মা তুমি আমাদের ঘরে থাক ; বাঙলার লক্ষ্মী বাঙালীকে দয়া কর্‌লেন। কালীঘাটের মা-কালীতে তিনি আবির্ভাব হলেন। মা-কালী নববেশে মন্দিরে দেখা দিলেন। সেদিন আশ্বিনের অমাবস্যা ; ঘোর দুর্যোগ, ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি, হুহু ক'রে হাওয়া। পঞ্চাশ হাজার বাঙালী মা-কালীর কাছে ধন্না দিয়ে পড়ল। বল্‌লে, মা আমাদের রক্ষা কর। বাঙলার লক্ষ্মী যেন বাঙলা ছেড়ে না যান। আমরা আর অবোধের মত ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেল্‌ব না। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। ঘরের জিনিষ থাক্‌তে পরের জিনিষ নেবো না। মায়ের মন্দির হ'তে মা ব'লে উঠলেন—জয় হউক ; জয় হউক ; ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক্‌বেন ; বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাক্‌বেন, তোমরা প্রতিজ্ঞা ভুলোনা ; ঘরের থাকতে পরের নিয়ো না, পরের দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ো না ; ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ো না, তোমাদের "এক দেশ এক ভগবান্ এক জাতি এক মনপ্রাণ" হোক্ ; লক্ষ্মী তোমাদের অচলা হবেন।

তিরিশে আশ্বিন ; কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পূজা নিয়ে বাঙলার লক্ষ্মী ঐ দিন বাঙলা ছাড়্‌ছিলেন। ঐ দিন বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় অচলা হ'লেন। বাঙলার হাট মাঠ-ঘাট জুড়ে বস্‌লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগ্‌লেন। ফলে ফুলে দেশে আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠ্‌ল। তাতে রাজহংস খেলা কর্‌তে লাগ্‌ল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, গালভরা হাসি হ'ল।

বাঙলার মেয়েরা ঐ দিন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত নিলে, ঘরে ঘরে সেদিন উনুন জ্বল্‌ল না। হিন্দু মুসলমান ভাই-ভাই কোলাকুলি করলে। হাতে হাতে হল্‌দে সুতোর রাখী বাঁধ্‌লে। ঘট পেতে বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুন্‌লে। যে এই বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শোনে, তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হন।

বছর বছর ঐ দিনে বাঙালীর মেয়েরা এই ব্রত নেবে। বাঙালীর ঘরে ঐ দিন উনুন জ্বল্‌বে না। হাতে হাতে হল্‌দে সুতোর রাখী বাঁধবে। বঙ্গলক্ষ্মীর

কথা শুনে শাঁখ বাজিয়ে ঘটে প্রণাম ক'রে বাতাসা-পাটালি প্রসাদ পাবে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী অচলা হবেন। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকবেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাকবেন।

সবাই বল—

আমরা ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই
ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই
ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই ॥

মা লক্ষ্মী, কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। ঘরের থাক্‌তে পরের নেবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা কর্‌বো না। ভিক্ষার ধন হাতে তুলবো না। মোটা অন্ন ভোজন কর্‌বো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ কর্‌বো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। ভাইকে খাইয়ে পরে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক্! মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক্। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাকুন।

বাঙলার মাটি বাঙলার জল
বাঙলার হাওয়া বাঙলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান্।

বাঙলার ঘর, বাঙলার মাঠ
বাঙলার বন, বাঙলার হাট;
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান্।

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক
সত্য হউক, হে ভগবান্।

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক, এক হউক
এক হউক, হে ভগবান্।

বন্দেমাতরম্

অনুষ্ঠান

প্রতি বৎসর আশ্বিনে বঙ্গবিভাগের দিনে বঙ্গের গৃহিণীগণ বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। সে দিন অরন্ধন। দেব-সেবা ও রোগীর ও শিশুর সেবা ব্যতীত অন্য উপলক্ষ্যে গৃহে উনুন জ্বলিবে না। ফলমূল চিড়ামুড়ি অথবা পূর্বদিনের রাঁধা-ভাত ভোজন চলিবে।

পরিবারস্থ নারীগণ যথারীতি ঘট স্থাপন করিয়া ঘটের পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। বিধবারা ললাটে চন্দন ও সধবারা সিঁদুর লইবেন। হরিতকী বা সুপারী হাতে লইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনিবেন। কথা-শেষে বালকেরা শঙ্খধ্বনি করিলে পর ঘটে প্রণাম করিবেন। প্রণামান্তে বাম হস্তের (বালকেরা দক্ষিণ হস্তের) প্রকোষ্ঠে স্বদেশী কার্পাসের বা রেশমের হরিদ্রারঞ্জিত সূত্রে পরস্পর রাখী বাঁধিয়া দিবেন। রাখীবন্ধনের সময় শঙ্খধ্বনি হইবে। তৎপরে পাটালি প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। সংবৎসরকাল যথাসাধ্য বিদেশী, বিশেষতঃ বিলাতী, দ্রব্য বর্জন করিবেন। সাধ্যপক্ষে প্রতিদিন গৃহকর্ম আরম্ভের পূর্বে লক্ষ্মীর ঘটে মুষ্টিভিক্ষা রাখিবেন এবং মাসান্তে বা বৎসরান্তে উহা কোনরূপ মায়ের কাজে বিনিয়োগ করিবেন।

ভূমিকা

গত পৌষের বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা পুনর্মুদ্রিত হইল। বঙ্গব্যবচ্ছেদের দিন অপরাহ্ণে জেমো-কান্দি গ্রামের অর্ধসহস্রাধিক পুরনারী আমার মাতৃদেবীর আহ্বানে আমাদের বাড়ীর বিষ্ণুমন্দিরের উঠানে সমবেত হইয়াছিলেন, গ্রন্থোক্ত অনুষ্ঠানের পর আমার কন্যা শ্রীমতী গিরিজা কর্তৃক এই ব্রতকথা পঠিত হয়। বন্ধুবর্গের অনুরোধে ইহা পুস্তকাকার প্রকাশ করিলাম।

সম্প্রতি এডুকেশন গেজেটে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথার সংস্কৃত অনুবাদ বাহির হইতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

চৈত্র ১৩১২

প্রবাসী বাঙ্গালী

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৮৬৫ - ১৯৪৩

যে-সকল বাঙ্গালী আসামে বাস করেন, তাঁহাদের অধিকাংশকেই প্রবাসী বলা যায় না। কারণ, আসামের গোয়ালপাড়া কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলাগুলি বাস্তবিক প্রাকৃতিক-বঙ্গেরই অন্তর্গত। তথায় বঙ্গভাষীর সংখ্যাই অধিক। অন্যান্য অনেক জেলাতেও হাজার হাজার বাঙ্গালী পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছে।

বর্তমান সময়ে বিহার উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর একটি স্বতন্ত্র সুবা। ইহাতে কিন্তু প্রাকৃতিক-বঙ্গের অনেক অংশ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণা জেলায় শতকরা ১৫ জন বাঙ্গালা বলে। জামতাড়া মহকুমার শতকরা ৩৪ এবং পাকুড়ে শতকরা ৩০ জন বাঙ্গালা বলে। মানভূম জেলায় শতকরা ৬৪ জন এবং সিংভূম জেলার ধলভূম মহকুমায় শতকরা ৪০ জন বাঙ্গালা বলে। পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ মহকুমায় শতকরা ৯৭ জন বাঙ্গালা বলে। ছোটনাগপুরের দেশী রাজার অধীন রাজ্যগুলিতে প্রতি দশ হাজারে ১৮৫৯ জন এবং উড়িষ্যার রাজ্যগুলিতে প্রতি দশ হাজারে ২১৪ জন বাঙ্গালা বলে। ইহাদের মধ্যে অল্পলোককেই প্রবাসী বলা যায়।

বঙ্গের সীমার সহিত যে-সকল প্রদেশের সীমা সংলগ্ন নহে, সেই-সকল প্রদেশের বাঙ্গালীরা যে সকলেই প্রবাসী, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায়। তন্মধ্যে দেখা যাইতেছে যে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা দশ বৎসরে ২৪১২০ হইতে কমিয়া ২২৫০০ হইয়াছে, এবং পাঞ্জাবে দশ বৎসরে ২৩৩০ হইতে কমিয়া ২১১৬ হইয়াছে। অন্যত্র বাড়িয়াছে। এই দুই প্রদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা কেন কমিল, তাহা তথাকার প্রবাসী বাঙ্গালী কেহ কেহ যদি অনুসন্ধানপূর্বক নির্ণয় করিতে পারেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।

বঙ্গের বাহিরে প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে আর সর্বত্র পুরুষের সংখ্যা অধিক এবং তাহাই স্বাভাবিক, কারণ জীবিকার জন্য অধিকাংশ স্থলে পুরুষেরাই বিদেশে যায়; কেবল আজমীর-মারোয়াড়, মধ্য-ভারত এজেন্সীতে এবং আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। শেষোক্ত প্রদেশে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী হওয়ার কারণ সহজেই বুঝা যায়। স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় কাশী বৃন্দাবনাদি তীর্থস্থানে গিয়া বাস করে। আজমীর-মারোয়াড়াতেও ১৩২ পুরুষ এবং ১৫৯ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে সংখ্যার ন্যূনাধিক্য কোন আকস্মিক কারণে ঘটিয়া থাকিতে পারে;—পুষ্কর তীর্থের জন্য কি না তাহা নির্ণয়যোগ্য। মধ্য-

ভারত এজেন্সীতে মাত্র ২৮৯ জন পুরুষ, এবং ৬০৫ জন স্ত্রীলোক কি কারণে হইয়াছে, তাহা স্থানীয় কেহ নির্ধারণ করিয়া লিখিলে ভাল হয়।

অনেকের নিকট এসকল বড় তুচ্ছ ব্যাপার মনে হইতে পারে। আমরা তাহা মনে করি না। প্রথমতঃ জীবিকা নির্বাহের কথা আছে। পৈত্রিক ভিটায় বসিয়া সকলের জীবিকা নির্বাহ হয় না। তাহাদের নানাস্থানে যাওয়া আবশ্যক,—তা বঙ্গের ভিতরেই হউক বা বাহিরেই হউক। বাহিরে গিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিলে জাতির এই একটা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাহারা অন্য প্রদেশের লোকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কোন কোন কার্যক্ষেত্রে জিতিতেছে ও টিকিয়া থাকিতেছে। যদি বাঙ্গালী ভারত-সাম্রাজ্যের বাহিরে গিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে, তাহা হইলে এই শক্তির পরিচয় আরও ভাল করিয়া পাওয়া যায়। তাহার পর আর-একটা কথা এই যে, যেমন কেহ ঘরের বাহিরে না গেলে, ঘরকুনো হইয়া বসিয়া থাকিলে, তাহার প্রকৃতিতে সংকীর্ণতা জড়তা উদ্যমহীনতা ভীরুতা কূপমণ্ডুকতা প্রভৃতি দোষ আসিয়া পড়ে, সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারে না, নানা বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া শক্তসমর্থ হইতে ও মনুষ্যত্বলাভ করিতে পারে না; তেমনি ঘরকুনো জাতিরও ঐরূপ দশা ঘটে। অতএব জাতীয় চরিত্রের উন্নতির জন্য সকল জাতিরই বাহিরে যাওয়া দরকার।

বাঙ্গালীরা এক সময়ে হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া, সমুদ্র পার হইয়া কত জাতিকে জ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষা দিয়াছে, সভ্য করিয়াছে। ইতিহাস হইতে তাহার চিহ্ন সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। এখন আমরা প্রধানতঃ অন্যান্য জাতির মত, জীবিকা উপার্জনের জন্যই বঙ্গের বাহিরে যাই। কিন্তু তা বলিয়া, অর্থের বিনিময়ে আমরা যে কাজ দি, তা ছাড়া আমাদের যে আর কিছু দিবার নাই, তা নয়। বিধাতার বিধানে যেমন ভিন্ন ভিন্ন মানুষে ভিন্ন ভিন্ন গুণের ও শক্তির বিকাশ কমবেশী হইয়া থাকে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যেও সেইরূপ দেখা যায়। মারাঠাতে যাহা যে পরিমাণ আছে, বাঙ্গালীতে তাহা ঠিক সে পরিমাণে নাই; আবার বাঙ্গালীর প্রকৃতিতে যে বস্তুর বিকাশ যতখানি দেখা যায়, মারাঠার প্রকৃতিতে ততখানি দেখা যায় না। ভারতের সমস্ত জাতির পরস্পর সংস্পর্শের প্রয়োজন আছে, তাহাতে লাভ আছে, সকলের মধ্যে ভাব চিন্তা আদর্শের আদানপ্রদানের এবং পরস্পরের উপর প্রভাবের প্রয়োজন ও উপকারিতা আছে।

এক ভারতীয় জাতি গড়িতে হইলে এইরূপ সংস্পর্শ, আদানপ্রদান ও পরস্পরের উপর প্রভাব আবশ্যক।

যাহারা এক হইবে, তাহারা পরস্পরকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে না পারিলে, কেমন করিয়া এক হইতে পারে? প্রবাসীরা নমুনার কাজ করেন। পশ্চিমের লোক বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালীকে দেখে বটে, কিন্তু আরও ভাল করিয়া দেখে প্রবাসী বাঙ্গালীকে। প্রবাসী বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালীর ভাল নমুনা হন, তাহা হইলে তিনি যে প্রদেশে প্রবাসী তথাকার লোকেদের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহারা জাতির সহিত জাতি বাঁধিবার বন্ধনরজ্জুর কাজ করিতে পরেন।

ভাল নমুনা সকলেই হইতে পারেন। ধনীব্যক্তি উচ্চপদস্থ হইতে দরিদ্র কর্মচারী, সম্পন্ন সওদাগর হইতে অল্প আয়ের দোকানদার, উকীল, ব্যারিস্টার, অধ্যাপক, শিক্ষক, ডাক্তার, রেলের বাবু প্রভৃতি সকলেরই ভাল বা মন্দ নমুনা হইবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের দেশে রেলে যাতায়াত করাও একটা বিপদের মধ্যে। পশ্চিমের কোথাও কোন বাঙ্গালী টিকিট-বাবু যদি যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাহার দ্বারা তাঁহার নিজের ক্ষতি ত হয়ই অধিকন্তু সমস্ত বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধে হাজার হাজার লোকের ধারণা খারাপ হয়। কিন্তু যদি কেহ সজ্জন হন, তাহা হইলে তিনি নিজের স্বজাতির ও সমগ্র ভারতের মঙ্গলের কারণ হন। শিক্ষক ও অধ্যাপকদের হাতে বালক ও যুবকদিগকে গড়িয়া তুলিবার ভার। তাঁহারা যদি স্নেহশীলতার সাধুচরিত্রের কর্তব্যপরায়ণতার জ্ঞানতপস্বিতার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে যে প্রদেশে কাজ করেন, তথাকার মঙ্গল ত হয়ই, অধিকন্তু বাঙ্গালীর নাম উজ্জ্বল হয়। লোকে বিপন্ন হইয়া চিকিৎসকের আশ্রয় লয়। মোকদ্দমায় একপক্ষ বিপন্ন বা অত্যাচারিত হইয়া উকীল ব্যারিস্টারের সাহায্য চায়, এবং আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রবাসী বাঙ্গালী চিকিৎসক, ব্যবহারজীব ও বিচারক ভাল হইলে লোকের কল্যাণ ত হয়ই, অধিকন্তু তাঁহাদের মধ্যে ভিন্ন প্রদেশের লোকে বাঙ্গালীর ভাল নমুনা দেখিয়া বাঙ্গালীকে আত্মীয় জ্ঞান করিতে শিখে। রাষ্ট্রীয় সামাজিক এবং শিক্ষা-ও-ধর্ম সম্বন্ধীয় আদর্শের প্রচার সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের একটি প্রধান কর্তব্য। যখন প্রবাসী বাঙ্গালী সম্পাদকেরা কোনও প্রদেশকে খাটো না করিয়া, কাহারও প্রতি অবজ্ঞা বা বিদ্বেষকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া, প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া, ভারতীয় জাতিগঠনের পথ দেখাইয়া দেন, কেমন করিয়া ভারতের সকল প্রদেশের, সকল ধর্মের ও শ্রেণীর লোকেরা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইতে পারে, তাহা দেখাইয়া দেন, তখন তাঁহারা যে প্রদেশবিশেষের ও সমগ্র ভারতের হিতসাধন করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা হইতে রাজধানী উঠিয়া যাইবার পূর্বে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সকল প্রদেশের প্রতিনিধি ও অন্যান্য অনেক প্রধান প্রধান লোক এবং সামন্ত অমাত্য প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত দেশীয় রাজন্যবর্গ কলিকাতায় আসিতেন। তাহাতে তাঁহাদের সঙ্গে বাঙ্গালীর কিছু কিছু পরিচয় ঘটিত। ভারতীয় একতার স্বপ্ন বাঙ্গালীই আগে দেখিয়াছে, বাঙ্গালীই এই একতার মন্ত্র আগে প্রচার করিয়াছে। বাঙ্গালীর সঙ্গে সমগ্র ভারতের বহু নেতার এই পরিচয়ে বঙ্গের ও ভারতের উপকার হইত। এখন দিল্লীতে রাজধানী উঠিয়া গিয়া সে পরিচয়ের পথ বন্ধ হইয়াছে। সমগ্র ভারতের রাজস্ব, সমগ্র ভারতের সেনাদল প্রভৃতি সাম্রাজ্যিক সমুদয় রাজকীয় ব্যাপারের কেন্দ্রস্থল কলিকাতায় থাকায়, তৎসম্পর্কীয় সমুদয় অফিসে প্রধানতঃ বাঙ্গালী নিযুক্ত হইত। ইহা দ্বারাও বাঙ্গালী উপকৃত হইত এবং তাহার দ্বারা সমগ্র ভারতের কিছু কাজ হইত। ক্রমে সে সুবিধা ও সুযোগও বাঙ্গালী হারাইল, এবং দিল্লীর নিকটবর্তী প্রদেশের লোকেরা তাহা পাইবে।

সুতরাং এখন বাঙ্গালীদের মধ্যে, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে, বাঙ্গালা ছাড়া ভারতবর্ষের বাকী অংশের কাজ করিতে প্রবাসী বাঙ্গালীরাই প্রধানতঃ পারিবেন। অবাঙ্গালীদের সঙ্গে সংস্পর্শ ভাব চিন্তা আদর্শের আদানপ্রদানআদির প্রধান উপায় তাঁহারা। বাঙ্গালীর নমুনা অবাঙ্গালীরা সাক্ষাৎভাবে তাঁহাদের মধ্যেই দেখিবে। তাঁহাদের দায়িত্ব গুরুতর। কোন প্রবাসী বাঙ্গালীই আপনাকে সামান্য মনে করিবেন না। আমরা-কাহাকেও সামান্য মনে করি না। প্রত্যেকেই বাঙ্গালীর প্রতিনিধি।

তাঁহাদের কাজ বড় কঠিন। তাঁহারা যে প্রদেশের অন্নজলে পুষ্ট তাহার মঙ্গলসাধনে তৎপর তাঁহাদিগকে থাকিতেই হইবে। সুখের বিষয় বাঙ্গালী যে প্রদেশেই গিয়াছেন, অর্থোপার্জন লক্ষ্য বা উপলক্ষ্য হইলেও তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তাহার জনহিতকর কার্যে সময় শক্তি ও অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু আবার তাঁহারা অবাঙ্গালী হইয়া গেলেও চলিবে না। তাঁহাদের একটি জাতির বিশেষত্ব জন্মিয়াছে। তাহার ছায়া ও ছাপ বাঙ্গালা সাহিত্য পড়িয়াছে। প্রবাসী বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রাখিতে হইবে, বঙ্গের মানসিক ও আধ্যাত্মিক নানা চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত থাকিতে হইবে।

'প্রবাসী' বিবিধ প্রসঙ্গ। ভাদ্র ১৩২১

প্রাচীন সাহিত্য

মুন্সী আব্দুল করিম

১৮৬৫ - ১৯৫২

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষ অসংখ্য দেবদেবীর লীলাক্ষেত্র। ভারতের ধর্মেতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, এ দেশে এক এক সময়ে এক এক দেবতা আবির্ভূত হইয়া কিয়ৎকাল ব্যাপিয়া লোক-সমাজে বিলক্ষণ প্রভাব ও মহিমা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। তারপর সেই দেবতার তিরোভাব ও অপর দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে। যুগে যুগে ভারতে কেবল এরূপ দেবতার উপর দেবতার আবির্ভাব ও তিরোভাবই চলিয়া আসিয়াছে। আজ পর্যন্তও এই ভাবের বিরাম নাই। কালে কালে এরূপ অসংখ্য লৌকিক দেবতার সৃষ্টিতে ভারতবর্ষ একেবারে দেবদেবীর লীলাস্থলে পরিণত হইয়াছে। একদিন সত্যপীর মানিকপীর প্রমুখ লৌকিক দেবতাদের সৃষ্টিও সম্ভবতঃ এইভাবেই হইয়াছিল।

লৌকিক দেবতার সৃষ্টি-বিষয়ে মাননীয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, "লৌকিক দেবগণের পূজা-প্রচলনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। যেখানে আমরা দুর্বল হইয়া পড়ি, সেইখানেই একটি দুর্বলের সহায় দেবতার আবশ্যক হয়। শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য চিন্তিত মাতা কি মাতামহীর দুর্বলতাসূত্রে ষষ্ঠী কল্পিত হইলেন। চণ্ডিকা ও হরি চিরপ্রসিদ্ধ দেবতা; কিন্তু বিপদ নিবারণার্থ ও আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে এই দুই দেবতা ঈষৎ নাম ও ভাব পরিবর্তন করিয়া দুর্বলের সহায়রূপে উপনীত হইলেন। একজনের নাম হইল মঙ্গলচণ্ডী, আর-এক জনের নাম হইল সত্যনারায়ণ। এ চণ্ডী শুধু বিপদ্ত্রাণকারিণী; ইনি বসন্তকালে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যে মধুমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, কিংবা যে বেশে বৎসরান্তে পিত্রালয়ে আগমন করেন, এখানে সে বেশে আসেন নাই— এখানে ইনি শুধু বিপদ্বারিণী। সত্যনারায়ণ ননীচোরা গোপাল হইতে পৃথক বস্তু; ইনি অর্থসম্পদ্দাতা কুবেরস্থানীয়।"[১] তা যেরূপেই হউক, বঙ্গের প্রায় প্রতি পল্লীতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠী শীতলা ও মনসা প্রভৃতির পূজার মত সর্বজনপ্রিয় এই সত্যপীর-পূজাও যে বহু ব্যাপকভাবে বহুদিন হইতে দেশে সুপ্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই-সকল দেবতার পূজা কখন্ কিভাবে প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয়

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

করা একরূপ অসম্ভব। হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে কেবলমাত্র স্কন্দপুরাণ রেবাখণ্ডে সত্য-নারায়ণ পূজার মূল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার আরম্ভ-ভাগ এইরূপ—"একদা শৌণকাদি ঋষিগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যাসশিষ্য সূত তাঁহাদিগকে বলিলেন—পূর্বে ভগবান কমলাপতি দেবর্ষি নারদকে যাহা বলিয়াছিলেন, আপনারা সমাহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। দেবর্ষি নারদ মানবগণের দুঃখ-দয়ার্দ্র হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন—

"মর্ত্যলোকে জনাঃ সর্বে নানা ক্লেশসমন্বিতাঃ।
নানা যোনি-সমুৎপন্নাঃ পচ্যন্তে পাপকর্মভিঃ॥
তৎ সর্বং শময়েন্নাথ লঘুপায়েন তদ্বদ।
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্বং কৃপাস্তি যদি তে ময়ি॥"

অল্প সময়ে সামান্য উপচারে যে কোন দিনে সর্বসাধারণে যাহাতে অনুষ্ঠান করিতে পারে, ভগবান্ তাই সত্যনারায়ণ-ব্রতের বিধান ও উপদেশ করিলেন।

স্কন্দপুরাণের বিধান দেখিয়া মনে হয়, হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণ-পূজা প্রচলিত হইবার সম্ভবতঃ উহাই মূলীভূত কারণ। হিন্দুর সত্যনারায়ণ আর মুসলমানের সত্যপীর যে একই দেবতা বই নহেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু তিনি আদৌ হিন্দুর দেবতা, কি মুসলমানের পীর ছিলেন তাহা নিশ্চিতরূপে বলিবার উপায় নাই। 'সত্য' নামধেয় কোন দেবতাতে হিন্দুগণ 'নারায়ণ' শব্দ যোগ করিয়া হিন্দুর এবং মুসলমানগণ 'পীর' শব্দ যোগ করিয়া মুসলমানের করিয়া লইয়াছেন, এরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে বটে। কিন্তু বাঙ্গালার সত্যনারায়ণী সাহিত্যের আলোচনা করিয়া দেখা যায়, সত্যনারায়ণ মুসলমানের সত্যপীর ভিন্ন আর কেহই নহেন। বাঙ্গালা অভিধানে দেখিতে পাই, সত্য-নারায়ণ অর্থে দেবতাবিশেষ বা সত্যপীরকে বুঝায়। আবহমানকাল-প্রচলিত লোকমত হইতেও জানা যায় যে, সত্যনারায়ণ আর সত্যপীর অভিন্ন। 'সত্যপীর' আখ্যায় 'পীর' শব্দের সংযোগ দেখিয়া সহজেই তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া প্রতীতি জন্মে এবং দেশের সর্বসাধারণের বিশ্বাসও তাহাই। যদি এই অনুমান ঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে মুসলমান-আগমনের ঠিক পরেই ভারতে সত্যপীরের প্রভাব ও মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছিল, বলিতে পারা যায়।

হিন্দুর প্রচলিত শাস্ত্রীয় দেবতাদের মধ্যে সম্ভবতঃ সত্যনারায়ণের নাম নাই। একমাত্র স্কন্দপুরাণেই সত্যনারায়ণকে হিন্দু-দেবতার আসন প্রদান

করা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের রচনাকাল আমাদের জানা নাই, কিন্তু যাহাই হউক না কেন, ইহা হইতে এই বুঝিতে পারা যায় যে, উহা রচিত হইবার কিছুকাল পূর্ব হইতে ভারতে সত্যনারায়ণ-পূজা প্রবর্তিত হইয়াছিল। এ অবস্থায় মুসলমানদের সত্যপীরই যে হিন্দুর সত্যনারায়ণে পরিণত হয় নাই, এরূপ অনুমান না করিয়া পারা যায় কিরূপে ?

ঐরূপ অনুমানের অনুকূলে আরও একটা কারণ দেখা যায়। "কস্মিন্ দিনে ভক্তিশ্রদ্ধা সমন্বিতচিত্তে নিশামুখে রম্ভাফলং ঘৃতং ক্ষীরং গোধুমস্য চূর্ণকম্ অভাবে শালিচূর্ণং বা শর্করাং বা গুড়ং তথা"—হিন্দুর সত্যনারায়ণ-পূজার এই উপকরণ মুসলমানদের সত্যপীরের সিন্নিতে প্রদত্ত উপকরণেরই অনুরূপ। হিন্দুর পূজা আর মুসলমানের সিন্নিতে একটু প্রকার-ভেদ থাকিলেও মূলতঃ উভয়ই এক বই আর কিছুই নহে। মুসলমানের পীর-পয়গাম্বরকে হিন্দুর দেবতারূপে গ্রহণ কিছু বিসদৃশ বোধ হওয়ার কোন কারণ দেখি না। কারণ, সাধারণতঃ দেখা যায়, যে দেশবাসী বা যে ধর্মাবলম্বীই হউন না কেন, সকলেই সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন। এই ভাব হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যেই অত্যন্ত প্রবল। হিন্দু গৃহস্থের পক্ষে সাধু বৈষ্ণবের সেবা করা একটি কর্তব্য কর্ম। হিন্দু শাস্ত্রমতে অতিথি দেবতা এবং সাধু অতিথি নারায়ণতুল্য। এখনও যদি কোন হিন্দু সাধুর সহিত অপর সাধুর সাক্ষাৎ হয়, তিনি তাঁহাকে 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া অভিবাদন করেন। মুসলমানগণও অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ এবং যে কোন সাম্প্রদায়িক হউক না কেন, ফকিরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, ফকিরগণ এই ভাবের সুবিধা পাইয়া অনেক সময় নিরীহ লোকদিকের প্রতি কত অত্যাচার করিয়া থাকেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় হিন্দু ও মুসলমানের সাধু ও ফকিরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল এবং এখনও আছে। এই সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর পূজা এক সময়ে এই উভয় জাতির মিলনভূমি হইয়াছিল, যেখানে তাঁহারা একত্রে একই দেবতার পূজা করিবার সুযোগ পাইতেন।

বর্তমান কালে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মধ্যে যেরূপ ভাবই থাকুক না কেন, প্রাচীনকালে তাঁহাদের মধ্যে, একত্র বাস নিবন্ধন, পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি ও সহানুভূতির ভাব যে অত্যন্ত প্রবল ও গভীর ছিল, পুরাবৃত্তের আলোচনা দ্বারা তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁহারা তখন পরস্পর ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী হইয়াও একে অন্যের আচার-ব্যবহার ও পোশাক-পরিচ্ছদাদির অনুকরণ বা গ্রহণ

করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। তৎকালে হিন্দুগণ মুসলমানের কোন কোন ধর্মবিশ্বাসকে কিরূপে আপনাদের স্বজাতীয় করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা অধুনা বুঝিয়ে উঠা দুষ্কর। যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দ্বারা সময়ে সময়ে দেশের শান্তিভঙ্গ হইলেও তখন জনসাধারণের মধ্যে যে একটা নিবিড় শান্তি ও প্রীতির ভাব এবং সহানুভূতির বন্ধন বিদ্যমান ছিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই প্রীতি ও সহানুভূতির ভাব হইতেই পরে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে কতকটা উদারতার ভাব আসিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহারই ফলে একদিন হিন্দুসমাজে হিন্দুর মনসা পূজা ও কাত্যায়নীর ব্রত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সেই উদারতা ও সুহৃদ্ভাবই এক সময়ে হিন্দুসমাজকে মুসলমানের মস্‌জিদ-দরগাহের প্রতি ভক্তি ও মুসলমানের পীর আউলিয়ার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে প্রণোদিত করিয়াছিল। আবার সেই উচ্চ উদারতা ও সম্প্রীতির ভাবই একেশ্বরবাদী মুসলমান কবিগণকে রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনায় এবং সৈয়দ জাফর ও মির্জা হোসেন আলিকে কালী-মাহাত্ম্য রচনায় এবং গাজী দরাফকে গঙ্গাপূজায় প্রবর্তিত করিয়াছিল। তখন উভয় জাতির আচার ব্যবহার পরস্পরের মধ্যে এতই পরিগৃহীত হইয়াছিল যে, যদি আজ পর্যন্ত সেই ভাব নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিত, তবে এতদিনে যে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম বিষয়ে এত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া এক মহা মিলনভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইতেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। কিন্তু হায়! তে হি নো দিবসা গতাঃ। আমাদের পূর্বপুরুষগণ একদিন বড় সাধে যে মিলন-মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কালের ঝঞ্ঝাবাত আসিয়া তাহা একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে। পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন থাকিয়াও হিন্দু-মুসলমান এক সময়ে অলক্ষ্যে এক মহামিলন-পথের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, আর আজ উভয়ে এক অবস্থায় অবস্থিত হইয়াও পরস্পরের গলা কাটাকাটি করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে?

কিন্তু বলিতেছিলাম, মুসলমানের মধ্যেও বা সত্যপীর কে? মুসলমান-দরবেশ বা আউলিয়াগণের মধ্যে উক্ত নামধেয় কেহ আছেন বলিয়া ত জানা যায় না। তথাপি তাঁহার নাম সত্যপীর হইল কেন? মুসলমান-সমাজে সত্যই কি তন্নামধেয় কোন পীর ছিলেন অথবা কোন পীর বা ফকিরকে এই উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল? তিনি কি শরীরী বা অশরীরী জীব? এ সকল প্রশ্ন স্বতঃই মনের মধ্যে উদিত হয়। কিন্তু ভারতের বাহিরে মুসলমান রাজ্যাদিতে

সত্যপীরের প্রভাব আছে কিনা, না জানিলে তাহাদের সমাধান একরূপ অসম্ভব। জগদ্বিখ্যাত বোগ্‌দাদ নগরে প্রাচীনকালে মনস্থর হাল্লাজ নামধেয় মহাতপোবলসম্পন্ন জনৈক সাধুপুরুষ ছিলেন। তিনি সাধন-পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে শেষে আপনাকে 'আনলহক' বা 'আমি সত্য' বলিয়া প্রচারিত করেন। সকলেই জানেন; 'ইস্‌লাম ধর্মে ঈশ্বর' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। তন্মতে পরমেশ্বরই একমাত্র 'সত্য' হইতে পারেন। স্থতরাং মনস্থরের উক্তবিধ বাক্য ইস্‌লামের সবার একান্ত বিরোধী ছিল। তদীয় মুখে এরূপ উক্তি শুনিয়া বোগদাদের তৎকালীন ধর্মযাজকগণ সকলে একবাক্যে তাঁহাকে 'কাফের' সাব্যস্ত ও তাঁহার প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। কথিত আছে, সেই দণ্ডের ফলে তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করা হইলে, সেই সকল খণ্ডিত দেহাংশ হইতেও 'আনলহক' শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল। বিস্ময়বিমূঢ় ধর্মযাজকগণ তারপর ঐ সকল দেহখণ্ড কুড়াইয়া অগ্নিতে ভস্মীভূত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তখন ভস্মস্তূপ হইতেও 'আনলহক' শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল। এই সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথার সহিত আমাদের প্রসঙ্গের সম্পর্ক না থাকায় এখানে তাহার বিবৃতি হইতে বিরত রহিলাম।

মনস্থরের প্রচারিত এই উক্তি তখন দেশ-বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সন্দেহ নাই। কে বলিবে এই মহর্ষি মনস্থর হাল্লাজই লোকমুখে 'সত্য' আখ্যায় আখ্যাত হইতে হইতে পরে মুসলমানের 'সত্যপীরে' এবং হিন্দুর 'সত্যনারায়ণে' পরিণত হন নাই? অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাত্মগণকে দেবতার আসনে বসান মানুষের স্বভাবসিদ্ধ চির-প্রচলিত রীতি। সত্যপীর সম্বন্ধে আমাদের এই অনুমানের কোন সারবত্তা আছে কিনা, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য বাঙ্গালার সুধীবর্গকে অনুরোধ করি।

তা সত্যপীর যিনিই হউক না কেন, ভারতের হিন্দু মুসলমান ও বৌদ্ধ—তিন জাতিরই ঘরে তিনি পূজা পাইয়া থাকেন বা এক সময়ে পাইতেন, তথাপি তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, ইহা একান্ত বিস্ময়ের কথাও বটে, ক্ষোভের কথাও বটে।

মুসলমানেরা সত্যপীরকে এক অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ জ্ঞানে ভক্তি করেন এবং হিন্দুগণ তাঁহাকে নারায়ণ জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। তদীয় মাহাত্মজ্ঞাপক প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই, তাঁহাকে কোথাও খোদা, কোথাও বা পয়গাম্বর এবং কোথাও বা ফকির বলা হইয়াছে। কোথাও

বা ভক্ত হিন্দু কবি তাঁহাকে নারায়ণের আসনে বসাইয়া তদীয় চরণে ভক্তির পুষ্পমাল্য অর্পণপূর্বক নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন।

সকলেই জানেন; সম্রাট আকবর সকল ধর্মের প্রতিই প্রগাঢ় ভক্তি দেখাইতেন এবং তাহার মতে যে কোন ধর্মে থাকিলেই লোকের মোক্ষ লাভ হইতে পারে। তিনি সকল ধর্মেরই প্রধান প্রধান পণ্ডিত ব্যক্তিকে রাজসভায় আনাইয়া তাঁহাদের সহিত ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করিতেন। কথিত আছে, তিনি সকল ধর্মের সারমর্ম সংগ্রহ করিয়া এক অভিনব ধর্মমত প্রচার করেন। এই ধর্মকে 'দীন এলাহী' নামে অভিহিত করিয়া তিনি আপনাকে উহার ঈশ্বর-প্রেরিত প্রচারক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। আমার পরমশ্রদ্ধেয় সুহৃদ বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী মহাশয় বলেন; —সম্রাট আকবরের প্রচারিত উক্ত "দীন এলাহী" ধর্মই সত্যপীর ধর্মে পরিণত হইয়া দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মতের পোষকতায় তিনি বলেন, রাজানুগ্রহ ব্যতীত কোন ধর্মই এরূপ ব্যাপকভাবে দেশময় বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে না। কয়েক বৎসর পূর্বে যখন সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বাঙ্গালা পুঁথি-সংগ্রহ আরম্ভ হয়, সে সময় ভিন্ন ভিন্ন লোকের রচিত সত্যনারায়ণের পুঁথি প্রায় প্রত্যেক গ্রাম হইতেই পাওয়া গিয়াছিল। তিনি ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং সকল স্থানেই এই সত্যনারায়ণের পূজা দেখিয়াছেন। তারপর বৈষ্ণব মহাজনগণের কবিতাদির মধ্যে এই সত্যনারায়ণ দেবতার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহাতে এই প্রমাণিত হয় যে, সত্যনারায়ণের পূজা বৈষ্ণব মহাজনের অভ্যুদয়ের পরে অর্থাৎ সম্রাট আকবরের সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল।

তিনি আরও একটি কথা বলেন—সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর -পূজকদিগের সহিত তান্ত্রিকদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, ইহা সত্যপীরের পুঁথিতেই পাওয়া যায়। তান্ত্রিকেরা নানা বীভৎস আচরণ করিয়া যোগবলে কতকগুলি ক্ষমতা লাভ করেন। সত্যপীর-পূজকেরা দেখাইলেন যে, শুদ্ধাচরণ করিয়াও যোগবলে সেরূপ ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য লাভ করা যাইতে পারে।

দেশে এক সময়ে সত্যপীরের বিশেষ প্রভাব ছিল এবং এখনও কতকটা আছে, তাহা একবারে অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য এ কথাও স্বীকার্য যে, কালপ্রভাবে লোক-হৃদয়ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা এখন অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। শুধু সত্যপীরের প্রতি নহে, প্রাচীন সকল ধর্মমতের প্রতিই যে

অধুনা আমাদের বিশ্বাস অনেকটা শিথিলীভূত হইয়াছে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? জগৎ নিত্য পরিবর্তনশীল। জগতের এই পরিবর্তনশীলতা মানবহৃদয়ে ক্রিয়া উৎপাদন করিয়া সংসারে এক এক সময়ে এক এক নূতন যুগের সূচনা করিয়া আসিতেছে। অলৌকিক দৈবশক্তির উপর অনুচিত বিশ্বাস স্থাপন মানব-স্বভাবের এক দুর্বলতা হইলেও স্বাভাবিক। একদিন সত্যপীরের আবির্ভাবও ঠিক এইভাবেই হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। সত্যপীরের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এখন যেটুকু আছে, আর কিছুদিন পরে হয়ত তাহাও থাকিবে না। শ্রদ্ধা থাকুক আর নাই থাকুক, সত্যপীরের নাম কিন্তু বাঙ্গালা হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলা বড় শক্ত কাজ, শক্ত কাজ কিরূপে, এখন সে কথাই একটু বলি।

কুড়ি ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমাদের অনেকের ধারণা ছিল, বাঙ্গালীর কোন প্রাচীন সাহিত্য নাই। এখন সকলের সে ভ্রান্ত ধারণা অপনোদিত হইয়াছে এবং বাঙ্গালীর এক বিরাট-কলেবর প্রাচীন সাহিত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধর্ম-জগতের মত প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যেরও এক এক যুগে এক এক দেবতার প্রভাব পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতাগণ প্রথমে লোকের হৃদয়-রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করেন। লোকের হৃদয়-রাজ্য হইতে শেষে তাহা তাঁহাদের সাহিত্য-রাজ্যে পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সত্যনারায়ণের প্রভাবকালে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এক সত্যনারায়ণী সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে সত্যনারায়ণের গণ্ডী খুব সীমাবদ্ধ, সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি সেই সাহিত্যের এক কোণে তাঁহার একটা স্থান আছে। কালমাহাত্ম্যে লোকহৃদয় তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যের এক কোণস্থিত সেই ক্ষুদ্র স্থানটুকু অবলম্বন করিয়াই তিনি বাঙ্গালায় চিরদিন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। তাঁহাকে সে স্থান হইতে বিচ্যুত করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

মনসা ও চণ্ডী-সাহিত্যের মত সত্যনারায়ণী সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ না ঘটিলেও উহার পরিসর যে নিতান্ত কম নহে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সত্যনারায়ণী পূজার যেমন বহু প্রচার ঘটিয়াছিল, সত্যনারায়ণী সাহিত্য প্রচারেও তেমন বঙ্গের বহু কবি লেখনী পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। কত কবির গাথা ইতিমধ্যে কাল-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে এবং এখনও কত কবির রচনাবলী গৃহস্থের নিভৃত গৃহকোণে লুক্কায়িত থাকিয়া নিয়তির কোলে মরণ প্রতীক্ষা করিতেছে, কে বলিবে? এ পর্যন্ত যাঁহাদের বিষয় জানা গিয়াছে,

তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত সামান্য বলিয়া মনে করা যায় না। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, দ্বিজ রামেশ্বর ভট্টাচার্য, ফকির রামদাস, লালা জয়নারায়ণ সেন, দ্বিজ কাশীনাথ, দ্বিজ বিশ্বেশ্বর, দ্বিজ রামভদ্র, বিকল চট্ট, শঙ্করাচার্য, দ্বিজ জয়দেব, দীনহীন দাস, দ্বিজ রামকৃষ্ণ, দ্বিজ রামানন্দ, দ্বিজ পণ্ডিত, ফকির চাঁদ, দ্বিজ রঘুনাথ, জনার্দন ভট্টাচার্য প্রভৃতি কবিগণ বাঙ্গালায় একটা সত্যনারায়ণী সাহিত্য সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সেরূপ চেষ্টা সত্ত্বেও উক্ত সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে নাই।

আগেই বলিয়াছি, স্কন্দপুরাণ রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণ-পূজার মূল পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের কবিগণ তাঁহাদের গাথাগুলির রচনায় কেহই মূলের অনুসরণ করেন নাই। প্রায় সকলেই নূতন ভাষায় একটা নামমাত্র আবরণ দিয়া একই জনের রচিত বা উদ্ভাবিত গল্প আপন গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাহার ফলে গল্প ও ভাবগুলি সামান্য ইতরবিশেষ সত্ত্বেও নিতান্ত একঘেঁয়ে ও অস্থিসার হইয়া উঠিয়াছে। ধর্মপ্রসঙ্গের সীমাবন্ধনী অতিক্রম করিতে না পারিয়া অনেকের প্রতিভাই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয় নাই।

শ্রীকবিবল্লভ বিরচিত 'সত্যনারায়ণের পুঁথি'র ভূমিকা। ১৩২২

বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬৬ - ১৯২৩

বাঙ্গালী যে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের জাতিসকল হইতে পৃথক্ এবং স্বতন্ত্র, বাঙ্গালীর যে একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে, ইহা ঠিকমত বুঝিতে হইলে—(১) বাঙ্গালার উপাসক-সম্প্রদায়ের পরিচয় লইতে হইবে, (২) বাঙ্গালা ভাষার ব্যাপ্তি পুষ্টি ও প্রকৃতির পরিচয় লইতে হইবে, (৩) জীমূতবাহন হইতে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার পর্যন্ত প্রায় সাত শত বর্ষকাল কোন্ সিদ্ধান্তের উপরে বাঙ্গালীর স্মৃতি ও দায়শাস্ত্র বিস্তৃতি ও পুষ্টি লাভ করিয়াছে তাহা জানিতে হইবে, (৪) বাঙ্গালীর জাতি এবং কুল পরিচয় পূর্ণরূপে লইতে হইবে। এই কয়টা বিষয় ঠিকমত ব্যাখ্যাত হইলে তবে বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্য বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার মূল উপাদান। এমন কি, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে যজ্ঞাদিতে বাঙ্গালী ভবদেবের পদ্ধতি মান্য করিয়া চলে, অন্য কোন আর্য পদ্ধতিকারকে গ্রাহ্যই করে না। দায়তত্ত্বে জীমূতবাহন বাঙ্গালীকে অপূর্ব স্বাধীনতা দিয়া গিয়াছেন; দায়ভাগ বাঙ্গালার হিন্দুয়ানিকে অনেকটা territorial বা দেশগত ও জাতিগত করিয়া রাখিয়াছে। জয়দেব-উমাপতি-প্রমুখ সংস্কৃত কবিগণ, লুইপাদ, কাহ্নু প্রমুখ সিদ্ধাচার্যগণ, শঙ্কর, কৃষ্ণানন্দ-প্রমুখ তান্ত্রিক আচার্যগণ বাঙ্গালীকে এক অপূর্ব বিশিষ্টতা দিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার উপাসনাপদ্ধতি, কর্মপদ্ধতি, সাহিত্য, ভাষা এবং জাতি ও কুলপরিচয় সম্বন্ধে, ইংরেজীযুগে ইংরেজীনবীস পণ্ডিতগণের দ্বারা যথারীতি আলোচনা হয় নাই, তাই ইংরেজীনবীস বাঙ্গালী স্বদেশের ও স্বজাতির প্রকৃত পরিচয় রাখেন না। বলিব কি মজার কথা, বৌদ্ধ-যুগে ধর্ম কর্ম শীল ও আচার লইয়া বাঙ্গালী নালন্দার পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছিল। বাঙ্গালাই বজ্রযানের আদি স্থান; আবার সে বজ্রযান সহজিয়া মত এবং তন্ত্রমতের দ্বারা এমনই ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত হইয়াছিল যে, পরে হীনযানী সদ্ধর্ম হইতে উহা পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হইয়াছিল।

যত জীব তত শিব

এই মহাবাক্য বাঙ্গালা দেশেই প্রথম উত্থিত হয়; এই মহাবাক্য অনুসারে মনুষ্য-সমাজে যতটা কাজ হওয়া সম্ভবপর, তাহা বাঙ্গালা দেশেই বাঙ্গালী জাতির মধ্যে

হইয়াছিল। বাঙ্গালার সহজ মত ; তন্ত্রধর্ম, এবং পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এই মহাবাক্যের বেদীর উপরে বিন্যস্ত। এমন কি, বাঙ্গালীর ভক্তিশাস্ত্রটা এই মহাবাক্যের দ্বারা এতটাই সঞ্জীবিত যে, উহা রামানুজ, বল্লভাচার্য প্রমুখ মধ্যযুগের আচার্যপাদগণের ব্যাখ্যাত, ভক্তি ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন হইয়া রহিয়াছে।

যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে
তাই আছে দেহভাণ্ডে !

ইহাও বাঙ্গালার একটা মহাবাক্য। ব্রহ্মাণ্ড Macrocosm, নরদেহভাণ্ড Microcosm ; একটা ব্যাপ্ত, অপরটা সঙ্কুচিত, একটা বিরাট, অপরটা স্বরাট্। তাই তন্ত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে'—ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণরাশির খেলা হইতেছে, দেহভাণ্ডে— জীবমাত্রেরই কলেবরে—সেই গুণরাশির ক্রিয়া হইয়া থাকে। দেহভাণ্ডকে বুঝিতে পারিলে, আয়ত্ত করিতে পারিলে ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝা যায়, ব্রহ্মাণ্ডকে আয়ত্ত করা যায়। এই সিদ্ধান্ত, এই অপূর্ব generalisation বাঙ্গালীর একটা বড় বিশিষ্টতা। এই সিদ্ধান্তের উপরে সহজিয়া মত এবং বৈষ্ণবদিগের 'দেহতত্ত্ব' প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালীর দেহতত্ত্ব বাঙ্গালীর নিজস্ব ; উহা বাঙ্গালার বাহিরে নাই ; বাঙ্গালার বাহিরের ভাবুকগণ উহা ঠিকমত বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালীর সাহিত্য, ভাষা, মহাজনীপদ ও কীর্তন, শ্যাম-শ্যামার গান, সবই এই দেহতত্ত্বের সিদ্ধান্তরাশির দ্বারা যেন অনুস্যূত—অনুপ্রাণিত। এই দেহতত্ত্বই বাঙ্গালীর Anthropomorphism বা নরপূজার—নরদেবতাপূজার বেদী। তাই বাঙ্গালীর দেবতা দ্বিভুজ মুরলীধর, চিদ্‌ঘন শ্যামসুন্দর, সচ্চিদানন্দ-মূর্তি। তাই বাঙ্গালীর দেবী দ্বিভুজমুরলীধারিণী, একাম্র-কাননবিহারিণী ; উমাসুন্দরী চিন্ময়ী, চিদ্‌ঘনশ্যামরূপিণী। বাঙ্গালীর আগমনী বাঙ্গালীর নিজস্ব ; আগমনীগান ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে নাই, আর কোন জাতি অমন গান করে নাই, গান করিতে জানেও না। তাই বাঙ্গালা দেশেই শ্যাম-শ্যামার সমন্বয় সাধন অপূর্বভাবে হইয়াছিল। এই সমন্বয়ের মহাকবি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ; তাঁহার রচিত 'কালীকীর্তন' এই সমন্বয়ের অপূর্ব পরিচায়ক। বাঙ্গালীই একা নরদেবতা এবং নারীদেবীকে পূজা করিতে শিখিয়াছিল। বাঙ্গলাদেশেই প্রেমের ধর্মের প্রথম বিকাশ হয়। হিন্দুস্থানে একা সুরদাস তাঁহার সঙ্গীতরাশিতে নরাকারের দেবতা দ্বিভুজমুরলীধারীর পূজা ও বন্দনা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন ; পরন্তু এই তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা বাঙ্গালা

দেশে বাঙ্গালী ভক্তগণের দ্বারা সাধিত হইয়াছিল। কথাটা আর একটু খুলিয়া বলিব।

বৈদিক—Deism

বেদেই বহির্দেবের পূজার প্রচলন আছে। বেদই অনুজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন যে ইন্দ্র বরুণ সূর্য সোম বহ্নি আদি দেবতাগণের পূজা করিতে হইবে। ইহাদিগকে প্রসন্ন রাখিতে পারিলে জগৎ প্রসন্ন থাকিবে, পূজক-যাজ্ঞিকও প্রসন্ন হইবেন—সিদ্ধমনোরথ হইবেন। বেদের যজ্ঞাদি সকল কার্যই বাহিরের দেবতার পূজার নামান্তর মাত্র। সে দেবতা মানুষ নহে, অতিমানুষ শক্তি-সম্পন্ন জীব বিশেষ—'ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্'। সে দেবতা মানুষদেহের অতীত, বিশ্বসৃষ্টির উপরে বিন্যস্ত। বেদের এই দেববাদের প্রতিবাদ বাঙ্গালার তান্ত্রিকগণ সার্থকভাবে করিতে পরিয়াছিল। অবশ্য অম্ভৃণ-কন্যা বাকের উক্তিতে—দেবীসূক্তে উহার প্রথম দ্যোতনা থাকিলেও ঐ সূক্ত অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীই বেদের দেববাদের, বহির্দেবতার পূজাপদ্ধতির প্রতিবাদ করে। বাঙ্গালার তন্ত্রেই আছে—

আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা
বহির্দেবং বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা
ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া॥

অর্থাৎ হাতের মুঠার মধ্যের কৌস্তুভমণিকে ফেলিয়া বা উপেক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি কাচখণ্ড অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তি যেমন অজ্ঞতার পরিচয় দেয়, তেমনি যে ব্যক্তি চোদ্দ পোয়া মাপের নরদেহে অবস্থিত আত্মরূপী দেবতাকে অবহেলা করিয়া বাহিরের অন্য দেবতার পূজায় ব্যস্ত হয়, সে ততোধিক মূর্খ। সোজা কথা এই—বাহিরের দেবতার পূজা বন্ধ করিয়া, যাগযজ্ঞাদি পরিহার করিয়া পরমাত্মার পূজায় ব্যাপৃত হও। ইহাই বাঙ্গালার ধার্মিকগণের আদেশ, ইহাই বাঙ্গালার সকল সাম্প্রদায়িক উপাসকগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের উপরে বাঙ্গালীর উপাসনাতত্ত্ব বিন্যস্ত। বাঙ্গালীর দেহতত্ত্ব বেদের Deism-এর প্রতিবাদ। বাঙ্গালীর দেহতত্ত্বের প্রভাবে বাঙ্গালায় বৈদিক যাগযজ্ঞাদি লোপ পাইয়াছিল; আমাদের মনে হয়, বৈদিক যাগযজ্ঞাদি এবং Deism কোন কালেই বঙ্গদেশে তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

দেহতত্ত্ব

এই দেহতত্ত্বের অন্তরালে একটা প্রকাণ্ড Philosophy বা দর্শনশাস্ত্র নিহিত আছে। তাহার পুরোপুরি ব্যাখ্যা মাসিকপত্রের সন্দর্ভে সম্ভবপর নহে, তথাপি মোটামুটিভাবে এই সম্পর্কের গোটাকয়েক তত্ত্ব বলিয়া রাখিব। সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণের মধ্যে অনেকের দোঁহাবলীতে এই কয়টা সিদ্ধান্ত আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। আমার মনে হয়, এই কয়টা সিদ্ধান্তই বাঙ্গালার সাহিত্যে, ভাষায়, গানে, কীর্তনে, সাধনে-ভজনে, পরিব্যপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

১. ঈশ্বরাসিদ্ধে—যুক্তিতর্কের দ্বারা, চাক্ষুষ বা পরোক্ষ প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা যখন বহির্দেবতা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করা যায় না, তখন তাঁহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া প্রয়োজন নাই। অজ্ঞেয়তাৎ তিনি এখন বর্জনীয় হইয়া থাকুন।

২. ঈশ্বর অনন্ত অজ্ঞেয়, তাঁহার অনাদি সৃষ্টিও অনন্ত এবং অজ্ঞেয়। তবে একটা ব্যাপার আমরা দেখিতে পাই, আমাদের আয়ত্তের মধ্যে অবস্থিত এবং চেষ্টা করিলে ও সাধনা করিলে হয়ত তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। ক্ষুদ্রের এবং ব্যষ্টির ক্রিয়া এবং ক্রিয়া ফলের পরিচয় পাইলে হয়ত আমরা মহানের, গোষ্ঠীর এবং সাফল্যের পরিচয় পাইলেও পাইতে পারি।

৩. মানুষ হইতে মানুষের সৃষ্টি একটা অপূর্ব ব্যাপার নহে কি? জীব হইতে জীবের উৎপত্তি বিশ্বসৃষ্টির অংশ স্বরূপ একটা অপূর্ব বিস্ময়জনক কার্য নহে কি? কেমন শক্তি দেহের মধ্যে বিরাজ করিতেছে, যাহার প্রভাবে নূতন জীবের উৎপত্তি ঘটিতেছে? সেই দেহস্থ শক্তির পরিচয় পাইলে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত অপূর্ব মহতী শক্তির কতকটা পরিচয় পাইতে পার। এই দেহতত্ত্ব বুঝিলে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বুঝিবে।

৪. দেহস্থ এই শক্তিই কুলকুণ্ডলিনী—'বিষতন্তময়ী দেবী সর্বদেহ প্রসারিণী' পদ্মের নালের সূক্ষ্ম সূতার মতন এই শক্তি জীবদেহের সর্বত্র সম্প্রসারিত রহিয়াছেন। ইহা হইতেই সৃষ্টি, ইনিই জগজ্জননী। ইনিই পুরুষের চারিধারে, অনাদিলিঙ্গের সর্বাবয়বে সর্পের ন্যায় জড়িত হইয়া আছেন।

৫. দেহস্থ এই পুরুষ এবং প্রকৃতির পরিচয় পাইলে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পুরুষ-প্রকৃতির পরিচয় পাইবে। ভাব ও রসের সাহায্যে ইহাদের পরিচয় পাইতে হয়। রস মনুষ্যদেহস্থ একাদশ প্রকারের আসক্তি হইতে নির্গলিত। ভাব

জীবের মিলন-আকাঙ্ক্ষা হইতে উন্মেষ লাভ করিয়াছে। একটা অজ্ঞেয় অতৃপ্তিই জীবত্বের লক্ষণ। কি-যেন নাই, কি-যেন হারাইয়াছি, কি-যেন পাইলে পরমানন্দ লাভ করিতে পারি—এই অতৃপ্তি ও লালসাই ভাবের জননী। রামপ্রসাদ গান করিয়াছেন—'ডুব দে মন কালী বলে, হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে'; দেহতত্ত্বের বৈষ্ণব কবি গান করিয়াছেন—'স্বপনে মন যে কেমন মানুষরতন হেরিয়াছে, সে যে অধর মানুষ দেয় না ধরা, ধরিতে মন হার মেনেছে।'

এই দেহতত্ত্ব বুঝিতে হইলে নাম রূপ ভাব রস এই চারি পদার্থকে বুঝিতে হইবে। এই দেহতত্ত্ব বুঝিতে হইলে ষট্‌চক্রভেদ ব্যাপারটা বুঝিতে হইবে। নহিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের অর্দ্ধেকটা বুঝিতে পারিবে না, বাঙ্গালীর বিশিষ্ট ভাবের অর্দ্ধেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। এই যে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের (কি রামপ্রসাদের রচিত, কি ভারতচন্দ্রের রচিত) কালীপক্ষেও ব্যাখ্যা আছে, উহার মহিমা আদৌ পরিগ্রহ করিতে পারিবে না। চণ্ডীদাস রচিত অনেক পদাবলীর অর্থ ব্যাখ্যা করিতে এখন অনেকে পারেন না; কেন না আজকালকার শিক্ষিত সমাজ দেহতত্ত্ব ভুলিয়াছে, ষট্‌চক্রভেদ জানে না। মান মাথুর দূতীসংবাদ বাসকসজ্জা প্রভৃতি লীলা-কীর্তনে রোদনের অবসর কোথায় আছে? অথচ বাঙ্গালী ভাবুক এই সকল কীর্তনের পালা শুনিয়া কাঁদে কেন? উহা তো করুণ রসের উদ্ভব নহে। উহা কি?

দেহতত্ত্ব বুঝিলে বাঙ্গালীর রোদনের বিশিষ্টতাটুকু বেশ বুঝিতে পারিবে, —হয়তো শেষে নিজে কাঁদিয়া আকুল হইবে। ধর্মব্যাখ্যা ত করিতে বসি নাই, বাঙ্গালীর বিশিষ্টতাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। তাই সামান্য ইঙ্গিত করা ছাড়া আর কিছু এ সম্বন্ধে বলিব না।

বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্ব—Individualism

আসল কথা এই, বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্ব তাহার আবিষ্কৃত সকল ব্যাপারে যেন শত-মুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পূর্বে কেবল মিথিলায় ন্যায়ের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত, মিথিলার পণ্ডিতগণ বাঙ্গালী ছাত্রদের পুঁথি লিখিয়া আনিতে দিতেন না। তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রকে মিথিলার একচেটিয়া করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ছাত্রগণকে ন্যায়শাস্ত্র

শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বাধ্য হইয়া মিথিলায় যাইতেই হইত। বাঙ্গালার কাণাভট্ট শিরোমণি রঘুনাথ মেধার এতই উন্নতিসাধন করিলেন যে, তিনি ক্রমে শ্রুতিধর হইয়া উঠিলেন। তিনি মিথিলায় যাইয়া ন্যায়শাস্ত্র যথারীতি অধ্যয়ন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল পুঁথি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। দেশে আসিয়া একচক্ষু রঘুনাথ তাবৎ ন্যায়গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব মনীষা প্রভাবে নব্যন্যায়ের উদ্ভাবনা করিলেন। ফলে, মিথিলার একচেটিয়া চূর্ণ হইল, নবদ্বীপ নব্য এবং পুরাতন ন্যায়ের পঠন-পাঠনের কেন্দ্রস্বরূপ হইল। ইহাই বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার পরিচায়ক। আবার মজার কথা, বাঙ্গালী ন্যায়ের এই অভ্যুদয়ধারা চারিশত বর্ষকাল অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিলেন, নবদ্বীপকে নব্য ন্যায়ের অ-দ্বিতীয় কেন্দ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন।

'ভুবনান্তক গদাধর'

এই উক্তির অর্থ পরিগ্রহ করিতে পার কি? গদাধর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের সমসময়ের বা পূর্বেকার অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার বংশে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ৺ভুবনচন্দ্র বিদ্যারত্ন পর্যন্ত, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমানভাবে প্রধান ও সর্বজনবরেণ্য নৈয়ায়িক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এমনটি পৃথিবীর আর কোন সভ্য জাতির পণ্ডিত সমাজে ঘটিয়াছে কি? ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে, কোন পণ্ডিতবংশে মনীষার এমন অব্যাহত ধারা কেহ দেখাইতে পারে কি? ইহাই বাঙ্গালার ব্যক্তিত্বের এবং বিশিষ্টতার শ্লাঘ্য পরিচয়। বাঙ্গালী সকল বিষয়ে চূড়ান্ত করিয়াছে। গোটাকয়েক উদাহরণ দিব—

১. দায়ভাগ ও স্ত্রীধনবিন্যাসে বাঙ্গালী স্মার্ত যে গণবাদের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ইংলণ্ডের ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কল্পনামাত্র ছিল। জীমূতবাহনের সিদ্ধান্ত সকল পুরামাত্রায় এখনও ব্রিটিশ জাতি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। জীমূত-বাহনের 'দায়ভাগ' মিতাক্ষরার প্রকাণ্ড প্রতিবাদ, Feudalism-এর বিরুদ্ধে বিষম Protest। সহস্র বৎসর পূর্বে, সকল সভ্য জাতির আবেগভাবে বাঙ্গালী এই প্রতিবাদটি করিয়া গিয়াছেন।

২. স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন একজন বিষম Protestant ছিলেন। গোঁড়ামির প্রতিষ্ঠাতা নহেন, বরং বলিব ভারতবাসীর বৈদিক গোঁড়ামির অপহ্নবকর্তা। তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতিসকলের মধ্যে যে ব্যাপক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপূর্ব এবং অতুল্য। তাহারই প্রভাবে বাঙ্গালায় আচারীদিগের

'ছুৎমার্গ' দাক্ষিণাত্যের তুল্য প্রবল হইতে পারে নাই। রঘুনন্দকে বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায় ইদানীং বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই বলিয়া, অজ্ঞতাবশে তাঁহার প্রতি অনেকে কঠোর হইয়া আছেন। রঘুনন্দন বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা উন্মেষের একজন প্রধান সাধক পুরুষ।

৩. শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার আর একটা উপাদান। রামানুজাচার্য বল্লভাচার্য মাধবাচার্য নিম্বার্ক প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের আচার্য সম্প্রদায় যে নানাবিধ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সে সকল অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৃন্দাবনে মথুরায়, নাথদ্বারায় হরিকীর্তন শুনিয়াছি, ভজন শুনিয়াছি। এই সকল হিন্দুস্থানী ভজনে ও কীর্তনে স্বপচাদি অস্পৃশ্য জাতিসকল গণ্ডির বাহিরে স্থান পাইয়া থাকে। বাঙ্গালায় হরিসঙ্কীর্তনে সে বাধা নাই, উচ্চ নীচ সকল জাতি সমান ভাবে কীর্তন আনন্দ উপভোগ করিতে পারে; কীর্তনের ক্ষেত্রে শ্বপচাদির স্পর্শে বাঙ্গালীর জাতি যায় না। কেবল এইটুকুই নহে, সেই কীর্তনক্ষেত্রে সকল জাতীয় কীর্তনীয়ার পদরজের উপরে সোপবীত ব্রাহ্মণ ও ভাবাবেশে গড়াগড়ি দিয়া থাকেন। সেই কীর্তনমণ্ডলীর উপরে হরির লুটের বাতাসা ছড়াইয়া দিলে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সবাই তাহা কুড়াইয়া লইয়া মুখ দেয়। এতটা বাঙ্গালী ছাড়া আর কেহ, কোন প্রদেশের বৈষ্ণব করিতে পারে নাই। বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কীর্তনে এমন ব্যাপার হইয়া থাকে।

৪. আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ এবং শাক্তানন্দতরঙ্গিনীপ্রণেতা ব্রহ্মানন্দ গিরি বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা উন্মেষের আর দুইজন সাধক। ইহারাই 'বাশিষ্ঠ পদ্ধতি' অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালায় শৈব বিবাহের প্রচলন করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের কাল পর্যন্ত বাঙ্গালায় শাক্ত তান্ত্রিক সমাজে শৈব বিবাহের খুব প্রচলন ছিল। রাজা রামমোহন রায় নিজেও শৈব বিবাহ করিয়াছিলেন। শৈব বিবাহে নরেীর জাতি বিচার করিতে হয় না, যৌবনের পূর্ণ উন্মেষ না ঘটিলে শৈব বিবাহ হইতে পারে না। এই শৈব বিবাহের প্রভাবে বাঙ্গালায় নানা জাতির সম্মেলন ঘটিয়াছিল, এমন কি—মগ, আরাকানী, ভুটিয়া, তিব্বতী, পাঠান রমণী বাঙ্গালার শাক্ত ব্রাহ্মণের গৃহকর্ত্রী হইয়াছিলেন। কুলজী গ্রন্থসকল ঘাঁটিলে এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ গিরি এক পাঠান-রমণীকে শক্তির পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। শাক্তের যেমন শৈব বিবাহ, বৈষ্ণবের তেমনি 'কণ্ঠিবদল' ছিল। সহজ মতের প্রচলন প্রভাবে

'পরকীয়া অর্চনার' বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজে খুব প্রচলন ছিল। সাহিত্য-পরিষদ তাঁহাদের একখানা প্রচারিত গ্রন্থে আড়াই শত বর্ষ পূর্বের স্বকীয়া-পরকীয়া সম্বন্ধে এক অপূর্ব আলোচনার কাগজপত্র ছাপিয়াছেন। সে এক বিরাট বিচার; খোদ সুবাদার সাহেব সে বিচার ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, জয়পুররাজ-প্রেরিত বেদেশীয় পণ্ডিত এ বিচারে পরাজিত হইয়াছিলেন, বাঙ্গালীর পরকীয়তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালার 'কন্ঠিবদল' সেই অবধি আজ পর্যন্ত বজায় রহিয়াছে।

৫. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অথবা বিক্রমপুরের নাস্তিক ভট্টাচার্য বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্বের একজন প্রধান সহায়ক। ইনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাই লোক ইহাকে নাস্তিক ভট্টাচার্য বলিত। দীপঙ্কর ভুটানে তিব্বতে চীনে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। বাঙ্গালার বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পূর্ব-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন; টেঙ্গুরে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, নেপালে বাঙ্গালীর অনেক কীর্তির অনেক পুঁথিপত্র আছে। ছিল দিন—যখন বাঙ্গালী বৈবাহিক সূত্রে তিব্বত, চীন, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশের সহিত সংবদ্ধ ছিল; ছিল দিন—যখন বাঙ্গালায় অসংখ্য বিদেশীয় পণ্ডিত আসিয়া বাস করিত এবং বাঙ্গালী রমণীকে শৈব বিবাহের সাহায্যে শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৃহস্থ হইয়া থাকিত। "ভরার মেয়ে বিবাহ" বাঙ্গালা দেশে বংশজ ও কষ্টশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল; শাক্ত কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে এবং কুলাচারী অন্য জাতির মধ্যে পাকস্পর্শের দিনে নববধূর জাতি কুলের পরিচয় লইয়া ঘোঁট হইত না। ইহা একটা বড় কথা।

৬. দেবদেবীবরের মেলবন্ধন এবং কৌলীন্যের নবপ্রতিষ্ঠা বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্বের একটা বড় পরিচয়। মিথিলায় ও কান্যকুব্জে যে কৌলীন্য এখনও প্রচলিত আছে, তাহা দেবীবর-প্রবর্তিত প্রথা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দেবীবর মেলবন্ধন করিয়া যে কত সাঙ্কর্যকে ঢাকিয়া দিয়াছিলেন, তাহার আর এখন হিসাব করিয়া বলা যায়না। অর্জুন মিশ্রের বিবাহ ব্যাপার একটা অপূর্ব ঘটনা, রত্নেশ্বরের বিবাহে আর একটা অপূর্ব ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এসকলের আলোচনা বিশ্লেষণ ও বিচার হওয়া কর্তব্য। কুলজী গ্রন্থসকল মন্থন করিলে বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার অসংখ্য উপাদান সংগ্রহ করা যায়।

৭. বাঙ্গালার প্রথম ও মধ্য যুগের সাহিত্যেও একটা অপূর্বত্ব আছে। কবিকঙ্কণ, ঘনরাম প্রভৃতি সকল বড় কবিই ব্রাহ্মণ, পরন্তু তাঁহাদের লিখিত সকল মহাকাব্যের Hero and Heroine নায়ক-নায়িকা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়

নহে। গন্ধবণিক, সদ্গোপ, কৈবর্ত, গোড়ো গোয়ালা প্রভৃতি জাতীয় পুরুষ সকলই এই সকল কাব্যের নায়ক; আরও মজা দেখ ভারতচন্দ্রের পূর্বকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণ লিখিতে সকল মহাকাব্যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের লেশ মাত্র নাই। চণ্ডীর ঘট স্থাপন ফুল্লরা নিজেই করিত, তজ্জন্য ব্রাহ্মণ ডাকিতে হইত না। কালকেতু পুষ্পকেতু, ইছাই ঘোষ, লাউসেন, ভীম, ধনপতি-প্রমুখ নায়কগণ কোন্ জাতীয় ছিলেন? ইঁহারা যদি মহাকাব্যের নায়ক হইতে পারেন, তবে তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্য বলি কোন্ হিসাবে? কাজেই বলিতে হয়, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের, জল আচরনীয় এবং জল অনাচারণীয়ের মধ্যে এমন অজ্ঞাত কোন তত্ত্ব আছে, যাহা এখনও আমরা ধরিতে পারি নাই। 'অ-শূদ্র-প্রতিগ্রাহী' শব্দটা কত দিনকার, তাহার আলোচনাও এই সঙ্গে করিতে হয়।

৮. এই সঙ্গে বাঙ্গালীর ভাষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীকে অপূর্ব বিশিষ্টতা দিয়াছে। সে পরিচয় পাইতে হইলে প্রায় সহস্র বৎসরের বাঙ্গলাভাষার উন্মেষ-পদ্ধতি বুঝিতে হয়; সিদ্ধাচার্যগণের গীত ও দোঁহাবলী হইতে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পর্যন্ত সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের মন্থন প্রয়োজন। এই বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস লুকান আছে। কুলজী গ্রন্থসকল সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশ' অপূর্ব কাব্যও বটে, ইতিহাসও বটে। ইহা ছাড়া বাঙ্গালার সঙ্গীত-সাহিত্যও অপূর্ব এবং অনন্যসাধারণ। কবির গান, পাঁচালির গান, শ্যামাবিষয়ক গান, কীর্তন, গাথা প্রভৃতি কত রকমের সঙ্গীত-সাহিত্য ছিল বা আছে, তাহাদের শ্রেণী বিভাগ, বিশ্লেষণ এবং সে সকল হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ এখনও কেহ করে নাই, ঘটেও নাই। অথচ বাঙ্গালীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ঘটনার উল্লেখ এই সকল গানে ও ছড়ায় নিবদ্ধ আছে।

কত আর উল্লেখ করিয়া বলিব। বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা এবং ব্যক্তিত্ব সমাজ-শরীরের সর্বাবয়বে, শিল্পকলার, নাচে গানে, চিকিৎসাশাস্ত্রে, চিকিৎসা-পদ্ধতিতে ঔষধনির্মাণে,—লাঠি খেলায়, ক্ষুরপা-রণপা নির্মাণে ও ব্যবহারে, নৌশিল্পে, নৌকা প্রস্তুতিতে, কথকতায়—ব্যাখ্যায়, বয়ন-শিল্পে, তসর-গরদের বসন-প্রস্তুতিতে, গজদন্তের কারুকার্যে, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারে—সভ্য জাতির সকল ব্যসন-বিলাসে যেন সদাই স্পষ্টীকৃত হইয়া আছে। মনীষী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, বাঙ্গালার ভূগর্ভ হইতে যত প্রতিমা বাহির হইতেছে, যত বৌদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাদের

technique ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। বাঙ্গালীর ভাস্কর্য অপূর্ব ও স্বতন্ত্র। বাঙ্গালার বাদ্যভাণ্ডের মধ্যে খুব বিশিষ্টতা প্রকট হইয়া আছে। বাঙ্গলার কবিওয়ালাদের ঢোল বাজান অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ। এমন ভাবে ঢোল বাজাইতে ভারতবর্ষের আর কোন জাতি পারে না। বাঙ্গালীর গৃহনির্মাণপদ্ধতিও স্বতন্ত্র। এমন ঘর ছাইতে ভারতবর্ষের, বুঝি বা পৃথিবীর, আর কোন জাতিতে পারে না। বাঙ্গালার আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপ-সকল সত্যই বিদেশীয়ের বিস্ময় উৎপাদন করিত; তেমনটি পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না, নাইও। বাঙ্গালার 'পঙ্খের কাজ' বাঙ্গালীর নিজস্ব; উহা বাঙ্গালার বাহিরে ছিলনা, নাইও। এখন সে 'পঙ্খশিল্পের' নমুনা গবর্ণমেণ্ট হাউসের গোটাকয়েক স্তম্ভে বিদ্যমান রহিয়াছে। এমন কি, বাঙ্গালার জনার্দন, বিশ্বম্ভর, জনমেজয় প্রভৃতি কর্মকারগণ যেমন তোপ কামান তৈয়ার করিতে পারিত, দিল্লীর কারিগরে তেমনটি পারিত না। বাঙ্গালার 'ষাট বৈঠার ছিপে' চড়িয়া মীর কাসেম এক রাত্রে গোদাগিরি হইতে মুঙ্গেরে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার আর একটা শিল্প ছিল—কুসুম-শিল্প। নানা পুষ্পের আভরণ ও অলঙ্কার বাঙ্গালী যেমন তৈয়ার করিতে পারিত, এমন আর কোন জাতি পারিত না। আওরঙ্গজেব-পুত্র যুবরাজ মহম্মদ পিতাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—"কি আর মণিমুক্তা, চুনি পান্নার লোভ দেখাও পিতঃ—বাঙ্গলার কুসুমাভরণ দিল্লীর জড়োয়া অলঙ্কারসকলকে হেলায় পরাজয় করে। এমনটি তুমি দেখ নাই।" সে শিল্প লোপ পাইয়াছে।

বাঙ্গালীর স্বতন্ত্র জাতি

আসল কথাটা কি জান, বাঙ্গালী আর্যাবর্তের আর্যগণ হইতে একটা সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। বৈদিক যুগের সময় হইতে বাঙ্গালায় এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও মনুষ্যসমাজ বিদ্যমান ছিল। প্রাচ্যের সে সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বাঙ্গালায় বৈদিক ধর্ম, সভ্যতা আচার ব্যবহার, শিকড় গাড়িয়া বসিতে পারে নাই। যুগে যুগে, বারে বারে পশ্চিম দেশ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আমদানি করিয়াও বাঙ্গালায় যাগ যজ্ঞাদির তেমন প্রচলন হয় নাই। এত আক্রমণেও বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতি স্বীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। উপরন্তু আগন্তুকগণকে বাঙ্গালার বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করিতে পারিয়াছিল। স্বীকার করি বটে যে, বাঙ্গালী আর্যাবর্ত হইতে, আর্যগণের নিকট হইতে অনেক তথ্য, অনেক সিদ্ধান্ত, অনেক বিদ্যা সংগ্রহ করিয়াছিল; কিন্তু সে

সকলকে বাঙ্গালীর মনীষা যেন বাঙ্গালার কোমল পেলব পলিমাটির আবরণ দিয়া এতই মধুর, এতই স্নিগ্ধ, এমনই রসাল করিয়াছিল যে, পরে উহা আর্যাবর্ত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদাবলীর অনেকটা অংশ হিন্দুস্থানী কবি ও ভক্ত সুরদাস ও শ্যামদাসের অনুবাদ বলিলেও চলে; পরন্তু বাঙ্গালী মহাজন সে সকল ভাবের গানে এমন 'আখর' এমন স্ফুটোক্তি বসাইয়াছেন যে, কেবল তজ্জন্যই বাঙ্গালীর পদাবলী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং উপাদেয় হইয়াছে। বাঙ্গালী আর্যাবর্তের অনুগামী হয় নাই বলিয়া মনে হয়, আর্যাবর্তের পণ্ডিতগণ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে তীর্থযাত্রা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে যাইয়া বাস করিলে 'পুনঃ সংস্কারমর্হতি'! কেন না, বাঙ্গালায় দীর্ঘকাল বাস করিলে সোমরসপায়ী গোঘ্ন আর্যগণের জাতিনাশ ঘটিত, তাহাদের বিশিষ্টতা নষ্ট হইত।

বাঙ্গালায় জৈনধর্মের প্রথম বিকাশ হইয়াছিল, এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবেনা। মহাবীর রাজমহলের কাছে কোন গ্রামে ভূমিষ্ঠ হইয়া, জীবনের অর্ধেকটা কাল বর্ধমান বিভাগে বা রাঢ় দেশে কাটাইয়াছিলে; বাসুপূজ্য উত্তর রাঢ়ে ও ভাগলপুর জেলার পূর্বাংশে জৈন ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই জৈন ধর্ম বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার পুষ্টি পক্ষে অনেকটা সহায়তা করিয়াছিল। গোরক্ষনাথের 'নাথীধর্ম' বাঙ্গলার উত্তররাঢ়ে খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল। এক পক্ষে জৈন তীর্থঙ্করগণ, অন্যপক্ষে গোরক্ষনাথের যোগী শিষ্যগণ বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার পুষ্টি পক্ষে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। আবার বলিব, বাঙ্গালী যজ্ঞবিলাসী, পশুবধে পটু সোমপায়ী আর্য নহেন, বাঙ্গালারই কপিল কণাদ, বাঙ্গালাই অহিংসা পরম ধর্মের বেদী, বাঙ্গালাই জৈনাচার্যগণের লীলাক্ষেত্র, বাঙ্গালায় সিদ্ধাচার্যগণের প্রভাব এখনও ধর্ম-কর্মে, আচার-ব্যবহারে পরিস্ফুট। চিনিতে জানি না, চিনিতে পারিনা, চিনিতে ভুলিয়াছি বলিয়া বাঙ্গালীর ধর্ম-কর্ম সাধনতন্ত্র, ভাবের ভাষা, রসের ভাষা প্রভৃতি সব ভুলিয়াছি। আমরা বাঙ্গালার শ্লাঘায় আর শ্লাঘাবোধ করিনা। একবার তাকাও—মালঞ্চ-বেষ্টনী পরিবৃত বাঙ্গালীর নিজ নিকেতনের প্রতি সস্নেহে একবার তাকাও, জাতির অতীত ইতিহাসের মুকুরে স্বদেহের স্বীয় সমাজ-শরীরের প্রতিবিম্ব দেখিয়া অধঃপতনের গভীরতা একবার বুঝিয়া লও! তাহা হইলে আবার যেমন ছিলে তেমনই হইবে, হারানিধি ফিরাইয়া পাইবে, তোমাদের শ্যামা জন্মভূমি তোমাদেরই হইবে।

'বঙ্গবাণী'। ১৩২৯ ভাদ্র

বঙ্গলিপির আদিকথা

দীনেশচন্দ্র সেন

১৮৬৬ - ১৯৩৯

আর্যাবর্তবাসীদিগের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অক্ষর ব্রাহ্মীলিপি নামে অভিহিত। ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। অশোকের অনুশাসনে যে অক্ষর দৃষ্ট হয়, তাহা ব্রাহ্মীলিপির এক বিশেষ পরিণত অবস্থা সূচিত করিতেছে। সুতরাং মৌর্য-যুগের বহু পূর্বে যে এই লিপির প্রচলন ছিল, তৎসম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। কেবল অশোক-অনুশাসন হইতেই স্থানভেদে মৌর্যাক্ষরের ৩।৪টি বিভিন্ন শাখার পরিচয় পাওয়া যায়, ইহা হইতে সহজেই অনুমেয় যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে লিপিগত বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হইত। মৌর্যযুগের পরে কুশানযুগে ভারতীয় লিপির অনেক পরিবর্তন হয়। লিপিকার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে গুপ্তযুগের প্রভাব সামান্য নহে; গুপ্তরাজগণের প্রাদুর্ভাবকালে খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে দক্ষিণ পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে তিনটি বিভিন্ন লিপিভাগের প্রচলন ছিল। এতদ্ব্যতীত মধ্য-এশিয়া হইতেও গুপ্তলিপির এক স্বতন্ত্র ধারায় নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে কাশগড় হইতে আবিষ্কৃত সুপ্রসিদ্ধ বাওয়ার পুঁথির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুপ্তযুগে উত্তর-ভারতের পূর্বাংশে যে লিপি ব্যবহৃত হইত, কালক্রমে তাহা নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান বঙ্গাক্ষরের রূপ ধারণ করিয়াছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ হইতে পূর্বদেশীয় লিপির প্রভাব ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে—ইহার প্রমাণ সমসাময়িক বহু অনুশাসন হইতে পাওয়া গিয়াছে কিন্তু বাঙ্গালায় ইহার পূর্ণপরিণতি লাভ হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বঙ্গলিপির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় পুস্তকে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এতৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে পূর্বাক্ষরও দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যায়,—প্রতীচ্য ও প্রাচ্য। প্রতীচ্য অক্ষর ক্রমশঃ নাগরীর সহিত মিশিয়া বিবিধ প্রাদেশিক লিপির সৃষ্টি করিল, প্রাচ্য অক্ষর নাগরীর প্রভাব হইতে অনেকটা মুক্ত থাকিয়া নিজ স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিল। ইহার ঐতিহাসিক ধারা বঙ্গলিপির ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে পরিস্ফুট রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক বুহ্‌লর সাহেবের মতে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্বভারতীয় নাগরী লিপি

হইতে ক্রমশঃ বঙ্গাক্ষরের সৃষ্টি হয়, কিন্তু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মত খণ্ডন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বঙ্গাক্ষরের প্রাচীনতম রূপ খুঁজিতে গিয়া প্রথমেই এলাহাবাদ স্তম্ভে উৎকীর্ণ হরিষেণ রচিত সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গুপ্তযুগের প্রথমভাগে প্রাচ্য অক্ষরের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহার পরিচয় এই লিপিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতদিগের মতে গুপ্তকালের ইহাই প্রাচীনতম অনুশাসন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে এই প্রাচ্য অক্ষর হইতেই আমাদের বঙ্গলিপির উৎপত্তি। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পর্বতগাত্রে মহারাজ চন্দ্রবর্মার একখানি শিলালিপির আবিষ্কার করিয়াছেন। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্ত বিজিত আর্যাবর্তের রাজাদিগের মধ্যে চন্দ্রবর্মা নামধেয় এক নৃপতির নাম পাওয়া যায়। এই চন্দ্রবর্মা ও শুশুনিয়া শিলালিপির মহারাজ চন্দ্রবর্মা যদি একই ব্যক্তি হইয়া থাকেন, তবে শেষোক্ত শিলালিপি নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর কোন সময়ে খোদিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহা হরিষেণ প্রশস্তি হইতেও প্রাচীন। বাঙ্গালার এতদপেক্ষা প্রাচীন লিপি অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ধানাইদহ ও দিনাজপুর জেলাস্থ দামোদরপুর গ্রাম হইতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের কয়েকখানি তাম্র-শাসন পাওয়া গিয়াছে। এই লিপিগুলি হইতে গুপ্তরাজগণের সময়ের বঙ্গদেশে ব্যবহৃত প্রাচ্য অক্ষরের নমুনা দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মগধের রাজা আদিত্যসেনের সাহপুর ও আফসড় অনুশাসন হইতে আরম্ভ করিয়া পালরাজগণের লেখমালায় এই প্রাচ্যলিপির ক্রমোন্নতির ইতিহাস খোদিত আছে। কাশীখণ্ড পুঁথি ১০০৮ খৃষ্টাব্দে লেখা। তৎপরবর্তী যুগের বঙ্গীয় লিপিকলার ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে, সেন রাজগণের তাম্রশাসন, কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত কয়েকটি প্রাচীন পুঁথি, অশোকচল্লের গয়া-অনুশাসন, ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত নেপাল হইতে প্রাপ্ত বোধিচর্যাবতারের পুঁথি এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থশালায় রক্ষিত চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপরই আমাদের প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইবে। কেম্‌ব্রিজ নগরে যে পুঁথিগুলি রক্ষিত হইয়াছে, সেগুলি ১১৯৮-১২০০ খৃষ্টাব্দের বঙ্গাক্ষরে লিখিত। শ্রীগয়াকর নামক এক ব্যক্তি বৌদ্ধতন্ত্র সম্বন্ধীয় এই পুঁথি তিনটি নকল করিয়াছিলেন, ইহাদের একখানিতে মগধের পালবংশের শেষ রাজা গোবিন্দপালদেবের রাজ্যবিনাশের প্রসঙ্গ আছে, এই পুঁথিখানি নেপাল হইতে সংগৃহীত। সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে কতকগুলি

হস্তলিখিত পুঁথি আছে; সেগুলিও বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের প্রথম শতাব্দীতে লিখিত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপ-সেনের তাম্রশাসনের অনেক স্থলে ঠিক আধুনিক বাঙ্গালা লিপির মত অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং অপরাপর স্থলে লিপিও বঙ্গাক্ষরেরই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন রূপ। উৎকলরাজ দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের (১২৯৫) খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার অক্ষরের সহিত প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই।

১১৭০ (৫১ লসং) খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ অশোকচল্ল মহারাজের শিলালিপি (বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত) এবং চট্টগ্রাম হইতে প্রাপ্ত ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে দামোদর রাজার প্রদত্ত তাম্রশাসনে আমাদের চিরপরিচিত বঙ্গাক্ষরের প্রাচীনরূপ বিদ্যমান।

গুপ্তবংশের অবনতির পর 'গুপ্তলিপি'র প্রতীচ্য শাখা হইতে কাশ্মীর পাঞ্জাবের উত্তর পার্শ্বে 'সারদা' অক্ষরের উদ্ভব হইল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষে 'সারদা' ব্যবহৃত হইতে লাগিল। 'সারদা' অক্ষর হইতে বর্তমান 'কাশ্মীরী' 'গুরুমুখী' ও 'সিন্ধী' অক্ষরের উৎপত্তি। বর্তমান সময়েও 'কাঙ্গারা' ও তন্নিকটবর্তী উপত্যকার অধিবাসীরা যে অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকে, গুপ্তলিপির সহিত তাহার অনেকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই যুগে প্রচলিত মধ্য-ভারতীয় লিপি হইতে কালক্রমে বর্তমান নাগরী এবং দক্ষিণ পাঞ্জাব ও রাজপুতনার অক্ষর উদ্ভুত হয়। মধ্যযুগে আর্যাবর্তের কোন কোন স্থানে যে শ্রেণীর প্রাচ্য অক্ষর প্রচলিত ছিল, প্রিন্সেপ ফ্লিট প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ তাহাকে 'কুটিল' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কিলহর্ন সাহেব এই নামের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি স্বীকার করেন নাই। উড়িয়া লিপি ও বঙ্গীয় লিপি অনেকটা এই প্রকারের। প্রভেদ এই যে, উড়িয়া অক্ষরগুলির মাত্রা গোলাকার। উৎকলবাসিগণ তাল-পত্রের উপর 'খুন্তি' নামক লৌহ-সূচী দ্বারা লিখিতেন; সূক্ষ্মাগ্র খুন্তির দ্বারা অক্ষরের শিরোভাগে সরল রেখার ন্যায় মাত্রা টানিতে গেলে তালপত্র ছিন্ন হইয়া যাইত, এইজন্য তাঁহারা গোলাকৃতি মাত্রা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালা দেশে কঞ্চির কলমের অগ্রভাগ তির্যকভাবে কাটা হইত, এইরূপ লেখনী দ্বারা প্রাচীন বর্ণমালার বৃত্তাকার অক্ষরগুলি অঙ্কিত করা সুকঠিন; কলমের টানে অক্ষরের কোণগুলি পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠে, এবং অতি সহজে ও অনায়াসে সরলরেখার মাত্রা টানা যায়; বলা বাহুল্য, কুটিলাক্ষরের শ্রেণীভুক্ত বঙ্গলিপির ইহাই বিশেষত্ব।

আসামী অক্ষর বঙ্গাক্ষরেরই প্রকারভেদ মাত্র, ইহাতে কয়েকটি অপ্রচলিত পুরাতন বাঙ্গালা ও মৈথিল অক্ষর রহিয়াছে। প্রাচীন মৈথিল ও প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের প্রভেদ অতি সামান্য ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে লিখিত বাঙ্গালা ও মৈথিল পুঁথির হস্তাক্ষর দেখিয়া সকলে উভয়ের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিবেন না। বর্তমান মৈথিল অক্ষর বাঙ্গালা দেবনাগরীর মধ্যবর্তী। নেপালীদিগের অক্ষরে এখনও প্রাচীন মৈথিল অক্ষরের ছাঁদ অনেকটা বিদ্যমান। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর নেপালী অক্ষরের সহিত সমসাময়িক বঙ্গাক্ষরের বিশেষ সাদৃশ্য বর্তমান।

বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধ প্রচারকগণ এসিয়ার নানা স্থানে ধর্মপ্রচারের জন্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এখনও জাপানের বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসকল দশম কিংবা একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত বঙ্গাক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে; এই অক্ষর তদ্দেশবাসী পুরোহিতগণের নিকট অতি পবিত্র। জাপানের হরিয়ুজি মন্দিরে 'উষ্ণীষ-বিজয়ধারিণী' নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থ রক্ষিত আছে। উহা সেই মন্দিরের পুরোহিতগণ পূজা করিয়া থাকেন। এই পুস্তকখানি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রচলিত মগধাক্ষরে লিখিত, তাহা সেই সময়ের বঙ্গাক্ষর হইতে ভিন্ন নহে। ইহার একখানি প্রতিলিপি অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি সংগ্রহ করিয়া অ্যানেকডোটা অক্সিনিয়েন্সিস্ (Anecdota Oxiniensis) গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছেন। অকালে পরলোকগত জাপানী যুবক এস. টি. হোরি আমাকে জাপানী পুরোহিতগণের লিখিত অক্ষরের নমুনা দেখাইয়াছিলেন, তাহা একাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরের অনুরূপ।

বঙ্গাক্ষর যেরূপ বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, বঙ্গভাষাও সেইরূপ সুদীর্ঘকাল হইতে নানারূপ পরিবর্তন ও বিবিধ দেশজ ভাষার মিশ্রণজনিত রূপান্তর গ্রহণ করিয়া বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। আর্যগণ যে সময়ে এদেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই এই পরিবর্তনের সূচনা, ক্রমশঃ বঙ্গবাসী আর্যগণের কথিত গৌড়ীয় ভাষা অন্যান্য ভাষা হইতে পৃথক হইয়া দেশজ্ঞাপক স্বতন্ত্র আখ্যা গ্রহণ করিল। কিন্তু কোন্ সময়ে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কে বলিবে? আদি দেখিবার ঔৎসুক্য আমাদের নাই; প্রকৃতিও সৃষ্টির প্রথম কাহিনী যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন; আদি বৃত্তান্তের চির রহস্যভেদে বিজ্ঞান অসমর্থ। মনুষ্য জাতি যত প্রাচীন, ভাষাও তত প্রাচীন। মনুষ্যভাষার যে সর্বপ্রাচীন, অমর নিদর্শন রহিয়াছে, ভঙ্গভাষার আদিরূপ অন্বেষণ করিতে

গেলে, সেই বেদকেই অবলম্বন করিতে হইবে। যদি ললিতবিস্তরের প্রমাণ গণ্য করা যায়, তবে ২২০০ বৎসর পূর্বেও বঙ্গাক্ষর প্রচলিত ছিল। তখনও নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি হয় নাই অথবা কোনও লিপি নাগরী নামাঙ্কিত হয় নাই।

আন্তর্জাতির প্রথম ভাষা বেদ, তাহার পর রামায়ণাদির সংস্কৃত এবং বৌদ্ধদিগের পালি ও গাথা প্রভৃতি প্রাকৃত ; তৃতীয় স্তরে, বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি গৌড়ীয় ভাষাসমূহ। এস্থলে শুধু লিখিত ভাষার কথাই বলা হইতেছে। বঙ্গভাষার উৎপত্তিকালের নির্দেশ সুসাধ্য নহে ; আমরা ইহার লিখিত ভাষার পরিণতির কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

বোধ হয়, যে ভাষায় আদিম হিন্দুগণ কথা কহিতেন, বেদে ঠিক সেইরূপ ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরে ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের চেষ্টা ও ব্যাকরণের সূত্রপাত হইতে কথিত ও লিখিত ভাষা স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই, রামায়ণের ভাষা ঠিক কথিত ভাষা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যখন কালিদাস 'বালেন্দুবক্র পলাশ-পর্ণে'র বর্ণনা করিতেছিলেন, অথবা জয়দেব 'মদন-মহীপতি'র 'কনক-দন্ত-রুচি কেশর কুসুমে'র কথা লিখিতেছিলেন তখন তাঁহারা সে ভাষার কথা কহেন নাই। এখনও বঙ্গের কত কবিমুখে 'বিদ্যুৎ' কি 'মেঘের ডাক' বলিয়া লেখনী দ্বারা 'ইরম্মদ' বা 'জীমূতমন্দ্রে'র সৃষ্টি করিতেছেন। তাই বলিতেছিলাম, লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে একটা প্রভেদ আছে এবং চিরদিনই থাকিবে।

লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষার মধ্যে একটা ব্যবধান বর্তমান, কিন্তু সে ব্যবধানের একটা সীমা আছে, তাহা অতিক্রম করিলে লিখিত ভাষা মৃত হইয়া পড়ে ও তৎস্থলে কথিত ভাষা একটু বিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হয়। লিখিত ভাষা উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। ক্রমশঃ বাক্যপল্লবের প্রতি স্পৃহা ও শব্দের শ্রীবৃদ্ধি চেষ্টার ফলে লিখিত ভাষা জনসাধারণের অনধিগম্য হইয়া পড়ে ; তখন ভাষা-বিপ্লবের প্রয়োজন হয়। যখন বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার সেইরূপ প্রভেদ জন্মিল, তখন কথিত পালিভাষা কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষা হইয়া দাঁড়াইল ; যখন পুনশ্চ প্রাকৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ অধিক হইল তখন বর্তমান গৌড়ীয় ভাষাগুলি কিঞ্চিৎ পরিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হইল। ব্যাকরণ, শিশু ও অকৃতির বাক্‌চেষ্টার শাসন করে ; কিন্তু তাই বলিয়া উহা চির-প্রবাহশীল ভাষার গতি স্থির রাখিতে পারে না।

ব্যাকরণ অগ্রাহ্য করিয়া ভাষা রূপান্তর গ্রহণ করে। ব্যাকরণ যুগে যুগে ভাষার পদাঙ্কস্বরূপ পড়িয়া থাকে। ভাষা যে পথে বহিয়া যায়, ব্যাকরণ সেই পথের সাক্ষী মাত্র। বিলুপ্ত মাহেশ ব্যাকরণের পর পাণিনি ; তৎপর কাত্যায়ন-বার্তিকাকার বররুচি, যাস্ক ; ইহাদের পর রূপসিদ্ধি, লঙ্কেশ্বপ, শাকল্য, তরত, কোহল ; ভামহ, বসন্তরাজ, মার্কণ্ডেয়, ক্রমদীশ্বর, মৌদ্গলায়ন শিলাবংশ—ইহারা ব্যাকরণ রচনা করেন। পূর্ববর্তী যুগে যাহা ভাষার দোষ বলিয়া কীর্তিত পরবর্তী যুগের ব্যাকরণে তাহাই ভাষার নিয়ম বলিয়া স্বীকৃত। তাই পাণিনির নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াও 'মহাবংশ' ও 'ললিতবিস্তর' শুদ্ধ বলিয়া গণ্য, এবং বররুচির নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াও চাঁদ কবির গাথা কি 'চৈতন্যচরিতামৃত' নিন্দনীয় হয় নাই। সময় সম্বন্ধে যেরূপ প্রাতঃ সন্ধ্যা রাত্রি,—ভাষা সম্বন্ধেও তদ্রূপ—সংস্কৃত প্রাকৃত বাঙ্গালা বা হিন্দী ; পূর্ববর্তী অবস্থার রূপান্তর। বঙ্গভাষা আমরা এখন যেরূপ বলি, তাহার মুখ্য চিহ্নগুলি কোন্ সময়ে গঠিত হইয়াছিল, তাহার নিরূপণ সহজ নহে। বঙ্গভাষা, জননীর গর্ভ হইতে শিশুর ন্যায় কোন শুভ লগ্নে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। বহুদিন হইতে ক্রমে ক্রমে ইহার বর্তমান রূপ গঠিত হইতেছিল। কথিত ভাষা, ব্যাকরণশাসিত 'লিখিত' প্রাকৃত হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়িল—কিন্তু এক দিনে নহে। বৌদ্ধ-শক্তির পরাভবে, হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে ; হিন্দুজাতির নব চেষ্টার স্ফুরণে ও সংস্কৃতের নববিকাশে ; সেই পরিবর্তন এত দ্রুত হইল—প্রাকৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ এত বেশী হইল যে, প্রাচীন ভাষাকে বিদায় দিয়া, কথিত গৌড়ীয় ভাষাগুলিকে লিখিত ভাষার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইল।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ

বাঙালী-পেট্রিয়টিজম্

প্রমথ চৌধুরী

১৮৬৮ - ১৯৪৬

আজ বিজয়া। এই শুভদিনের শুভকামনা জানিয়ে এই পত্র আরম্ভ করছি। আজকের দিনে আত্মীয়স্বজনের বন্ধুবান্ধবের শুভকামনা করাটা আমাদের মধ্যে অবশ্য একটা সামাজিক প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন ইংলণ্ডে নূতন বৎসরের প্রথম দিনে পাঁচজনকে অন্তরের শুভকামনা জানানোটা হচ্ছে সে দেশের ভদ্র-সমাজের একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, তেমনি এ দেশেও পাঁচজনকে বিজয়ার হয় প্রণাম নয় আশীর্বাদ জানানো সর্বসাধারণের মধ্যে একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম।

তবে এ উভয় প্রথা মামুলী হলেও এ দুয়ের ভিতর একটু প্রভেদ আছে। বিজয়ার সঙ্গে আমাদের ধর্মের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, পয়লা জানুয়ারির সঙ্গে খৃস্টধর্মের কোনোরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধ আছে বলে তো জানি নে ; যদি থাকে তো সে এত দূরসম্পর্ক যে, তা না থাকারই শামিল। ফলে এই বিজয়ার দিনে আমরা পরস্পরের যে শুভকামনা করি তার ভিতর শুধু ভদ্রতা নয়, আন্তরিকতাও থাকে।

আমি এ কথা স্বীকার করতে মোটেই কুণ্ঠিত নই যে, আমার পক্ষে এ দিন তিন-শ-পঁয়ষট্টির ভিতর একটা দিন নয়, কিন্তু তিন-শ-চৌষট্টি ছাড়া আর-একটা দিন ; অর্থাৎ এদিনে অকারণে মনের ভিতর আশা ও আনন্দ যেমন সজাগ হয়ে ওঠে, বৎসরের অপর কোনো দিনে সকারণেও ঠিক তেমনটি হয়না। এই একটি মাত্র দিনেই আমরা বাঙালীরা বিশেষ ক'রে নিজের অন্তরে একটা জাতীয় আনন্দের আস্বাদ পাই।

এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ভুলে যেয়ো না যে আমি একে বাঙালী, তার উপর আবার শাক্ত ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি। বালককাল হতে সাবালক হওয়া পর্যন্ত বছরের পর বছর দুর্গোৎসবই ছিল আমার কাছে বৎসরের সব-চাইতে বড় উৎসব। ধূপ দীপ শঙ্খ ঘণ্টা পুষ্প চন্দন অর্ঘ্য নৈবেদ্য এই সকলের বর্ণ গন্ধ ও শব্দের সংশ্রবে শৈশবে বাল্যে ও কৈশোরে আমার সকল ইন্দ্রিয় যুগপৎ তুষ্ট ও পুষ্ট হয়েছে। এর থেকে মনে ভেবোনা যে দুর্গোৎসবের সঙ্গে আমার শুধু ইন্দ্রিয়েরই সম্পর্ক ছিল, মনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়ের রাজ্য কোথায় শেষ হয় আর মনের রাজ্য কোথায় আরম্ভ হয় তার পাকা সীমানা

আজও কেউ নির্ধারণ ক'রে দিতে পারেন নি। দ্বিতীয়তঃ, ভক্তি জিনিসটে হচ্ছে সংক্রামক, বিশেষতঃ অর্বাচীনের মনের পক্ষে। স্থতরাং তুমি ধরে নিতে পার যে, দুর্গাপ্রতিমার প্রতি আমার মনেরও ভক্তি ছিল। ভক্তি যে ছিল তার প্রমাণ, আমি আরতির সময় মাটির প্রতিমার মুখে হাসি দেখেছি। হাসি কথাটা বোধ হয় ঠিক হল না, সেকালের প্রতিমার মুখের যে ভাব আমাদের চোখে পড়ত সে ভাব হচ্ছে প্রসন্ন-করুণ।

দেবগণ কর্তৃক দেবীর স্তবের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

কেনোপমা ভবতি তেঽস্য পরাক্রমস্য,
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্যাতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
তয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥

আমরা দেবীর দৃষ্টিতে যার সাক্ষাৎপরিচয় পেয়েছি সে 'সমরনিষ্ঠুরতা'র নয়, চিত্তকৃপার।

আমার এ কথা শুনে তুমি যা উত্তর দেবে তা জানি। তুমি বলবে, ওসব illusion আর delusion। অবশ্য তাই। কিন্তু এ সত্যটিও মনে রেখো যে illusion আর delusion থেকে আমরা কেউ মুক্ত নই। সারাজীবন এই দুটিকে নিয়েই আমরা ঘর করি, এক রকম delusionএর হাত থেকে মুক্তিলাভ করে আর-এক রকম delusionএর বশীভূত হই। এক ঠাকুরকে বিসর্জন দিয়ে আর-এক ঠাকুরের পুজো করতে শুরু করি। তা ছাড়া যে সকল ভুলবিশ্বাস আমাদের মন থেকে চলে যায়, মনের উপর সেসকল তাদের ছায়া আলো দুই রেখে যায়, স্মৃতি আজীবন তার জের টেনে চলে। আমরা যাকে মন বলি তার ভিতর কাটা-ছাঁটা হীরকখণ্ডের মত নিরেট কঠিন জলজলে সত্য খুব অল্পই আছে, তার বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে বসে আছে যত অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট ভাব। আর আমাদের মতামত কার্যকলাপের উপর এইসকল অস্পষ্ট মনোভাবের প্রভাব বড় কম নয় এবং সে প্রভাবকে দূর করা কঠিন, কারণ তা অলক্ষিত। আমার এসব কথা শুনে ভয় পেয়ো না যে আমি আবার কেঁচে পৌত্তলিক হতে যাচ্ছি। আমার চিরজীবনের শিক্ষা সে ফেরবার পথে কাঁটা দিয়েছে। ইতিমধ্যে আমার মন তিন বিদেশের—ইংলণ্ড ফ্রান্স ও ইতালীর—বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের হাতে ধোলাই হয়েছে। তা ছাড়া আমাদের মনের পক্ষে কালাপানি পার হবারও কোনোই দরকার নেই, স্বদেশের মনোজগতে কিঞ্চিৎ পিছু হঠলেই এমন

জায়গায় পৌঁছানো যায়, যেখানে যাবামাত্র আমাদের প্রতিমাভক্তি উড়ে যায়। 'ন প্রতিকে ন হিংস' এ সূত্র তো বেদান্তেই আছে। আর বলা বাহুল্য যে, এযুগে আমরা বৈদান্তিক, অর্থাৎ আমরা ধর্ম মানি, কিন্তু কোনো ধর্মই মানি নে।

আমার মনের কথা তোমাকে এতটা খুলে বলবার উদ্দেশ্য এই সত্যটা স্পষ্ট করা যে, আমার পুঁথিপড়া মন সংস্কৃত-বিলেতী হলেও তার নীচে যে মন আছে তা মূলতঃ বাঙালী। বাঙালী হিন্দুর মনের ধর্মের পরিচয় নিতে হলে বাঙালীর চিরাগত ধর্মের পরিচয় নিতে হয়। তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, বাংলা ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথাও দুর্গোৎসব জাতীয়-উৎসব নয়। এ বিষয়ে আমার শেষ কথা এই যে, আমাদের পারিবারিক ও সেইসঙ্গে আমাদের সামাজিক ধর্ম আমাদের মনের ঘরে যে রূপ রস গন্ধ ও তেজ সঞ্চিত রেখে গিয়েছে তার জন্য আমি মোটেই দুঃখিত নই। ষোড়শোপচারে এই মূর্তিপূজার প্রসাদেই বাঙালী-জাতির মনের poetic এবং aesthetic অংশ গড়ে উঠেছে। কোনো ধর্মবিশ্বাস মানুষের মন থেকে চলে গেলেও তার রূপটুকু তার সৌরভটুকু সেখানে রেখে যায়। এটা কখনো লক্ষ্য করেছ যে, দর্শনবিজ্ঞানের আক্রমণে ধর্ম কখনো মারা যায় না, হয় শুধু রূপান্তরিত? কোনো বিশেষ ধর্মমতকে যখন আর সত্য বলে বিশ্বাস করা চলে না, তখন বৈষয়িক লোকের কাছে তা শিব ব'লে গ্রাহ্য হয়, আর অবৈষয়িক লোকের কাছে সুন্দর ব'লে। রবীন্দ্রনাথ পৌত্তলিক ধর্মের আবহাওয়ায় মানুষ হন নি, অথচ তাঁর কবিতা আদ্যোপান্ত ধূপবাসিত, দীপালোকিত, পুষ্পচন্দনে সুরভিত, শঙ্খঘণ্টায় মুখরিত। এই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, যার পারিবারিক ধর্ম যাই হোক না কেন, বাঙালীর জাতীয়-পূজার প্রভাব বাঙালীর সৌন্দর্যজ্ঞানকে পরিচ্ছিন্ন করেছে, বাঙালীর হৃদয়বৃত্তিকে পরিপুষ্ট করেছে।

তুমি মনে ভাবতে পার যে, আমি এ উৎসবের একটি কলঙ্কের কথা, বলি-দানের কথা, চেপে গিয়েছি। ধর্মের নামে পশুহত্যা আমরা ছাড়া ভারতবর্ষের অপর কোনো সভ্যজাতি করে না। আর এ হত্যা যেমন অনর্থক তেমনি বর্বর, আজিকের দিনে কোনো শিক্ষিত বাঙালী তা স্বীকার করতে তিলমাত্র দ্বিধা করবেন না। নিরীহ ছাগশিশুকে হাড়কাঠে ফেলে বলি দিয়ে যাঁরা মনে করেন যে তাঁরা 'সমরনিষ্ঠুরতা'র অভিনয় করেছেন, তাঁদের পৌরুষের বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছে যায়। তাঁদের বীরত্ব প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে পলিটিক্সের বাকযুদ্ধ। হত্যাকে ধর্ম বলতে আমরা অবশ্য কেউ প্রস্তুত নই। তবে সত্যের

খাতিরে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, যারা বৈদিক তান্ত্রিক সমাজে মানুষ হয়েছে সেসকল বাঙালীর পক্ষে জবাফুল চক্ষুশূল নয়, আর রক্তচন্দনের ফোঁটায় তাদের কপালও চড়চড় করে না। এ জ্ঞান তাদের আছে যে, মানুষের জীবনরাগিণীতে কড়ি ও কোমল দুই রকম স্বরই সমান লাগে। এই রাজসিক পূজা আমাদের মনকে সকল প্রকার রাজসিক ধর্মের প্রতি অনুকূল করেছে। তা সে ধর্ম সাহিত্যেরই হোক আর সমাজেরই হোক। এই লম্বা বক্তৃতার উদ্দেশ্য তোমাকে বোঝানো যে, আমার ঐ বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ শূন্যগর্ভ নয়; অস্পষ্ট আশার স্পর্শে তা মুকুলিত, অহৈতুকী আনন্দের বর্ণে তা রঞ্জিত।

২

এই সূত্রে এই সুযোগে আমি তোমার কাছে আমার সাহিত্যিক ঋণ পরিশোধ করতে চাই। তোমার কাছে আমার বকেয়া কৈফিয়তটি আজ সুদশুদ্ধ শুধে দেবার জন্যে কৃতসংকল্প হয়েছি। অমৃতশহর কন্‌গ্রেসের পিঠ-পিঠ তুমি আমাকে যে চিঠি লেখ, আর উত্তর আমি দিই নি; কেননা উত্তর যে কি দেব তা তখন ভেবে পাই নি। তুমি আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আন যে, আমার অন্তরে যা আছে সে হচ্ছে বাঙালী-পেট্রিয়টিজ্‌ম্। এ অভিযোগ আমি কবুল জবাব দিতে বাধ্য। বাঙালী-পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌কে মনে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়াটা বাঙালীর পক্ষে যদি দোষের হয় তা হলে সে দোষে চিরদিনই দোষী আছি। আমার গত আট বৎসরের লেখার ভিতর এ অপরাধের এত প্রমাণ আছে যে, সেসকল একত্র সংগ্রহ করলে একখানি নাতিহ্রস্ব পুস্তিকা হয়ে ওঠে!

তবে জিজ্ঞাসা করি, একজন বাংলা লেখকের কাছ থেকে তুমি আর কোন্ পেট্রিয়টিজ্‌মের প্রত্যাশা কর। আমি যে ইংরেজী লিখি নে তার থেকেই বোঝা উচিত যে অ-বঙ্গ পেট্রিয়টিজ্‌ম্ আমার মনের উপর একাধিপত্য করে না। যে ভাষা ভারতবর্ষের কোনো দেশেরই ভাষা নয়, সেই ভাষাকে সমগ্র ভারতবর্ষের ভাষা গণ্য ক'রে সেই ভাষাতে পেট্রিয়টিক বক্তৃতা করতে হলে আমি সেই পেট্রিয়টিজ্‌মের বাহানা করতে বাধ্য হতুম যে, দেশপ্রীতি ভারতবর্ষের কোনো দেশের প্রতি ভালোবাসা নয়, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি। মুখস্থ ভাষায় শুধু মুখস্থ ভাবই প্রকাশ করা যায়।

তার প্রমাণ আমাদের কন্‌ফারেন্স কন্‌গ্রেসে নিত্যই পাওয়া যায়, দেশের যত মুখস্থবাগীশ ওসকল সভায় তাঁরাই হচ্ছেন যুগপৎ নায়ক ও গায়ক। সে

যাই হোক, কোনোরূপ ভালোবাসার কৈফিয়ত চাওয়াও যেমন অন্যায় দেওয়াও তেমনি শক্ত, তা সে অনুরাগের পাত্র ব্যক্তিবিশেষই হোক জাতিবিশেষই হোক। এ ক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে, আমরা যাকে স্বদেশপ্রীতি বলি আসলে তা স্বজাতিপ্রতি। দেশকে ভালোবাসার অর্থ দেশবাসীকে ভালোবাসা—কেননা মানুষে শুধু মানুষকেই ভালোবাসে। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি মানুষকে নয় মাটিকে ভালোবাসেন, তা হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে তিনি মানুষ নন—জড়পদার্থ; কেননা জড়ের প্রতি জড়ের যে একটা নৈসর্গিক ও অন্ধ আকর্ষণ আছে, এ সত্য বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে।

যাক ওসব অবান্তর কথা। আসল কথা এই যে, স্বজাতিপ্রীতির কৈফিয়ত কারো কাছে চাওয়া অন্যায়, কারণ ও হচ্ছে মনের একটা দুর্বলতা। স্বজন-বাৎসল্য-রূপ ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য যখন অর্জুনেরও ছিল, তখন আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিদেরও যে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি। আর বাঙালী বাঙালী-মাত্রেরই স্বজন, তার কারণ ভাষার যোগ হচ্ছে মানস-কায়ে রক্তের যোগ। সুতরাং বাঙালীদের পরস্পরের প্রতি নাড়ির টান থাকাই স্বাভাবিক, না থাকাটাই অদ্ভুত।

তার পর এ প্রীতির পুরো কৈকিয়ত দেওয়া শক্ত, কেননা তার মূল আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ নয়। ছেলেবেলায় গুরুমহাশয়েরা আমাদের একটা ভারি শক্ত অঙ্ক কষতে দিতেন, যা আমরা সকলে কষে উঠতে পারতুম না। সে অঙ্ক হচ্ছে এই—

আছিল দেউল এক পর্বতপ্রমাণ
তেহাই সলিলে তার···

তার পর কি আছে মনে পড়ছে না। কবিতা আমার কণ্ঠস্থ থাকে না। তবে এটুকু মনে আছে যে, মন্দিরের মাটির ভিতর কতটা পোঁতা আছে আঁক কষে তাই আমাদের বার করতে হত। এখন আমার কথা এই যে, মানুষের মন পর্বতপ্রমাণই হোক, আর বল্মীকপ্রমাণই হোক, তার সমস্তটা জেগে নেই। তার অনেকটা স্বজাতির মনের জমির নীচে পোঁতা আছে, আর অনেকটা নিজের অন্তরে তরল ভাবে ডুবে আছে; যেটুকু জেগে আছে সেইটুকু আমরা নিজে দেখতে পাই, অপরকে দেখাতে পারি; কিন্তু সেই আংশিক মন দিয়ে আমাদের সমগ্র মনের পুরো পরিচয় আমরা দিতে পারি নে। সুতরাং আমাদের রাগদ্বেষের সঠিক কারণ আমরা সব সময়ে নিজেও জানিনে, অতএব পরকেও

জানাতে পারি নে। এ ক্ষেত্রে নিজের কোর্ট বজায় রাখবার জন্য মানুষে যেসব তর্কযুক্তি দেখায় সেসব ষোলআনা গ্রাহ্য নয়। কেননা যুক্তিতর্কের দোষ এই যে, তার দ্বারা আমরা অপরকে প্রবঞ্চিত করতে না চাইলেও অনেক সময় নিজেকে প্রবঞ্চিত করি। কে না জানে যে, পৃথিবীতে যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বড় বড় কথার সৃষ্টি হয়েছে সে সকল অধিকাংশ লোকের শুধু আত্মপ্রবঞ্চনার কাজেই লাগে। আমি একজন মহাধার্মিক, উপরন্তু মহাপেট্রিয়ট, এ কথা মনে ক'রে কে না আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

এতক্ষণে বুঝতে পারছ যে, আমি আমার বাঙালী-পেট্রিয়টিজ্‌ম্ সমর্থন ক'রে তোমার কাছে কোনো লিখিত জবাব কেন দাখিল করি নি। তা করলে নিজের না হোক, নিজের জাতের জাঁক আমাকে নিশ্চয়ই করতে হত।

কিন্তু সেদিন তোমার মুখে যা শুনলুম তাতে ক'রে আমার এই মৌনতার জন্য অনুতাপ করছি। সবুজ পত্রে তোমার অনুরোধ মত আমার কৈফিয়তসহ তোমার পত্র প্রকাশ না করার দরুণ সে পত্র তুমি হিন্দীতে অনুবাদ ক'রে মহাত্মা গান্ধীর কাগজে প্রকাশ করেছ। যদি জানতুম, 'রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে' সেই ভাবে আমার কৈফিয়ত তোমার পত্রের অনুচর হয়ে মহাত্মা গান্ধীর কাগজে প্রবেশলাভ করবে, তা হলে আমার মরচে-পড়া ওকালতি বুদ্ধি মেজে ঘষে তার সাহায্যে এমন একটি বর্ণনাপত্র তৈরি করে দিতুম যাতে সত্যমিথ্যা একাকার হয়ে যেত, আর যা পড়ে পলিটিক্যাল-হাকিমের দল আমার বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি দিতে পারতেন না।

৩

সংস্কৃত বলে গতস্য শোচনা নাস্তি, কিন্তু ইংরেজীতে বলে it is never too late to mend। আমি ইংরেজী-শিক্ষিত, অতএব এ ইংরেজী বচন শিরোধার্য করে এ কৈফিয়ত লিখতে বসেছি এই আশায় যে, সেটি হিন্দীতে, অর্থাৎ আগামী স্বরাজের lingua francaয়, প্রমোশন পাবে।

আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, বাংলাদেশের বাঙালীর ঘরে জন্মালেও আমি খাঁটি বাঙালী নই। একছত্র একদণ্ড ইংরেজ শাসনের অধীনে বাস ক'রে, আর পাঁচ থেকে পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্যন্ত ইংরেজী-শাসিত স্কুল-কলেজে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে আমি হয়ে উঠেছি একজন নিয়ো-ইণ্ডিয়ান ওরফে নন্‌-ইণ্ডিয়ান অর্থাৎ কন্‌গ্রেসওয়ালারা যে জাত আমিও সেই জাত।

পলিটিক্সের সুরা আমিও যথেষ্ট পান করেছি এবং তার নেশা আজও ছাড়াতে পারি নি, আর ভারতবর্ষের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান অদ্যাবধি আমি সেই নেশার ঝোঁকে না হোক সেই নেশার চোখেই দেখি।

সুতরাং প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের সপক্ষে ভারতবর্ষীয় পলিটিক্সের দিক থেকে যদি কিছু বলবার থাকে তো তাই বলব ; বাঙালী-পেট্রিয়টিজ্‌মের মূলে আছে বাঙালী জাতির স্বীয় স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান। Self-determination of small nations-এর মতানুসারে বাঙালী-পেট্রিয়টিজ্‌মের বিশেষ সার্থকতা আছে। প্রথমতঃ আমরা একটি বিশেষ জাতি, তার পর আমরা একটি ক্ষুদ্র জাতি ; সুতরাং আমাদের সেল্‌ফ-ডিটারমিনেশন-বিরোধী হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্। আর গত যুদ্ধে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, ইম্পিরিয়ালিজম্ সর্বনেশে জিনিস, তা সে স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক। ইংরেজের সাম্রাজ্যের ভিতর বিদেশ আছে, জর্মানীর ছিল শুধু স্বদেশ। আর জর্মানীর এই স্বদেশী ইম্পিরিয়ালিজম্ জর্মান জাতির নৈতিক আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অধঃপাতের যে একমাত্র কারণ, তার খোলাদলিল তো আজকের দিনে সকলের চোখের সুমুখেই পড়ে রয়েছে। বহুকে এক করবার চেষ্টা ভালো, কিন্তু একাকার করবার চেষ্টা মারাত্মক, কেননা তার উপায় হচ্ছে জবরদস্তি। যদি বল যে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না, তার উত্তর আমাদের সম্বন্ধে সেল্‌ফ-ডিটারমিনেশন যদি না খাটে তো ইউরোপে মোটেই খাটে না। ইউরোপে কোনো জাতির সঙ্গে অপর কোনো জাতির সে প্রভেদ নেই, আমাদের এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির যে প্রভেদ আছে। বাংলার সঙ্গে মাদ্রাজের যে প্রভেদ ইংলণ্ডের সঙ্গে হল্যাণ্ডের সে প্রভেদ নেই, এমন কি ফ্রান্সের সঙ্গে জর্মানীরও সে প্রভেদ নেই। তবে যে প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের নাম শুনলে এক দলের পলিটিশিয়ানরা আঁত্‌কে ওঠেন, তার কারণ তাঁদের বিশ্বাস ও মনোভাব জাতীয় সংকীর্ণ স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়। নিজের সন্তানকে স্তন দিলে কোনো মায়ের উপর যদি এই অভিযোগ আনা হয় যে, সে মাতা অতি স্বার্থপর, যেহেতু তিনি পাড়াপড়শীর ছেলেদের নিজের স্তন্যক্ষীরে বঞ্চিত করছেন, তা হলে সে অভিযোগের কি কোনো প্রতিবাদ করা আবশ্যক? মানুষের পক্ষে যা অস্বাভাবিক তাই করার ভিতর যে আসল মনুষ্যত্ব নিহিত, এ কথা বলে অতিমানুষে আর শোনে অমানুষে। ধর, যদি কোনো জননী নিজেকে জগজ্জননী জ্ঞানে পাড়াসুদ্ধ ছেলেমেয়েদের নিজের স্তনের দুধ জোগাতে ব্রতী হন, তা হলেও

জানাতে পারি নে। এ ক্ষেত্রে নিজের কোর্ট বজায় রাখবার জন্য মানুষে যেসব তর্কযুক্তি দেখায় সেসব ষোলআনা গ্রাহ্য নয়। কেননা যুক্তিতর্কের দোষ এই যে, তার দ্বারা আমরা অপরকে প্রবঞ্চিত করতে না চাইলেও অনেক সময় নিজেকে প্রবঞ্চিত করি। কে না জানে যে, পৃথিবীতে যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বড় বড় কথার সৃষ্টি হয়েছে সে সকল অধিকাংশ লোকের শুধু আত্মপ্রবঞ্চনার কাজেই লাগে। আমি একজন মহাধার্মিক, উপরন্তু মহাপেট্রিয়ট, এ কথা মনে ক'রে কে না আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

এতক্ষণে বুঝতে পারছ যে, আমি আমার বাঙালী-পেট্রিয়টিজ্‌ম্ সমর্থন ক'রে তোমার কাছে কোনো লিখিত জবাব কেন দাখিল করি নি। তা করলে নিজের না হোক, নিজের জাতের জাঁক আমাকে নিশ্চয়ই করতে হত।

কিন্তু সেদিন তোমার মুখে যা শুনলুম তাতে ক'রে আমার এই মৌনতার জন্য অনুতাপ করছি। সবুজ পত্রে তোমার অনুরোধ মত আমার কৈফিয়তসহ তোমার পত্র প্রকাশ না করার দরুণ সে পত্র তুমি হিন্দীতে অনুবাদ ক'রে মহাত্মা গান্ধীর কাগজে প্রকাশ করেছ। যদি জানতুম, 'রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে' সেই ভাবে আমার কৈফিয়ত তোমার পত্রের অনুচর হয়ে মহাত্মা গান্ধীর কাগজে প্রবেশলাভ করবে, তা হলে আমার মরচে-পড়া ওকালতি বুদ্ধি মেজে ঘষে তার সাহায্যে এমন একটি বর্ণনাপত্র তৈরি করে দিতুম যাতে সত্যমিথ্যা একাকার হয়ে যেত, আর যা পড়ে পলিটিক্যাল-হাকিমের দল আমার বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি দিতে পারতেন না।

৩

সংস্কৃত বলে গতস্য শোচনা নাস্তি, কিন্তু ইংরেজীতে বলে it is never too late to mend। আমি ইংরেজী-শিক্ষিত, অতএব এ ইংরেজী বচন শিরোধার্য করে এ কৈফিয়ত লিখতে বসেছি এই আশায় যে, সেটি হিন্দীতে, অর্থাৎ আগামী স্বরাজের lingua francaয়, প্রমোশন পাবে।

আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, বাংলাদেশের বাঙালীর ঘরে জন্মালেও আমি খাঁটি বাঙালী নই। একছত্র একদণ্ড ইংরেজ শাসনের অধীনে বাস ক'রে, আর পাঁচ থেকে পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্যন্ত ইংরেজী-শাসিত স্কুল-কলেজে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে আমি হয়ে উঠেছি একজন নিয়ো-ইণ্ডিয়ান ওরফে নন্-ইণ্ডিয়ান অর্থাৎ কন্‌গ্রেসওয়ালারা যে জাত আমিও সেই জাত।

পলিটিক্সের সুরা আমিও যথেষ্ট পান করেছি এবং তার নেশা আজও ছাড়াতে পারি নি, আর ভারতবর্ষের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান অদ্যাবধি আমি সেই নেশার ঝোঁকে না হোক সেই নেশার চোখেই দেখি।

সুতরাং প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের সপক্ষে ভারতবর্ষীয় পলিটিক্সের দিক থেকে যদি কিছু বলবার থাকে তো তাই বলব ; বাঙালী-পেট্রিয়টিজ্‌মের মূলে আছে বাঙালী জাতির স্বীয় স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান। Self-determination of small nations-এর মতানুসারে বাঙালী-পেট্রিয়টিজ্‌মের বিশেষ সার্থকতা আছে। প্রথমতঃ আমরা একটি বিশেষ জাতি, তার পর আমরা একটি ক্ষুদ্র জাতি ; সুতরাং আমাদের সেল্‌ফ-ডিটারমিনেশন-বিরোধী হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্। আর গত যুদ্ধে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, ইম্পিরিয়ালিজম্ সর্বনেশে জিনিস, তা সে স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক। ইংরেজের সাম্রাজ্যের ভিতর বিদেশ আছে, জর্মানীর ছিল শুধু স্বদেশ। আর জর্মানীর এই স্বদেশী ইম্পিরিয়ালিজম্ জর্মান জাতির নৈতিক আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অধঃপাতের যে একমাত্র কারণ, তার খোলাদলিল তো আজকের দিনে সকলের চোখের সুমুখেই পড়ে রয়েছে। বহুকে এক করবার চেষ্টা ভালো, কিন্তু একাকার করবার চেষ্টা মারাত্মক, কেননা তার উপায় হচ্ছে জবরদস্তি। যদি বল যে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না, তার উত্তর আমাদের সম্বন্ধে সেল্‌ফ-ডিটারমিনেশন যদি না খাটে তো ইউরোপে মোটেই খাটে না। ইউরোপে কোনো জাতির সঙ্গে অপর কোনো জাতির সে প্রভেদ নেই, আমাদের এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির যে প্রভেদ আছে। বাংলার সঙ্গে মাদ্রাজের যে প্রভেদ ইংলণ্ডের সঙ্গে হল্যাণ্ডের সে প্রভেদ নেই, এমন কি ফ্রান্সের সঙ্গে জর্মানীরও সে প্রভেদ নেই। তবে যে প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের নাম শুনলে এক দলের পলিটিশিয়ানরা আঁত্‌কে ওঠেন, তার কারণ তাঁদের বিশ্বাস ও মনোভাব জাতীয় সংকীর্ণ স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়। নিজের সন্তানকে স্তন দিলে কোনো মায়ের উপর যদি এই অভিযোগ আনা হয় যে, সে মাতা অতি স্বার্থপর, যেহেতু তিনি পাড়াপড়শীর ছেলেদের নিজের স্তন্যক্ষীরে বঞ্চিত করছেন, তা হলে সে অভিযোগের কি কোনো প্রতিবাদ করা আবশ্যক? মানুষের পক্ষে যা অস্বাভাবিক তাই করার ভিতর যে আসল মনুষ্যত্ব নিহিত, এ কথা বলে অতিমানুষে আর শোনে অমানুষে। ধর, যদি কোনো জননী নিজেকে জগজ্জননী জ্ঞানে পাড়াসুদ্ধ ছেলেমেয়েদের নিজের স্তনের দুধ জোগাতে ব্রতী হন, তা হলেও

সে দুধে কাউকে বঞ্চিত না করে সবাইকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ হলেও সে দুধে এত জল মেশাতে হবে যে তা পান করে কারও পেট ভরবে না, সকলের পেট ভরবে শুধু যকৃতে। আমার বিশ্বাস, আমাদের পলিটিশিয়ান্‌রা অদ্যাবধি পেট্রিয়টিজ্‌মের উক্তরূপ জল-দুধের কারবার করছেন, এবং আর সকলকেও তাই করতে পরামর্শ দিচ্ছেন।

৪

যদি জিজ্ঞাসা কর যে, এই সহজ সত্যটা লোকের চোখে পড়ে না কেন। —তার উত্তর, আমাদের অবস্থার গুণে। সমগ্র ভারতবর্ষ আজ বিদেশী রাজার অধীনে, সুতরাং ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশেরই আজ রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য নেই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে আজ প্রধান বন্ধন হচ্ছে পরাধীনতার বন্ধন, এবং এ অধীনতার পাশ হতে কোনো প্রদেশবিশেষ নিজ চেষ্টায় নিজ কর্মগুণে মুক্ত হতে পারবে না। এ অবস্থায় আমাদের সবারই পলিটিকাল-সমস্যা একই সমস্যা। এ সমস্যা হচ্ছে এই যে, অধীনতা কি করে স্বাধীনতায় পরিণত করা যায়। সুতরাং আজকের দিনে ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' এই উপদেশ কিংবা আদেশ দিতে আমরা বাধ্য। আমাদের সকলেরই তাই একই বাদ, সে হচ্ছে অধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আর আমাদের সকলেরই গম্যস্থান একই—স্বরাজ্যে।

প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের মূল্য যে কি, তা দেশের লোক স্বরাজ্যে পৌঁছিবামাত্র টের পাবে। অধীনতার যোগসূত্র স্বাধীনতার স্পর্শে ছিঁড়ে যাবে। প্রভুত্বের চাপে দাসের দল একাকার হয়ে যেতে পারে, কিন্তু স্বাধীন মানব তার স্বধর্মের চর্চা ক'রে তার স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলবে। তখন ভারতবর্ষের নানা জাতি একাকার হবার চেষ্টা করবে না, পরস্পরের ভিতর ঐক্য স্থাপন করবার চেষ্টা করবে। আজকের দিনের কন্‌গ্রেসী ঐক্যের সঙ্গে সে ঐক্যের আকাশপাতাল প্রভেদ হবে। বাইরের চাপে মিলিত হওয়া আর প্রীতির প্রভাবে মিলিত হওয়া একবস্তু নয়। এক জেলে পাঁচজন কয়েদির মিলন আর এক সমাজের পাঁচজন স্বাধীন লোকের মিলনের ভিতর যে প্রভেদ আছে, আজকের ভারতের নানা জাতির কন্‌গ্রেসী মিলনের সঙ্গে কালকের স্বরাজ্যবাসী জাতিদের মিলনের সেই প্রভেদ থাকবে। তখন প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের ভিত্তির উপরেই বাক্যগত নয়, বস্তুগত ভারতবর্ষীয় পেট্রিয়টিজ্‌ম গড়ে উঠবে।

ছেলেবেলায় হিতোপদেশে পড়েছি—

অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল-শাল্মলীতরুঃ। তত্র নানাদিগ্দেশাৎ আগত্য রাত্রৌ পক্ষিণো নিবসন্তি স্ম।

রাত্রিকালে নানা দিগ্দেশ হতে পাখিরা এসে গোদাবরী তীরে সেই শিমুল গাছে জড়ো হত কেন?—কিছুক্ষণ কচায়ন করে তার পর আরামে নিদ্রা দেবার জন্য। এ বিষয়ে সকল পক্ষীর স্বার্থ একই। কচায়ন শব্দের মানে বোধ হয় জান না। পক্ষীর ভাষায় ও-শব্দের অর্থ পক্ষীসভার রাজনৈতিক আলোচনা।

আমরাও যে ভারতবর্ষের এই রাত্রিকালে কন্‌গ্রেসে গিয়ে দিন-তিনেক ধরে কচায়ন করে তার পর নিদ্রা দিই, সেও এই একই কারণে। এ কচায়ন করা যে সম্ভব হয়, তার কারণ ইংরেজ-দত্ত শিক্ষার গুণে আমাদের সকলের মুখেই এক বুলি। এ বুলি যে শুধু আমাদের মুখের কথা, মনের কথা নয়, এ অপবাদ আমি দিচ্ছিনে। আমি শুধু এই সত্যটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কন্‌গ্রেসী পেট্রিয়টিজ্‌মের পিছনে যে মন আছে, সে হচ্ছে আমাদের সকল জাতের বিলেতী পুঁথিপড়া মন। সে মন আমাদের সবারই এক। কিন্তু তার নীচে যে মন আছে সে মন প্রতি জাতির নিজস্ব এবং পরস্পর পৃথক। আর, আমাদের ভবিষ্যৎ সভ্যতা গড়ে উঠবে আমাদের মনের এই গভীর অন্তস্থল হতে। বিদেশী শিক্ষার ফলে এই সত্যটা ভুলে যাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে বলে আজকের দিনে ভারতবর্ষের প্রতি জাতিকে বলা আবশ্যক know thyself, এবং প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের সার্থকতাই এইখানে। স্বজাতীয় স্বার্থসাধনের জন্য আমাদের সকলেরই আজ প্রস্তুত হতে হবে।

৫

আর বেশি এগোবার আগে একটা কথার অর্থ পরিষ্কার করা দরকার, সে কথাটা হচ্ছে স্বার্থ। ও-কথাটা উচ্চারণ করবামাত্র আমাদের চোখের সুমুখে ধনধান্যের সোনার ছবি এসে দাঁড়ায়। এ তো হবারই কথা। আমরা যখন প্রাণী, ও প্রাণের সর্বপ্রধান চেষ্টা যখন আত্মরক্ষা করা, তখন অন্ন আমাদের চাইই চাই।

আর পলিটিক্‌সের যত বড় বড় কথা আছে তার আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক খোলস ছাড়িয়ে নিলে কি দেখা যায় না যে, তোম ভিতরকার মোটা কথা হচ্ছে

অন্ন? আজকের দিনে পৃথিবীতে পলিটিক্‌সের দুটি বড় কথা হচ্ছে ক্যাপিটালিজ্‌ম এবং বলশেভিজ্‌ম, বাদবাকি আর যত রকম ism আছে সে সবই হয় ক্যাপিটালিজ্‌ম্ নয় বলশেভিজ্‌মের কোঠায় পড়ে। হাল পলিটিক্‌সের এই দুই ধর্ম এতই পরস্পরবিরোধী যে, উভয়ের মধ্যে অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে আজ জীবনমরণের যুদ্ধ চলেছে। অথচ এই উভয় পলিটিকাল ধর্মের ভিতর একই জিনিস আছে এবং সে জিনিস হচ্ছে অন্ন। তবে মানবজাতি যে দুভাগ হয়ে পড়েছে সে ঐ অন্নের ভাগ নিয়ে। ক্যাপিটালিজ্‌মের মূলসূত্র হচ্ছে অল্প লোকের বহু অন্ন, আর বলশেভিজ্‌মের মূল সূত্র হচ্ছে বহুলোকের যথেষ্ট অন্ন। আমার বিশ্বাস এ দুয়ের কোনোটিই টিকবে না। কেননা, ক্যাপিটালিজম্ ভুলে গিয়েছে যে রুটি সকলেরই চাই, আর বলশেভিজম্ মনে রাখেনি man does not live by bread alone, অর্থাৎ মানুষের মন বলেও একটা জিনিস আছে, অতএব পেটের খোরাক ছাড়া মানুষের মনের খোরাকও চাই, নচেৎ মানুষ পশুর সঙ্গে নির্বিশেষ হয়ে পড়ে।

এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, স্বার্থের মোটা অর্থ হচ্ছে পেটের স্বার্থ, আর পলিটিক্স ও ইকনমিক্স প্রভৃতি মুখ্যত এই স্বার্থসিদ্ধির মন্ত্রতন্ত্র। মনের স্বার্থের সঙ্গে এ মন্ত্রতন্ত্রের সম্বন্ধ গৌণ। তবে যে পেটের কথাকে আমরা আত্মার কথা ব'লে ভুল করি, তার কারণ অন্নের সঙ্গে প্রাণের, প্রাণের সঙ্গে মনের, সংক্ষেপে উদরের সঙ্গে হৃদয়ের এবং হৃদয়ের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। মানুষের সুখ, মানুষের উন্নতি এই অন্ন ও মনের যোগাযোগেরই উপর নির্ভর করে। একমাত্র ভৌতিক ভাত খেয়ে মানুষ তার সৎ রক্ষা করতে পারলেও তার চিৎ ও আনন্দ রক্ষা করতে পারে না। অপরপক্ষে একমাত্র তড়িতানন্দ সেবন করে মানুষ তার আনন্দ রক্ষা করতে পারলেও তার চিৎ ও সৎ রক্ষা করতে পারে না। আর সচ্চিদানন্দ হওয়াই তো মানবজীবনের সার্থকতা। অতএব দাঁড়াল এই যে, মানুষের পক্ষে যেমন লাঙল চাই, তেমনি লেখনীও চাই, যেমন হাতুড়ি চাই তেমনি তুলিও চাই; জাতীয়-জীবনে যেমন পলিটিক্স ও ইকনমিক্স চাই তেমনি বিজ্ঞান ও আর্ট, কাব্য ও দর্শনও চাই।

সুতরাং এক জাতের ন্যাশনালিজ্‌মের নাম শোনবামাত্র আমরা যখন সেটি অপরের ন্যাশনালিজ্‌মের বিরোধী মনে করে ভীত হয়ে উঠি, তখন বুঝতে হবে যে আমরা ন্যাশনালিজম্ শব্দটা তার শুধু ঔদরিক অর্থে বুঝি, কেননা মানুষ

মানুষের সঙ্গে শুধু অন্ন নিয়েই মারামারি-কাড়াকাড়ি করে, কিন্তু মানুষের মনোজগতের বস্তু হচ্ছে পরস্পরের আদান-প্রদানের বস্তু, এক কথায় বিশ্ব-মানবের সম্পত্তি, কোনো জাতি বিশেষের স্থাবর সম্পত্তি নয়। যখন কোনো ব্যক্তি অপর জাতের সঙ্গে মনের কারবার বন্ধ করবার প্রস্তাব করেন, তখন বুঝতে হবে যে তিনি হচ্ছেন ঘোর মেটিরিয়ালিস্ট, কেননা তাঁর বিশ্বাস যে mindও metterএর মত দেশের গণ্ডিতে বন্ধ। এ কথাটা এখানে উল্লেখ করলুম এইজন্যে যে, এ দেশে নিত্যই দেখা যায় যে, আধ্যাত্মিকতার বেনামীতে জড়বাদ যেমন শতমুখে প্রচার হচ্ছে তেমনি দেশময় নির্বিচারে গ্রাহ্যও হচ্ছে। এইখানে একটা কথা বলে রাখি। ঔদরিক স্বার্থসাধন করবার চেষ্টাটা মোটেই নিন্দনীয় নয়; ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষেও নয়, জাতিবিশেষের পক্ষেও নয়। সুতরাং পলিটিক্সের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে জাতীয় অন্নসমস্যার সমাধান করা। আর, বলা বাহুল্য, এ সমস্যার মীমাংসা জাতীয় অবস্থার জ্ঞান সাপেক্ষ। কথার রাজ্য থেকে কাজের রাজ্যে নেমে এলেই আমাদের বস্তুজগতের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে অনেকটা আবদ্ধ হয়ে পড়তে হয়। দেশ-শাসনের ভার যখন আমাদের হাতে আসবে তখনই দেখা যাবে যে, প্রতি প্রদেশ তার নিজের সামাজিক ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তখন যা আমাদের বিশেষ কাজে লাগবে সে হচ্ছে প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌ম্। যে রুসোর পলিটিকাল মতামতের ঘষা-পয়সা নিয়ে আমাদের পেট্রিয়টিজ্‌মের আগাগোড়া কারবার তিনিই বলে গেছেন যে, কর্মক্ষেত্রে পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌কে অনেকটা সংকুচিত করে আনতে হয়।

সে যাই হোক্, আমার বাঙালী-ন্যাশনালিজ্‌ম্ মুখ্যত মানসিক এবং গৌণত রাজনৈতিক। আমাদের মনের স্বরাজ্যলাভ করা ও রক্ষা করা এবং তার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করাই হচ্ছে আমার প্রধান ভাবনা। রাজনৈতিক স্বরাজ্য মানে স্বরাট্ হবার একটি উপায় মাত্র, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬

এখন বাঙালীর মনের বিশেষত্ব যে কোথায় তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাক। এ পরিচয় দেওয়াটা একেবারে অসম্ভব নয়, কেননা বাঙালীর ন্যাশনাল সেল্‌ফ-কন্‌শাসনেস্ কতকটা প্রবুদ্ধ হয়েছে। এই ন্যাশনাল সেল্‌ফ-কন্‌শাসনেস্ কথাটা আমাদের স্বদেশী-যুগে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। সেকালে অবশ্য দেশের লোক এ কথাটা তার পলিটিকাল অর্থেই বুঝত। তখন অত্মজ্ঞান অর্থে

আমরা বুঝতুম আমাদের পরাধীনতা সম্বন্ধে জাতীয় চৈতন্য ও বেদনা। বলা বাহুল্য, এই সংকীর্ণ অর্থে সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মজ্ঞান ও বাংলার আত্মজ্ঞান একই বস্তু। কিন্তু এ বোঝাটা ভুল বোঝা। কেননা, তাহলে স্বাধীন জাতের পক্ষে জাতীয় আত্মজ্ঞান বলে কোনো জিনিসই নেই। কিন্তু তা যে আছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, ঐ সমস্ত পদটি ইউরোপ থেকে এ দেশে আমদানি করা হয়েছে, ও-পদের বিলেতে জন্ম। কথাটা এতই বিলেতি যে, আমাদের কোনো ভাষায় ওটির সঠিক তরজমা করা চলে না।

মানুষ মাত্রেই মুখ্যত এক হলেও সকলের শরীরের চেহারাও যেমন এক নয়, সকলের মনের চেহারাও এক নয়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যেমন প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে, জাতির সঙ্গে জাতিরও তেমনি প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে। আর, ব্যক্তিই বল আর জাতিই বল, উভয়েরই উন্নতির মানে হচ্ছে এই স্বাতন্ত্র্যকে বিকশিত করে তোলা, কেননা সেই চেষ্টাতেই তার সুখ, সেই চেষ্টাতেই তার মুক্তি। যাতে করে এই স্বাতন্ত্র্য চেপে দেয় তাই হচ্ছে বন্ধন। জীবনের বন্ধনের চাইতে মনের বন্ধন কম মারাত্মক নয়। আর আমাদের মনের যে একটা বিশেষ ধাত আছে সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। একটা জানা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। জাতীয় মনের আসল প্রকাশ সাহিত্যে। বর্তমান ভারতবর্ষে বাংলা-সাহিত্যের তুল্য দ্বিতীয় সাহিত্য নেই। ভারতবর্ষের অপর কোনো জাতি দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের জন্মদান করতে পারেনি। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, মনোজগতে আমরা বাকি ভারতবর্ষের সঙ্গে একলোকে বাস করিনে। আমাদের অন্তরে জ্ঞানের ক্ষুধা আছে, কাব্যরসের পিপাসাও আছে। এর ফলে মনোজগতে আমাদের কাছে বসুধৈব কুটুম্বকম্‌, এবং সেই কারণে ইউরোপের সাহিত্য-বিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা যতটা আত্মসাৎ করেছি, ভারতবর্ষের অপর কোনো জাত তদনুরূপ পারেনি।

ইউরোপীয় শিক্ষা যে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের অল্প-বিস্তর বদল করেছে এ কথা আমি মানি, কেননা না মেনে উপায় নেই। আমাদের পলিটিকাল মতামত যে ক হতে ক্ষ পর্যন্ত আগাগোড়া বিলেতি জিনিস, এ তো সবাই জানে। দেশসুদ্ধ লোকের পলিটিকাল আত্মা যে ইউরোপের হাতে গড়ে উঠেছে এ কথা এক পেশাদার ন্যাশানালিস্ট ছাড়া আর কারো অস্বীকার করবার প্রয়োজন নেই।

তবে অপর ভারতবাসীর সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এই যে, আমরা ইউরোপের কাছে এক পলিটিক্স ছাড়া আরও কিছু বিদ্যা আদায় করেছি। ইউরোপের কাব্য-বিজ্ঞানের প্রভাব আমাদের মনের উপর নিতান্ত কম নয়। ল্যাফ্‌কাডিয়ো হার্ন-এর বইয়ে পড়েছি যে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক জাপানীদের মনের কোনোখানে স্পর্শ করে না। অপর পক্ষে শেক্‌স্‌পীয়রের কাব্য আমাদের মনের সকল তারে ঘা দেয়। সে কাব্য আমাদের মর্ম স্পর্শ করে এবং সে স্পর্শে আমাদের অন্তরাত্মা পুলকিত হয়ে ওঠে।

শুধু কাব্য নয়, ইউরোপের বিজ্ঞানও আমাদের অতি প্রিয় সামগ্রী। এ বিশ্ব আমাদের কাছে শুধু জড়জগৎ নয়, ভাবের জগৎও বটে; ইন্দ্রিয়ের দর্শনের স্পর্শনের মনের ধ্যানধারণার বস্তু। আমরা জানি রস খালি কথায় নেই, বিশ্বেও আছে; রূপ খালি আর্টে নেই, প্রকৃতিতেও আছে। এ বিশ্বের অসীমতা ও অসীম বৈচিত্র্য, তার অন্তর্নিহিত শক্তির ছন্দোবদ্ধ লীলা আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। এই বিশ্ব নামক মহাকাব্যের রসাস্বাদ করবার কৌতূহল আমাদের অনেকেরই মনে আছে। তাই-না বাঙালী যুবক আইনস্টাইনের নবাবিষ্কৃত আলোকতত্ত্বের পরিচয় নিতে এত ব্যাকুল, যদিচ তারা সবাই জানে এই নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব কর্মে ভাঙিয়ে নেবার আশু সম্ভাবনা নেই। আমাদের জাতীয় মন জ্ঞান-মার্গের পথিক বলেই বাংলায় জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায়ের আবির্ভাব হয়েছে। মনোজগতের বস্তুর প্রতি আমাদের এই আন্তরিক অনুরাগ আছে বলেই বিজ্ঞানের মন্ত্রভাগ আয়ত্ত করবার দিকে বাঙালীর এতটা ঝোঁক।

এসব কথা শুনে অনেকে হয়তো বললেন যে, বাঙালীর জ্ঞান জ্ঞানমাত্রই থেকে যায়, তা কোনো কাজে লাগে না। বিজ্ঞানের যন্ত্রভাগ যে বাঙালী ততটা করায়ত্ত করতে পারেনি, এ কথা সত্য। আমার বিশ্বাস, এ অক্ষমতার জন্য যত-না দায়ী আমাদের প্রকৃতি তার চাইতে ঢের বেশি দায়ী আমাদের অবস্থা। কলকারখানা গড়বার শক্তির অভাব সম্ভবত বাঙালীর নেই, অভাব আছে শুধু সুযোগের। সে যাই হোক, যা সত্য ও যা সুন্দর তার প্রতি বাঙালী মনের এই সহজ আনুকূল্যের প্রশ্রয় দিয়েই তার জাতীয়-জীবন সার্থক করে তোলা যেতে পারে। যেমন ব্যক্তিবিশেষের তেমনি জাতিবিশেষের প্রকৃতির উলটো টান টানতে গেলে তার জীবনকে ব্যর্থতার দিকে অগ্রসর করা হয়। আজ ইউরোপীয় শিক্ষা বয়কট করবার যে হুজুক উঠেছে তাতে যে বাঙালী সোৎসাহে যোগদান করতে পারছে না, তার কারণ যে-বাঙালীর চিন্তা করবার অভ্যাস

আছে সেই জানে যে উচ্চশিক্ষাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় শক্তি উদ্‌বোধিত করবার সর্বপ্রধান উপায়। কোনো জাতির পক্ষে স্বধর্ম হারিয়ে স্বরাট্ হবার চেষ্টাটা বাতুলতা মাত্র। ভারতবাসী যখন স্বরাজ্য লাভ করবে তখন ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশই তার শিক্ষাদীক্ষার উপর অপর কোনো প্রদেশকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না। প্রতি স্ববশ সজ্ঞান জাতির একটা-না-একটা বিশেষ জাতীয়-আদর্শ থাকে, এবং সেই আদর্শ অনুসারেই সে জাতি তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে। যার নিজস্ব বলে কোনো জিনিস নেই, অথবা নিজস্ব যে রক্ষা করতে বিকশিত করতে না চায়, তার পক্ষে স্বাধীনতার কোনো প্রয়োজন নেই ; শুধু তাই নয়, তার কাছে উক্ত শব্দের কোনো অর্থই হয় না। স্বত্ব সাব্যস্ত করবার জন্যই তো স্বাধীনতার আবশ্যক।

আমার শেষ কথা এই যে, আমাদের পুঁথিগড়া মনের সঙ্গেও বাকি ভারতবর্ষের পুঁথিগড়া মনের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। সুতরাং আমাদের পলিটিকাল মনও অন্য প্রদেশের পলিটিকাল মনের ঠিক অনুরূপ নয়। মনে রেখো, মানুষের পলিটিকাল মন তার সমগ্র মনের বহির্ভূতও নয়, তার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিতও নয়। অবশ্য একদলের কন্‌গ্রেস-ওয়ালা আছেন যাঁরা এ কথা মানেন না ; যদি মানতেন, তাহলে তাঁদের দলে টিকিওয়ালা-ডিমোক্রাট্‌রূপ অদ্ভুত জীবের এতটা প্রাধান্য হত না।

ডিমোক্রাটিক স্বরাজ্য লাভ করতে হলে আমাদের মনের যে বদল আবশ্যক, এ জ্ঞান আমাদের যুবকশ্রেণীর মনে যে প্রবেশ করেছে তার পরিচয় আমি পাঁচজনের সঙ্গে কথায় বার্তায় নিত্যই পাই। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করব না, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে দেশের অধিকাংশ লোককে দাস ও স্ত্রীলোককে দাসী করে রাখব, অথচ পৃথিবীর ডিমোক্রাটিক জাতিদের মত রাজনৈতিক জগতে স্বরাট্ হব, এরূপ মনোভাব যে যুগপৎ লজ্জাকর ও হাস্যকর এ ধারণা এ যুগের বহু বাঙালীর মনে জন্মেছে। তবে এ মনোভাব যে আমাদের দৈনিক সংবাদপত্রে ও বক্তৃতার রঙ্গমঞ্চে গর্জে ওঠেনি, তার কারণ নিজের বিরুদ্ধে হুজুক করা চলেনা। যে ভাব মনে পোষণ করবার জন্য আমরা মনে মনে লজ্জিত হই, তা নিয়ে প্রকাশ্য ঢাক পেটানো অসম্ভব ; আমরা ঢাক পেটাতে পারি শুধু আমাদের কাল্পনিক আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা নিয়ে। কতকটা শিক্ষার বলে, কতকটা পরীক্ষার ফলে, আমরা আমাদের প্রকৃতি ও শক্তি দুয়েরই কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করেছি। নিজের ত্রুটির জ্ঞানও আত্মজ্ঞানের একাংশ ; এবং আত্মজ্ঞান আমাদের মনে

জন্মেছে বলে তারই উপর আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয়-জীবন গড়ে তুলতে চাই। আমাদের অন্তরের বল আমরা পুষ্ট-পরিপুষ্ট করতে চাই, তাই আমরা শিক্ষার জাতিবিচার করে তাকে আচরণীয় কিংবা অনাচরণীয়ের কোঠায় ফেলতে চাইনে, আর আমাদের দুর্বলতা আমরা পরিহার করতে চাই বলে আমরা লোকের জাতি বিচার ক'রে তাকে আচরণীয় কিংবা অনাচরণীয় করে রাখা পেট্রিয়টিক কাজ বলে মনে করিনে। কোনো জাতির পক্ষে তার চিরাগত সংস্কার থেকে মুক্তিলাভ করে নবজীবন ও নবশক্তি লাভ করা সহজসাধ্য নয়; এবং সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করবার সাধনপদ্ধতির নাম রাজনৈতিক হুজুক নয়, কেননা ক্ষণিক উত্তেজনার পিঠ-পিঠ আসে স্থায়ী অবসাদ। জাতীয় ঐশ্বর্য অবশ্য জাতীয় কৃতিত্বের উপর গড়ে ওঠে, এবং সে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় সাহিত্যে ও সমাজে, দর্শনে ও ধনে, বিজ্ঞানে ও আর্টে। মানুষের পক্ষে কিছু ত্যাগ করা, যথা উপাধি কিংবা ওকালতি, শুনতে মহা কঠিন; কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি কঠিন, কিছু করা অর্থাৎ কৃতী হওয়া। জীবনের কাছ থেকে পালানো সহজ, তার সঙ্গে লড়ে জয়ী হওয়াই কঠিন; কেননা এ লড়াই চিরজীবনব্যাপী, এক মুহূর্ত তার বিরাম নেই। দেখতে পাচ্ছ আমি রাজসিক মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছি। একে আমি বৈদিক-তান্ত্রিক সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি; তার উপর আবার ইউরোপের রাজসিক সভ্যতার আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি; সুতরাং আমার কাছ থেকে তুমি অন্য কোনো মনোভাবের পরিচয় পাবার আশা করতে পার না। রাজসিক মন সাত্ত্বিক মনের চাইতে নিকৃষ্ট কিনা বলতে পারিনে, তবে তা যে তামসিক মনের চাইতে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। আর এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, দেশে আজকাল যে সকল মনোভাব সাত্ত্বিক বলে চলছে, সে সব পুরোমাত্রায় তামসিক। সে সবের মূলে আছে অজ্ঞতা আর ঔদাসীন্য, এককথায় মনের জড়তা।

আমি বিশ্বাস করতে ভালবাসি যে, আমার মন এ যুগের বাংলার মন। যদি তাই হয় তো বাঙালীর ন্যাশনালিজমের আদর্শ যে কি, তা অনুমান করা কঠিন নয়। সমগ্র ভারতবাসীকে ডোর কৌপীন পরানো আমাদের আদর্শ হতে পারে না। আজকের দিনে বাঙালীর যদি কোনো আন্তরিক প্রার্থনা থাকে তো সে এই—

বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

কিন্তু এ প্রার্থনা কোনো বাইরের শক্তির কাছে নয়, নিজের অন্তরনিহিত শক্তির কাছে। কারণ এ সত্য আমরা আবিষ্কার করেছি যে বিদ্যা যশ লক্ষ্মী রূপ জয় —এ সকলই আত্মবলে অর্জন করতে হয়, প্রার্থনাবলে নয়। যদি কেউ বলেন যে, এ আইডিয়ালের মধ্যে তো সেলফ্-স্যাক্রিফাইসের কথা নেই ? তার উত্তরে আমি বলি, সেলফ্-স্যাক্রিফাইস কোনো জাতির আদর্শ হতে পারে না, জাতির পক্ষে একমাত্র আদর্শ হচ্ছে সেলফ্-রিয়ালাইজেশন। আর তার একমাত্র উপায় হচ্ছে বহু লোকের পক্ষে সেলফ্-রিয়ালাইজেশনের ব্রত অবলম্বন করা।

আমার শেষ কথা এই যে, যে দেশকে আমি অন্তরের সহিত ভালোবাসি, সে বর্তমান বাংলা নয়, অতীত বাংলাও নয়— ভবিষ্যৎ বাংলা, অর্থাৎ যে বাংলা আমাদের হাতে ও মনে গড়ে উঠছে। সুতরাং আমার বাঙালী-পেট্রিয়টিজম্ বর্তমান ভারতবর্ষীয়-পেট্রিয়টিজমের বিরোধী নয়। আর এক কথা, যে ন্যাশনালিজম্ বিদ্বেষবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ন্যাশনালিজ্মের ফলে শুধু পরের নয় নিজেরও যে সর্বনাশ হয়, গত ইউরোপীয় যুদ্ধ এই সত্য যার চোখ আছে তারই চোখের সমুখে ধরে দিয়েছে।

'সবুজ পত্র'। ১৩২৭ অগ্রহায়ণ
প্রবন্ধসংগ্রহ। ১৯৫২

শিবসুন্দর

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৭০ - ১৮৯৯

আমাদের মনে সৌন্দর্যের সহিত সর্বত্রই একটি বিশেষ শুভভাব বিজড়িত। সুন্দরীর রূপ বর্ণনায় এইজন্য আমরা কথায় কথায় লক্ষ্মীর সহিত তাঁহার উপমা দিয়া থাকি, যাহাতে তাঁহার কল্যাণী মূর্তিখানিই আমাদের অন্তরে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া উঠে, রূপের দাহিকা-শক্তি নিতান্ত প্রবল না হয়। লক্ষ্মী আমাদের গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী— তাঁহার চরণের অরুণরাগস্পর্শে আমাদের গৃহের অন্ধকার বিদূরিত হয়, তাঁহার সকরুণ শুভদৃষ্টিতে আমাদের মনের সমস্ত তম পলকে কাটিয়া যায়— যেমন রূপ তেমনি গুণ; এবং রূপ এখানে গুণের সহিত নিত্যসম্বন্ধ। সুতরাং এই লক্ষ্মীরূপিণী সুন্দরীর শুভ প্রভাব আমাদের জীবনে নিতান্ত সামান্য নহে; তাঁহার সকলই শুভ এবং এই শুভভাবেই তিনি আমাদের হৃদয়মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

আমাদের এই শুভ ভাবনাটুকু বাহিরের দৃষ্টিতে সহসা ধরা না পড়িতে পারে। কারণ বাহিরে হয়তো সৌন্দর্যের একটা হিল্লোল-স্পন্দন মাত্র অনুভব হয়, কিন্তু যাহাদের সহিত অন্তরের সম্বন্ধ তাহারা সেই শুভটুকুই যেন অধিক করিয়া দেখে, ইহাই বিশেষরূপে উপলব্ধি করে। সুন্দরীর চারু চরণতল ধরা স্পর্শ করে কি না করে—তাহার প্রত্যেক পদবিক্ষেপে যেন লক্ষ্মী ঠাকুরানীর শুভ পদপাত স্পন্দন অনুভব হয়; তন্বঙ্গীর মনোহর অবলীলাগতি পশ্চাতে যেন কমলালয়ার কমলকুঞ্জের সৌরভ বিকীর্ণ করিয়া যায়—কোনোরূপ ত্রুটি ঘটিলে তাহা যে কেবলই অশোভন তাহা নহে, তাহা অশুভ, তাহাতে অলক্ষ্মী প্রশ্রয় পায়; আমাদের গৃহলক্ষ্মীর কথায় বার্তায় ভাবে ভঙ্গীতে সংসারের সর্ববিধ কাজে কর্মে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনুষ্ঠানে নিয়ত একটি লক্ষ্মীশ্রী প্রকাশ পায়, আমাদের নিকট যাহা বিশেষরূপে শুভ এবং শুভ বলিয়াই একান্ত কমনীয়।

এই শুভভাবের প্রভাব এইখানেই শেষ নহে। কোথায় সীমন্তের সিন্দূররেখা, কোথায় চরণের অলক্তরাগ; কোথায় চিরন্তন কেশধূপরচনা, কোথায় তন্বঙ্গে চন্দন-পঙ্ক-লেপন, প্রকোষ্ঠে বলয়কঙ্কণ, গ্রীবাদেশে হারযষ্টি,

এমন কি, শাড়ীর রক্তবর্ণ পাড়টি অবধি আমাদের অন্তরে প্রধানত যেন একটি শুভ সূচিত করে; প্রসাধনকলার এই শুভসূচিতা আমাদের নব্য-শিক্ষিত অন্তরে প্রথম দৃষ্টিতে হয়তো কেবল কুসংস্কার মাত্র বলিয়াই প্রতিভাত হয়, কিন্তু হৃদয়ের যোগে সৌন্দর্য যে শুভ হইয়া উঠে, যেখানে কেবলমাত্র বহিরিন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি ছিল, সেখানে অন্তরের একটি মনোহর পরিতোষ ভাব সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে অনেক বড় করিয়া দেয়, এ কথা আমরা বিস্মৃত না হই। কেবল প্রসাধন বলিয়া নহে, আমাদের যে-কোনো কাজে—কি গৃহসজ্জা, কি উৎসব-কলা, কি মঙ্গলঘট স্থাপন, কি অন্য কোন কিছু—হৃদয় যেখানে আপন ব্যাপকতা সঞ্চার করিয়াছে, সেইখানেই সুন্দর শুভ হইয়া উঠিয়াছে, সেইখানেই শিবসুন্দরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

অন্য দেশের সহিত আমাদের এই ভাবে বিশেষ একটু প্রভেদ আছে। রমণী যে দেশে আছেন, সেইখানেই যে অলঙ্কারমণ্ডন ও বেশবিন্যাস-পারিপাট্যের ব্যবস্থা না থাকিয়া যায় না, সে কথা বলাই বাহুল্য এবং এই বেশভূষা প্রসাধনের মধ্যে কোথাও সচেতনভাবে, কোথাও বা অজ্ঞাতসারে মনোহরণের একটি বিশেষরূপে চেষ্টা প্রকাশ পায়। কিন্তু এই মনোহরণ, বোধ করি, আর কোনও দেশে আমাদের মত স্বামীর শুভ কামনা ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠার মধ্যে পুষ্ট হইয়া তাহার বণিক্‌ভাব হইতে মুক্ত হয় নাই। আমাদের গৃহিণীগণের অলঙ্কারমণ্ডন একটি অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে—তাহাতে প্রয়োজনের কল্যাণ হয় এবং পরিবারের লক্ষ্মীশ্রী অক্ষুণ্ণ থাকে। এই শুভ কামনায় ইহার ভিতরকার অনেক নিদারুণ দৈন্য ও মলিন হীনতা চাপা পড়িয়া গিয়াছে—বরঞ্চ ইহাতে সৌভাগ্যবতীদের একটু গৌরবের বিষয় হইয়াছে। এবং এই কারণেই প্রিয়বিয়োগে আমাদের গৃহিণীরা একেবারে নিরাভরণা হয়েন—স্বামীর কল্যাণের সহিত সে প্রসাধনের একান্ত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তদভাবে তাহাতে আর প্রয়োজন কি? বাহিরের সৌন্দর্য আমাদের নিকট অন্তরের শুভ ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে এতই নিষ্ফল।

শুভকর্মের দিন আমাদের গৃহদ্বারে মঙ্গলঘট কেবলমাত্র বহিঃশোভাসম্পাদক নহে, কিন্তু তাহা চূতপল্লবরমণীয় হইয়া উৎসব ব্যাপারে আমাদের একটি মঙ্গল ইচ্ছা ব্যক্ত করে। সেই কারণে তাহা আমাদের মানসচক্ষে য়ুরোপের বহুমূল্য গৃহসজ্জা অপেক্ষা সুন্দর। তাহা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর না হইতে পারে, কিন্তু তাহা গৃহকর্তার আন্তরিক কল্যাণভাবের বাহ্য প্রতিমাস্বরূপ। এই কারণে তাহা

আমাদের চক্ষু আকর্ষণ করিবার পূর্বেই এক মুহূর্তে অন্তঃকরণের সুগভীর সুস্নিগ্ধ প্রসন্নতা আকর্ষণ করিয়া আনে। বিদেশীর কাছে ইহা নিরর্থক, কিন্তু শিশুকাল হইতে যাহারা প্রত্যেক মঙ্গল অনুষ্ঠানে এই মঙ্গলঘটের প্রত্যক্ষ ভাষা বুঝিয়া আসিয়াছে, তাহাদের নিকট ইহা একান্ত অন্তরতররূপে রমণীয়।

আমাদের ভাষায় যেমন শুভ এবং শোভা শব্দের একই ধাতু, তেমনি ভারতবর্ষীয়ের মনের মধ্যেও মঙ্গল এবং সুন্দর একত্র মিশিয়া আছে। এরূপ মিশ্রণ আর কোথাও নাই। এই মিশ্রণ-প্রভাবে আমরা সৌন্দর্যকে চোখ দিয়া না দেখিয়া হৃদয় দিয়া দেখি, মর্মচক্ষু দিয়া উপলব্ধি করি। সেইজন্য পাত পাড়িয়া মাটির খুরি সাজাইয়া মাটিতে বসিয়া ধনী দরিদ্র আহূত বরাহূত অনাহূত সকলে মিলিয়া আহার করার মধ্যে কিছুই অসুন্দর দেখি না। আমাদের চক্ষে বিচ্ছিন্ন কদলীপত্র ও সুলভ মৃৎপাত্র অশোভন নহে, কিন্তু যদি দীনতম অতিথি গৃহস্বামীর অনাদর কল্পনা করিয়া বিমুখ হইয়া যায় তবে তাহাই অশোভন; কারণ, তাহা অশুভ; কারণ, তাহা যজ্ঞে সমবেত জনসংঘের বিপুল হৃদয়গত অখণ্ড সদ্ভাববন্ধনের বিচ্ছেদজনক। সুতরাং কুশ্রী।

বরণ আমাদের একটি সনাতন অনুষ্ঠান। যাহোক আমরা ভালবাসি শ্রদ্ধা করি, যাহার শুভ কামনা করি, তাহাকে বরণ করিবার প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত। ঋগ্বেদের সময় সদস্যবরণ সকল উৎসবের একটি প্রধান অনুষ্ঠান ছিল। সেই বরণক্রিয়া অদ্য আমাদের দেশে নানা শাখাপ্রশাখায় বিস্তীর্ণ হইয়া আমাদের গৃহের মধ্যে স্নিগ্ধচ্ছায়া বিস্তার করিতেছে। বিবাহ হউক, অন্নপ্রাশন হউক, বারব্রত হউক—কখনো বধূ, কখনো জামাতা, কখনো স্বামী, কখনো পুত্র, কখনো অতিথি বা ব্রাহ্মণকে বরণ করিয়া লইতে হয়; এমন কি নিতান্ত পক্ষে গোষ্ঠের গোরু অথবা ঢেঁকিশালের ঢেঁকিকে বরণ না করিয়া শুভকর্ম সমাধা হয় না। জীব ও জড়, আত্ম ও পর, সকলের মধ্যে এই অক্ষুণ্ণ সদ্ভাবের উত্তাপহীন সৌম্য জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলে তবেই আমাদের যজ্ঞানুষ্ঠানের সৌন্দর্য বিকাশপ্রাপ্ত হয়। কেবল ঝাড়লণ্ঠন বা বৈদ্যুতিক আলোকচ্ছটায় হয় না।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী। ১৩১৪

বাঙ্গালার কথা

চিত্তরঞ্জন দাশ

১৮৭০ - ১৯২৫

আজ বাঙ্গালীর মহাসভায় আমি বাঙ্গালার কথা বলিতে আসিয়াছি, আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, আপনাদের আদেশ শিরোধার্য। আজ এই মিলনমন্দিরে আমার যোগ্যতা অযোগ্যতা লইয়া জটিল কুটিল অনেক প্রকার বিচারের মধ্যে বিনাইয়া বিনাইয়া বিনয় প্রকাশ করিয়া আমার ও আপনাদের সময় অযথা নষ্ট করিব না। দেশের নায়ক হইবার অধিকারের যে অহঙ্কার, তাহা আমার নাই, কিন্তু আমার বাঙ্গালাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা, অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাঙ্গালার যে মূর্তি, তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি, এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানসমন্দিরে সেই মোহিনী মূর্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে! এই যে আশৈশব ও আজীবন শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম ও ভালোবাসা, তাহার অভিমান আমার আছে। সেই প্রেম জ্বলন্ত প্রদীপের মত আমাকে পথ দেখাইয়া দিবে। আপনাদের সকলের সমবেত যে যোগ্যতা, তাহাই আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাকে যোগ্য করিয়া তুলিবে।

সেই ভরসায় আজ আমি আপনাদের সম্মুখে বাঙ্গালার কথা বলিতে আসিয়াছি। যে কথাগুলো অনেক দিন ধরিয়া আমার প্রাণে জাগিয়াছে, সে-সব কথা আমার জীবনের সকল রকমের চেষ্টা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে আরও ভাল করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, যে কথাগুলিকে সত্য বলিয়া জীবনের ধ্যান-ধারণার বিষয় করিয়াছি, সে সব কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করিব। যাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে আমার কোন ভয় হয় না, লজ্জা হয় না। হয়তো আমাদের শাসনকর্তাদের কাছে আমার অনেক কথা অপ্রিয় লাগিবে, হয়তো আমার অনেক কথার সঙ্গে আপনাদের অনেকের মনের মিল হইবে না। কিন্তু 'সত্যম্ ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্' এই বচনের এমন অর্থ নহে যে, যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, এবং যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা আছে তাহা করিও না। সে তো কাপুরুষের কথা, দেশ-ভক্তের রীতি নহে। যে সত্য আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছে, যাহাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে

পাইতেছি, তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে হইলে যে পাটোয়ারী বুদ্ধির আবশ্যক, তাহা আমার নাই। আর নাই বলিয়া তার জন্য কোনও অনুতাপও হয় না। তাই আজ যে কথাগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই কথাগুলি প্রিয়ই হউক, কি অপ্রিয়ই হউক, অম্লানবদনে অকুণ্ঠিতচিত্তে আপনাদের কাছে নিবেদন করিব।

প্রথমেই হয়তো অনেকেরই মনে হইবে যে, এই মহাসভা শুধু রাজনৈতিক আলোচনার জন্য, এই সভায় বাঙ্গালার কথা আবশ্যক কি? এই প্রশ্নই আমাদের ব্যাধির লক্ষণ। সমগ্র জীবনকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধনের স্বভাববিরুদ্ধ। আমরা ইউরোপ হইতে ধার করিয়া এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি, এবং এই ধার-করা জিনিস ভাল করিয়া বুঝি নাই বলিয়া আমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক চেষ্টাকে সার্থক করিতে পারি নাই। যে জিনিসটাকে আমরা রাজনীতি বা Politics বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহার সঙ্গে কি সমস্ত বাঙ্গালা দেশের, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির একটা সর্বাঙ্গীণ সম্বন্ধ নাই? কেহ কি আমাকে বলিয়া দিতে পারে, আমাদের জাতীয় জীবনের কোন্ অংশটা রাজনীতির বিষয়, কোন্ অংশটা অর্থনীতির ভিত্তি, কোন্ অংশটা সমাজনীতির প্রাণ, আর কোন্ অংশটা ধর্মসাধনের বস্তু? জীবনটাকে মনে মনে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া, এইসব মনগড়া জীবন-খণ্ডের মধ্যে কি আমরা অলঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দিব? এই কাল্পনিক প্রাচীর বেষ্টিত যে কাল্পনিক জীবন-খণ্ড ইহারই মধ্যে কি আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা সাধনা আবদ্ধ থাকিবে? আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা আন্দোলনের যে বিষয়, তাহাকে কি বাঙ্গালী জাতির যে জীবন, সেই জীবনের সব দিক্ দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব না? যদি না দেখি, তবে কি সত্যের সন্ধান পাইব?

কথাটা একটু তলাইয়া দেখিলে বেশ স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায় রাজনীতি কাহাকে বলে। এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি। আমাদের সাধনায় ইহার কোন বিশিষ্ট নাম নাই, আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইহার নামকরণ করার আবশ্যকতা মনে করেন নাই। ইউরোপীয় সাধনায় যাহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে, তাহার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলিতে গেলে রাজায় প্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহা নির্ণয় করা এবং এই সম্বন্ধের মধ্যে যে একটা নিত্য সার্বভৌমিক সত্য নিহিত আছে, তাহাকে প্রকাশ করা। ঐ মতে রাজনৈতিক আন্দোলন বা আলোচনার বিষয় কোন জাতির বা দেশের রাজা প্রজার কি রকম সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহাই বিচার করা। অর্থাৎ সমস্ত রাজ্যটা সদ্ভাবে ও সৎপথে চালনা করিতে

হইলে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা কতটা রাজার হাতে থাকিবে, কতটা প্রজার হাতে থাকিবে, তাহাই বিচার ও নির্ণয় করা।

কিন্তু ঐ যে রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা চেষ্টা, ইহার সার্থকতা কোথায়? এক কথায় বলিতে হইলে, যে কথা অনেকবার শুনিয়াছি, তাহাই বলিতে হয়, বাঙ্গালীকে মানুষ করিয়া তোলা। বাঙ্গালী যে অমানুষ, তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। আমি যে আপনাকে বাঙ্গালী বলিতে একটা অনির্বচনীয় গর্ব অনুভব করি, বাঙ্গালীর যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, দর্শন আছে, কর্ম আছে, ধর্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে। বাঙ্গালীকে যে অমানুষ বলে, সে আমার বাঙ্গালাকে জানে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া যা'ক বাঙ্গালীর কতকগুলা দোষ আছে, যাহার সংশোধন আবশ্যক এবং সেই ভাবে ধরিয়া লওয়া যা'ক যে, বাঙ্গালী অমানুষ। তাহাকে মানুষ করিয়া তোলাই রাষ্ট্রীয় চেষ্টা বা চিন্তার উদ্দেশ্য, এবং সেই জন্যই আমাদের দেশে রাজা প্রজার যে সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহা বিচার করিতে গেলে, আমাদের যে এখন ঠিক কি অবস্থা, তাহার বিচার করিতেই হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে আমাদের আর্থিক অবস্থা কিরূপ, তাহা বিচার করিতে হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে, আমাদের চাষাদের সন্ধান লইতে হইবে। আমাদের চাষের সন্ধান ভাল করিয়া লইতে হইলে আমাদের চাষ বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহার খোঁজ রাখিতে হইবে। সেই কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, কেন আমাদের পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া অনেক লোক শহরে আসিয়া বাস করে, সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বিচার করিতে হইবে যে, সে কি পল্লীগ্রামের অ-স্বাস্থ্যের জন্য, কি অন্য কোন কারণে? সেই সঙ্গে সঙ্গে অস্বাস্থ্যের অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইবে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, রাজনীতির সাধন করিতে হইলে আমাদের চাষাদের অবস্থা চিন্তা করা আবশ্যক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামে অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করাও আবশ্যক।

সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিচার করিতে হইবে, আমাদের দেশে যত চাষ-যোগ্য জমি আছে, সব ভাল করিয়া চাষ করিলেও আমাদের অবস্থা সহজ সচ্ছল হয় কি না। যদি না হয়, তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা আলোচনা ও বিচার করিতে হইবে।

এই সব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে আমাদের চাষের প্রণালী কিরূপ

ছিল, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা পূর্বে কিরূপ ছিল, কেমন করিয়া আমরা গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতাম, এ সব কথা তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

শুধু তাহাই নহে, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা আলোচনা করিতে হইবে। কেমন করিয়া আমরা শিক্ষা বিস্তার করিতাম, কেমন করিয়া আমরা আপনাকে শিক্ষিত করিয়া লইতাম এবং এখন বর্তমান অবস্থায় আমাদের শিক্ষা-প্রণালী কি রকম হওয়া উচিত, রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব কথারই বিচার আবশ্যক।

শুধু তাহাই নহে। আমাদের কৃষিকার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে আমাদের সমাজের কি সম্বন্ধ ছিল এবং তাহাতে আমাদের কতটা উপকার, কতটা অপকার সাধিত হইতেছে, এ কথাকেও তাচ্ছিল্য করা যায় না। কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে আমাদের বর্তমান অবস্থায় কি সম্বন্ধ থাকা উচিত, কিরূপে তাহার মীমাংসা হইবে? এই প্রশ্নের মীমাংসা যদি না করা যায়, তবে রাষ্ট্রীয় শক্তির কতটা রাজার হাতে, কতটা আমাদের হাতে থাকা উচিত, এই প্রশ্নের বিচারই বা কেমন করিয়া হইবে?

শুধু তাহাই নহে। আমাদের কৃষিকার্য হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় সামাজিক ব্যবহার পর্যন্ত আমাদের সকল ভাব, সকল ভাবনা সকল চেষ্টা ও সকল সাধনার সঙ্গে আমাদের ধর্মের কি সম্বন্ধ ছিল ও আছে, তাহার বিচার অবশ্য কর্তব্য। সে দিকে চোখ না রাখিলে সব দিকই যে অন্ধকার দেখিব। সব প্রশ্নই যে অকারণে অস্বাভাবিকভাবে জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিবে। সেই দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কোন মীমাংসাই সম্ভবপর হইবে না।

আমাদের অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশী বিপদ যে আমরা ক্রমশই আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, আচার-ব্যবহারে, অনেকটা ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। রাজনীতি বা Politics শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি আমাদের দেশ একেবারে অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া পৌছায়। ইংরাজের ইতিহাসে এই রাজনীতি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আমরা সেই মূর্তিরই অর্চনা করিয়া থাকি। বিলাতের জিনিসটা আমরা যেন একেবারে তুলিয়া আনিয়া এই দেশে লাগাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচি। এ দেশের মাটিতে তাহা বাড়িবে কি না তাহা ত একবারও ভাবি না। Burke-বুলি যাহা স্কুলে কলেজে মুখস্থ করিয়াছিলাম, তাহাই আওড়াই, Gladstone-এর কথামৃত পান করি আর মনে করি ইহাই রাজনৈতিক চরম। "Seely"র

Expansion of England" নামে যে পুস্তক আছে, তাহা হইতে বাছা বাছা বচন উদ্ধার করি। Sidgwick-এর কেতাব হইতে কথার ঝুড়ি টানিয়া বাহির করি, ফরাসী স্কুল এবং ইউরোপে রাজনীতির যত স্কুল আছে, সব স্কুলের কেতাবে কোরানে যত ধারাল বাক্য আছে, একেবারে এক নিঃশ্বাসে মুখস্থ করিয়া ফেলি, আর মনে করি, এইবার আমরা বক্তৃতা ও তর্কে অজেয় হইলাম, দেখি আমাদের শাসনকর্তারা কেমন করিয়া আমাদের তর্ক খণ্ডন করেন। মনে করি, রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু তর্ক-বিতর্কের বিষয়—বক্তৃতার ব্যাপার মাত্র। আমরা তর্ক করিয়া, বক্তৃতা করিয়া জিতিয়া যাইব। আমাদের সকল উত্তম ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধারকরা কথার ভার চাপাইয়া দিই। যাহা স্বভাবত সহজ সরল, তাহাকে মিছামিছি বিনা কারণে জটিল করিয়া তুলি। শুধু যাহা আবশ্যক, তাহা করি না; দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাই না, বাঙ্গালার কথা—বাঙ্গালীর কথা ভাবি না, আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে সর্বতোভাব তুচ্ছ করি। আমাদের বর্তমান অবস্থার দিকে একেবারেই দৃক্‌পাত করি না। কাজেই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। তাই এই অবাস্তব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই, এই কথা অনেকে স্বীকার করিবেন না। কিন্তু স্বীকার করিলেই কি কথাটা মিথ্যা হইয়া যাইবে? আমরা চোখ বুজিয়া থাকিলেই কি কেহ আমাদের দেখিতে পাইবে না? আমরা যে শিক্ষিত বলিয়া অহঙ্কার করি, আমরা দেশের কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকি? আমরা কয় জন? দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে আমাদের কোথায় যোগ? আমরা যাহা ভাবি, তাহারা কি তাই ভাবে? সত্য কথা বলিতে হইলে কি স্বীকার করিব না যে, আমাদের উপর আমাদের দেশবাসীদের সেরূপ আস্থা নাই? কেন নাই? আমরা যে ভিতরে ভিতরে ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়াছি। আমরা যে ইংরাজী পড়ি ও ইংরাজীতে ভাবি, এবং ইংরাজী তর্জমা করিয়া বাঙ্গালা বলি ও লিখি, তাহারা যে আমাদের কথা বুঝিতে পারে না। তাহারা মনে করে, নকলের চেয়ে আসলই ভাল। আমরা যে তাহাদের ঘৃণা করি। কোন্ কার্যে তাহাদের ডাকি? Government-এর কাছে আবেদন করিতে হইলে তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া একটা বিরাট্ সভার আয়োজন করি, কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া কোন্ কাজে তাহাদের ডাকি? আমাদের কোন্ কমিটিতে কোন্ সমিতিতে চাষা সভাশ্রেণীভুক্ত? কোন্ কাজ তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া,

তাহাদের মত লইয়া করি? যদি না করি, তবে কেন অবনতমস্তকে আমাদের ত্রুটি স্বীকার করিব না? কেন সত্য কথা বলিব না? মিথ্যার উপর কোন সত্য বা সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের যে রাজনৈতিক আন্দোলন, ইহা একটা প্রাণহীন, বস্তুহীন, অলীক ব্যাপার। ইহাকে সত্য করিয়া গড়িতে হইলে বাঙ্গালার সব দিক্ দিয়াই দেখিতে হইবে। বাঙ্গালার যে প্রাণ, তাহারই উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, আজ এই মহাসভায় আমি বাঙ্গালার কথা বলিতে আসিয়াছি।

কিন্তু আমি যে বিপদের কথা বলিয়াছি, তাহার জন্য নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। আমাদের এ অবস্থা প্রকৃতপক্ষে অস্বাভাবিক হইলেও ইহার যথাযথ কারণ আছে। ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের দেশে আসে, তখন নানা কারণে আমাদের জাতীয় জীবন, দুর্বলতার আধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম একেবারেই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে চিরপুরাতন চিরশক্তির আকর সনাতন হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র মৌখিক আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিব-শক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল; অপর দিকে যে অপূর্ব প্রেমধর্মবলে মহাপ্রভু সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেমধর্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি কেবলমাত্র তিলক-কাটা ও মালা ঠক্‌ঠকানিতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল। বাঙ্গালার হিন্দুর সমগ্র ধর্মক্ষেত্র শক্তিহীন শাক্ত ও প্রেমশূন্য বৈষ্ণবের ধর্মশূন্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন নবদ্বীপের চিরকীর্তিময় জ্ঞানগৌরব কেবলমাত্র ইতিহাসের কথা—অতীত কাহিনী। বাঙ্গালী জীবনের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। এইরূপে কি ধর্মে, কি জ্ঞানে বাঙ্গালার হিন্দু তখন সর্ববিষয়ে প্রাণহীন শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। আলিবর্দি খাঁর পর হইতেই বাঙ্গালার মুসলমানও ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই সময় তাহাদের সকল জ্ঞান ও সকল শক্তিবলহীনের বিলাসে ভাসিয়া গিয়াছিল। এমন সময় সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরাজ বণিক-বেশে আগমন করিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপন করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিল। আমাদের জাতীয় দুর্বলতানিবন্ধন আমরা ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইংরাজ জাতিকে ও তাহাদের সভ্যতা ও তাহাদের বিলাসকে বরণ করিয়া লইলাম। দুর্বলের যাহা হয়, তাহাই হইল। ইংরাজী সভ্যতার সেই প্রখর আলোকে সংযতভাবে ধারণ করিতে পারিলাম না। অন্ধ হইয়া পড়িলাম। অন্ধকারাক্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন বিস্ময়ে ও মোহ-বশত আপনার

পদপ্রান্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া বহুদূরে দুর্গম পথকে সহজ ও সন্নিকট মনে করিয়া, সেই পথেই অগ্রসর হয়, আমরাও ঠিক সেইরূপ নিজের ধর্ম কর্ম সকলই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া, নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া নিজের সাহিত্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। সেই ঝোঁক অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও একেবারে যায় নাই। রামমোহন যে দেশে "বিজ্ঞানের তূর্যধ্বনি" করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই শুনিয়াছিলাম বা মনে করিয়াছিলাম শুনিয়াছি, অন্ততপক্ষে বিজ্ঞানের বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু রামমোহন যে গভীর শাস্ত্রালোচনায় জীবনটাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার দিকে ত আমাদের চোখ পড়ে নাই। তিনি যে আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে আমাদের উদ্ধারের পথ খুঁজিয়াছিলেন, সে কথা ত আমরা একবারও মনে করি নাই। তারপর দিন গেল। আমাদের স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, আমাদের ঝোঁকটা আরও বাড়িয়া গেল। তারপর বঙ্কিম সর্বপ্রথমে বাঙ্গালার মূর্তি গড়িলেন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। বঙ্গ-জননীকে দর্শন করিলেন। সেই "সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্য-শ্যামলাং মাতরম্" তাহারই গান গাহিলেন। সবাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, এই আমাদের মা, বরণ করিয়া ঘরে তোল।" কিন্তু আমরা ত তখন সে মূর্তি দেখিলাম না; সে গান শুনিলাম না! তাই বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি একা মা মা বলিয়া রোদন করিতেছি।" তারপর শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন। এই আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন, উহা আমাদের দেশের অনেক অনিষ্ট করিয়াছিল, আবার কেহ কেহ বলেন, আমাদের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছিল। সে সব কথা লইয়া আলোচনা করা আমি অনাবশ্যক মনে করি। এই আন্দোলন যে অনেক দিকে একেবারেই অন্ধ ছিল, তাহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি যেন সেই আন্দোলনের মধ্যেই বাঙ্গালী জাতির, অন্ততপক্ষে শিক্ষিত বাঙ্গালীর, আত্মস্থ হইবার একটা প্রয়াস—একটা উদ্যম দেখিতে পাই। সেইটুকুই আমাদের লাভ। তারপর আরও দিন গেল। ১৯০৩ খ্রীঃ হইতে স্বদেশী আন্দোলনের বাজনা বাজিতে লাগিল। বাঙ্গালী আপনাকে চিনতে ও বুঝিতে আরম্ভ করিল। রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন—

বাংলার মাটি বাংলার জল
সত্য হউক সত্য হউক হে ভগবান্

বাঙ্গালার জল বাঙ্গালার মাটি আপনাকে সার্থক করিতে লাগিল।

কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী গুণী মহাপণ্ডিত আছেন, যাঁহারা নাকি বলেন যে, এই স্বদেশী আন্দোলন, ইহা একটা বৃহৎ ভ্রান্তির ব্যাপার! আমরা নাকি সবদিকে ঠিক হিসাব করিয়া চলিতে পারি নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশে একটা প্রাণহীন জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। এই মুখস্থ করা জ্ঞানের ক্ষমতা অল্পই; কিন্তু অহঙ্কার অনেকখানি। এই জ্ঞানে যাঁরা জ্ঞানী, তাঁহারা সব জিনিস সের দাঁড়ি লইয়া মাপিতে বসেন। তাঁহারা অঙ্কশাস্ত্রের শাস্ত্রী, সব জিনিস লইয়া আঁক কষিতে বসেন। কিন্তু, প্রাণের যে ব্যথা, সে ত অঙ্কশাস্ত্র মানে না, সে যে সকল মাপকাটি হইয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলন একটা ঝড়ের মত বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রাণ যখন জাগে, তখন ত হিসাব করিয়া জাগে না। মানুষ যখন জন্মায়, সে ত হিসাব করিয়া জন্মায় না। না জন্মাইয়া পারে না বলিয়াই সে জন্মায়। আর না জাগিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই সে প্রাণ একদিন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে। এই যে মহাবন্যার কথা বলিলাম, তাহাতে আমরা ভাসিয়া—ডুবিয়া, বাঁচিয়াছি। বাঙ্গালার যে জীবন্ত প্রাণ তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাঙ্গালার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। বাঙ্গালার যে ইতিহাসের ধারা, তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈশবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণব ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডিদাস বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল। মহাপ্রভুর জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞানদাসের গান, গোবিন্দদাসের গান, লোচনদাসের গান, সবই যেন একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানের ধ্বনি প্রাণের মধ্যে বাজিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধন-সঙ্গীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম, কেন ইংরাজ এ দেশে আসিল; বুঝিলাম, রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় মর্ম কি। বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্তি সেই—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমার প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে—

সেই মাকে দেখিলাম চিনিলাম। বঙ্কিমের গান আমাদের "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।" বুঝিলাম, রামকৃষ্ণের সাধনা কি—সিদ্ধি কোথায়? বুঝিলাম, কেশবচন্দ্র কেন কাহার ডাক শুনিয়া ধর্মের তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম, বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্তব্য আছে। বুঝিলাম, বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপবৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটি বিশিষ্ট রূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙ্গালা সেই রূপের মূর্তি। আমার বাঙ্গালা সেই বিশিষ্টরূপের প্রাণ। যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম, সে রূপ বিশিষ্ট, সে রূপ অনন্ত! তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর—আমি সেই রূপের বালাই লইয়া মরি।

'নারায়ণ'। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪

বাংলার বেখাপ বর্ণমালা

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৭২ - ১৯৪০

হরিকে সে কেন অরি বলে, এক চাষার কাছে কৈফিয়ত চাওয়ায় সে উত্তর করে—"কইতে কই অরি কিন্তু নিক্‌তে নিকি অরি!" আমরা, বাঙালীরা, কইতে কই বাংলা, কিন্তু লিখ্‌তে লিখি সংস্কৃত—অন্তত লেখবার বেলা সংস্কৃত-গোচরে একটা সাধুভাষার চর্চা করে আসা গেছে; যাতে করে অনেক সময়, দ্বিজু রায়ের গানের গ্রন্থকারের রচনার মত "দিনের মত বিষয় হত রাতের মত অন্ধকার, জলের মত বিষয় হত ইটের মত শক্ত!"

বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ নয়, এ সহজ তত্ত্বের ইঙ্গিতমাত্র করলে কিছুদিন আগে হৈ-হৈ রৈ রৈ ব্যাপার বেধে যেত। ক্রমে, কি ভাগ্যি, সত্যি কথাগুলো আমাদের দেশের লোকের গা-সওয়া হয়ে আসছে। বাঙালীর বুকের পাটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাটাও ক্রমশ নিজমূর্তি ধরে সেবকদের কাছে দেখা দিচ্ছে।

সংস্কৃত-ছাঁদে চলবার চেষ্টা করে বাংলা ভাষার যে দুর্গতি হয়েছে তার খবর আমরা মাঝে মাঝে সবুজপত্রের পাতায় সম্পাদক মহাশয়ের কলম থেকে পেয়ে থাকি। সম্প্রতি, যে গবেষণার ফলে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়েছেন, তার এক অংশ দেখার সুযোগ ঘটায়, খাঁটি বাংলায় যত রকমের শব্দ শোনা যায় তার লিপি হিসাবে সংস্কৃতের নকল-করা বর্ণমালা কতটা খাপ-ছাড়া, তা বুঝতে আর বাকি নেই।

পাঁচ ভাষায় ব্যাকরণ চর্চায় সুনীতিবাবু যে অধ্যবসায় দেখিয়েছেন, সূক্ষ্ম আওয়াজ কানে ধরবার, মিশল আওয়াজ ছড়িয়ে দেখবার তাঁর যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে ভরসা হয় যে এত দিন পরে একটা সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ বাংলা ব্যাকরণ জুটবে। গ্রন্থটা শেষ হতে দেরী লাগবে, বর্ণমালা সম্বন্ধে যেটুকু হয়েছে তাও প্রকাশ হয়নি। সুতরাং তা থেকে দু-চারটি কৌতুকের কথা তুলে নিয়ে আমার এ প্রবন্ধের কাজে লাগিয়ে নিলে দোষ কি?

পণ্ডিতী ভাষায় লিখতে থাকলে পণ্ডিতী বর্ণমালার ত্রুটি বড় ধরা পড়ে না। মুখের কথার শব্দ[১]গুলি লেখায় ঠিকমত আনবার চেষ্টা করলে তবেই ফ্যাসাদে

১ এ প্রবন্ধে শব্দ কথাটা সংস্কৃত শব্দ অর্থে ব্যবহার হচ্ছে না। পাঠকরা অনুগ্রহ করে ওর বাংলা মানে 'আওয়াজ' যেন ধরে নেন।

পড়তে হয়। তখন টের পাওয়া যায় যে, ছেলেবেলার মুখস্থ বর্ণমালা গোড়ায় বাংলা ভাষার জন্যে তৈরী হয় নি। সাহেবের সামনে বার করবার জন্যে শিশু বাংলা ভাষাকে সস্তায় পাওয়া ready-made পোষাকে সাজাতে গিয়ে তার চেহারাও খোল্‌তাই হয় নি, তার অবাধে চলা-ফেরাও মুস্কিল হয়ে পড়েছে।

প্রথমত, বাংলা কথা কইতে যত রকমের যতগুলি আওয়াজ মুখ দিয়ে বার হয়, বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের বর্ণমালা দিয়ে তা ত লিখে দেখবার উপায় নেই। আবার এই বর্ণমালায় কোন কোন শব্দের একের বেশী অক্ষর থাকায়, কোন্‌টি কোথায় খাটে তা বুদ্ধি খাটিয়ে জানবার যো নেই ; হয় সকলে মিলে, চোখ বুজে, একই বদভ্যাস বজায় রাখা, নয় নানা মুনির নানা মত ফলান, এ দুই দোষের মধ্যে একটা এসে পড়ে। তার উপর এমন অক্ষরও সব আছে যারা বেকার বসে থেকে জায়গা জুড়ে আছে মাত্র। লাভের মধ্যে, বানান শিখতে ছেলেদের মাথা ঘুরে যায়, ছাপাখানার ঝঞ্ঝাট ও খরচ বাড়ে, আর বাংলা typewriter অভ্যুদয়ের পথে কাঁটা পড়ে।

বর্ণপরিচয়ের হাল সংস্করণে অসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের ফর্দে ৪০টি অক্ষর দেখা যায়। পাঁচ বর্গের পাঁচটি করে ২৫ ; য থেকে হ পর্যন্ত ৮ ; আর হ-র পর ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ এই ৭টি। সাধে বলি পণ্ডিতী-বর্ণমালা! যতক্ষণ সংস্কৃতের নকল চলছিল ততক্ষণ এক রকম ছিল। কিন্তু হসন্ত ত-কে খণ্ড-ত নাম দেওয়াই বা কি, আর তাকে বর্ণমালায় আলাদা স্থান দেওয়াই বা কি, কার সহজ বুদ্ধিতে আস্‌ত? হাতের লেখার আমলে শুধু ত-য়ে হসন্তের চিহ্ন কেন, হ-য়ে উকার, ভ-য়ে রফলা, ট-য়ে ট-য়ে, প্রভৃতি, হাতের টানে অক্ষরে-চিহ্নে জড়িয়ে, কত নতুন রকমের চেহারা দাঁড়াত—সবগুলি যে আলাদা অক্ষর বলে বর্ণমালায় ঢুকে পড়ে নি, এই ভাগ্যি! ছেলেবেলায় ক্ষ ও জ্ঞ-কে এ রকম অনধিকার প্রবেশ করতে দেখা গিয়েছিল, আজকাল তারা বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ ছেড়ে যুক্তাক্ষরের মধ্যে স্বস্থানে প্রস্থান করে বাঁচিয়েছে।

সে যা হোক্, সংস্কৃত আদর্শের মায়া কাটিয়ে, ছেলেবেলার মুখস্থ ভুলে, একমাত্র বাংলা উচ্চারণের হিসেবে যদি একটি বর্ণমালা বা শব্দমালা খাড়া করা যায়, তাহলে যা দরকার নেই তা বাদ দিয়ে, যা অভাব আছে তা যুগিয়েও ঐ ৪০ অক্ষরের কমেই কাজ চলে। আলোচনার সুবিধের জন্যে বাংলার শব্দসকল আমার পছন্দমত ৯টি বর্গে ভাগ করে সাজান যাক। আমার এ ফর্দ থেকে

ফাজিল অক্ষর সব বাদ দিয়ে, নাজাই অক্ষরের কাজ চলিত অক্ষরে ফুটকি প্রভৃতি চিহ্ন যোগে সেরে নেওয়া যাচ্ছে।

১।	ক-বর্গ—ক, খ, গ, ঘ।	৪
২।	চ-বর্গ—চ, ছ, জ, ঝ।	৪
৩।	ট-বর্গ—ট, ঠ, ড, ঢ।	৪
৪।	ত-বর্গ—ত, থ, দ, ধ। (ৎ=হসন্ত ত মাত্র)	৪
৫।	প-বর্গ—প, ফ, ব, ভ।	৪
৬।	ঁ-বর্গ—ঁ, ন, ম, ঙ। (ং=হসন্ত ঙ মাত্র)	৪
৭।	য়-বর্গ—য়, র, ল, ড়, ঢ়, ব (w)।	৬
৮।	শ-বর্গ—শ, স, চ (ts), জ (z)।	৪
৯।	হ-বর্গ—হ, Guttural খ, ফ (f), ভ (v)।	৪
	(ঃ=হসন্ত হ) মোট—	৩৮

আমার এই বর্গগুলির মধ্যে প্রথম ৫টি মামুলী, তাদের মধ্যে, বিশেষত্ব কিছু নেই। চলিত বর্ণমালার অক্ষরগুলি এ স্থলে ঠিকমত কাজই দিচ্ছে—প্রত্যেক শব্দের একটি করে অক্ষর, প্রত্যেক অক্ষরের একমাত্র শব্দ। কিন্তু বাদবাকি বর্গগুলিতে কিছু বা পুরোণ বিদায়, কিছু বা নতুন আমদানী হয়েছে, সে সব কথা, খুঁটিনাটি করে বলা দরকার।

ঁ-বর্গ

চন্দ্রবিন্দু যে-ভেজাল খাঁটি নাকীস্বরের চিহ্ন, তাই ওকে বর্গের মাথায় বসিয়ে ওর নামে বর্গের নাম দেওয়া গেল। তবে চন্দ্রবিন্দুতে বাংলা ব্যঞ্জন-শব্দের একটি গুণ নেই, অর্থাৎ ওর সঙ্গে অপর ব্যঞ্জন-শব্দের দ্বিত্ব না হয়েই যোগ হয়। দাঁতে জিভ চেপে নাকী আওয়াজ করলে ন্ (n) বেরয়, ঠোঁট চেপে করলে ম্ (m)। ঞ ও ণ-র বাংলায় আলাদা শব্দ কিছু নেই, ওদের কাজ অপর অক্ষর যোগে চালিয়ে নেওয়া যায়, তাই ফর্দ থেকে এ দুটি বাদ পড়্‌ল।

অপর ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাক্‌লে ঞ-র শব্দ ঠিক দন্ত্যন-র মত। মঞ্চ=মন্‌চ, গঞ্জ=গন্‌জ, ঝঞ্ঝন্=ছন্‌ঝন্। ঞ একলা পড়লে য় ছাড়া আর কিছু নয়—ডেঞে=ডেয়েঁ। যাচ্ঞা কথায় ঞ ঙ্গ-র মত হয়ে যায় (যাচিঙ্গা)। ঞ-র খাঁটি আওয়াজ হিস্পানী Senor প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষার কথায় আজও

পাওয়া যায়, রাঢ় দেশের স্থানে স্থানে যাইঞা খাইঞার মধ্যে ঞ-শব্দ অস্থানে রয়ে গেছে, কিন্তু কলকাতাই বাংলায় তা মোটেই নেই।

ণ-র "আনো"[২] নাম থেকে অনুমান হয় যে ওর মূর্দ্ধন্য উচ্চারণের সঙ্গে বাংলার এককালে পরিচয় ছিল। দাক্ষিণাত্যে এই বর্ণ মূর্ধ থেকে উচ্চারণ হয় এবং সেখানে বর্ণমালা আওড়াবার সময় ওকে "অণ" বলে পড়া হয়। টাকরার উপর দিকে জিভ নিয়ে যেতে গেলে ণ শব্দ বার হবার আগে একটা অ শব্দ আপনি এসে পড়ে। কিন্তু বাংলায়, এখনকার মত মূর্দ্ধন্য ণ-কে অবিকল দন্ত্য ন-র মত উচ্চারণ করতে হলে, ওকে "আনো" নাম দেবার কোন কারণ বা মানে থাকে না। যা হোক্, একালে খাঁটি মূর্দ্ধন্য ণ শব্দ বাংলা থেকে এমনি লোপ পেয়েছে যে ইচ্ছে করলেও তা বাঙালীর মুখ দিয়ে বার হওয়া ভার।

বাংলার ঙ শব্দ ন-য়ে গ-য়ে মোলায়েম মিলনের ফল। বাংলা কথায় যে-কোন দুই ব্যঞ্জনবর্ণের যোগ হলে একটি ঝোঁক এসে পড়ে, যার ফলে যুক্ত শব্দের একটির (প্রায়ই দ্বিতীয়টির)[৩] দ্বিত্ব হয়। কর্জ্জ দুই জ দিয়ে লিখি, আর এক জ দিয়ে কর্জা লিখি। উচ্চারণের বেলা জ-টি ডবল না হয়ে যায় না। কিন্তু ঙ শব্দে গ-র দ্বিত্ব না হয়েই ন-য়ে গ-য়ে-যোগ হয়েছে, তাই বর্ণমালার অপর অক্ষর যোগে এ আওয়াজটুকু পাবার যো নেই। গ-র দ্বিত্ব নিয়েই ঙ-য় ঙ্গ-য় প্রভেদ এবং সেই কারণেই কলকাতাই উচ্চারণে যাঁদের কান তৈরী তাঁরা আজকাল বাঙ্গালী ও বাঙ্গলা না লিখে বাঙালী ও বাংলা লিখতে বাধ্য হন।

য়-বর্গ

যে অক্ষরটাকে অন্তস্থ য বলা হয় (সে যখন কথার আদ্যন্ত মধ্যে সমভাবে বিরাজ করে তখন তার অন্তস্থ নাম ঘুচিয়ে দিলে মন্দ হয় না)। তার আওয়াজ বর্গীয় জ থেকে কোন অংশে ভিন্ন নয়, কাজেই এ অক্ষর আমার শব্দমালায় স্থান পেতে পারে না। অন্তস্থ য বাদ দিয়েও, এই তরল য়-বর্গে অপর সকল বর্গের

---

২ ছেলেদের পাখী-আঁকার ছড়া—

এক ছিল আনো
তার পিঠে চেপেছে দানো। ইত্যাদি।

৩ য-ফলা ব-ফলা, ম-ফলা যোগ হলে ফলাটি লোপ বা লুপ্তপ্রায় হয়ে যুক্ত বর্ণের প্রথমটির দ্বিত্ব হয়—যেমন প্রাপ্য (প্রাপ্প), অশ্ব (অশ্‌শ), পদ্ম (পদ্দ)। র-ফলা অবশ্য লোপ হয় না—যেমন অপ্রিয় (অপ্‌প্রিয়)।

চেয়ে শব্দসংখ্যা বেশী। বিদেশের লোকে যে বাংলা কথাকে শুনতে মিষ্টি বলে, সেটা হয়ত এই তরল শব্দের প্রাচুর্যে।

বাংলা য় ইংরেজী y-র কাজ করা সম্বন্ধে সুনীতিবাবুর মনে যেন একটু কিন্তু রয়ে গেছে, যার তাৎপর্য আমি ঠিক ধরতে পারিনি। পূর্বে য় (yaw) অক্ষরকে অন্তস্থ-অ বলা হত, এবং হয়ত তার উচ্চারণ অ-র মতই ছিল। কিন্তু আজকাল ছায়া বায়ুর ত কথাই নেই, কেয়ূর, ময়ূরকেও বেশীর ভাগ শিক্ষিত লোক কেউর, মউর না বলে Keyur, Mayur বল্‌বে। সুতরাং য়ুরোপে (Europe)-কে ঘুরিয়ে ইউরোপ লেখার কোন আবশ্যক নেই। y-শব্দের সঙ্গে বাংলার কোন বিরোধ দূরে থাক্, এটা বাঙালীর বিশেষ প্রিয়পাত্র বলেই ত মনে হয়। সুনীতিবাবু দেখিয়েছেন যে, এ শব্দটা মীড়ের মত বাংলা গানের কথার কাঁটা খোঁচা মেরে দেবার কাজে লাগে। আমাদের সঙ্গীতে যেমন এ ক স্বর থেকে আর স্বরে মীড়ের টানে বেমালুম যাতায়াত করা হয়, বাংলা গানের কথা সুরে গাইতেও তেমনি, এক স্বর-বর্ণের পিঠ-পিঠ অপর স্বর উচ্চারণ করতে হলে য়-মীড় দিয়ে আওয়াজটা নরম করে নেওয়া হয়। মা-আমার গাইতে মা-য়-আমার বেরিয়ে যায়; কে-আসে কে-য়-া-সে হয়ে পড়ে।[৪]

দেবনাগরী ব-র বা ইংরেজী w-র শব্দ (বাংলা অক্ষরে পেটকাটা ৰ দিয়ে লেখা যেতে পারে) কম হলেও আছে। ফার্সী থেকে নেওয়া (newa) কথায় এ শব্দ বেশীর ভাগ পাওয়া (pawa) যায়—যেমন হাওয়া (hawa) খাওয়া (khawa)। ও আর য় মিলিয়ে w শব্দটাকে জবড়জং করে না লিখে ৰ দিয়ে লিখলেই ত বেশ পরিষ্কার হয়—যেমন মারৰাড়ী, কাবুলিৰালা। তবে কিনা আমাদের দেশে ভাল বলে স্বীকার আর কাজ করার মধ্যে অন্তরায়টা কিছু ভীষণ গোছের।

শ-বর্গ

মূর্ধন্য ষ শব্দ ণ-শব্দেরই মত বাংলা থেকে লোপ পেয়েছে। এখন ওটা বাঙালীর পক্ষে ইচ্ছে করলেও উচ্চারণ করা কঠিন।

দন্ত্য-স (ইং s) শব্দটা বাংলায় এক পক্ষে কম বটে, কিন্তু অপর পক্ষে

৪ তাছাড়া, য় শব্দের মোলায়েম অমায়িকতার গুণে বাংলা ভাষায় "য়ে" কথাটা কিনা করতে পারে? কড়া কথাকে মিঠেকরা, মগজে খাটানি বাঁচিয়ে জিব-চালাবার সুখ-ভোগের ব্যবস্থা করা, বক্তার বুদ্ধির অভাব শ্রোতাকে পূর্ণ করতে বাধ্য করা, প্রভৃতি ওর অসাধ্য কর্ম কিছু নেই।

যেটুকু আছে তা নিজস্ব অক্ষর ছাড়িয়ে তালব্য শ ও মূর্ধন্য ষ এদেরও এলাকার অংশ জবর-দখল করেছে—যেমন শ্রী (Sri), শ্রম (Srom), ষ্ট্যাম্প (Stamp), ষ্টেশন (Station)। ইংরেজী কথা বাংলায় লিখতে যখন বানানটা ইচ্ছেমত করার বাধা নেই, তখন স্ট্যাম্প, স্টেশন লিখে S-শব্দটাকে ওর আসল দন্ত্য-স চিহ্ন দিতে আপত্তি কি? এ শব্দ পূর্ববঙ্গে ছ দিয়ে লেখা হয়—যেমন ছোলেনামা—(Solenama); কিন্তু ছোলে লিখলে কলকাতায় Solay না প'ড়ে Chholay পড়বে। যে দিক দিয়েই দেখা যাক্, দন্ত্যস-র স্ব-শব্দ একেবারে উড়িয়ে দিলে বাংলা লিপিকে মিছিমিছি কানা করে রাখা হয়।

দন্ত্যস-র জায়গাটুকু বাদ দিলে বাংলায় বাকি সব তালব্য শ-র রাজত্ব, তাই এর নামেই বর্গের নামকরণ করা গেল। সবিশেষ কথাটার তিন শ-র উচ্চারণে কোন তফাত নেই। এই তিন শ কথাটা শুনলে মারাঠীভাষী হাস্‌বে, কারণ তার কাছে শ একটি মাত্র, অপর দুটীর একটি Sa, অন্যটি বাঙালীর অনুচ্চারণীয় মূর্ধন্য ষ,—হিন্দি ভাষায় খ দিয়ে যার কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করে (হিন্দি মানুখ্ = মানুষ)।

চ (ts) শব্দ মোলায়েম ভাবে ৎ ও স যোগের ফল। মারাঠী "চাংলা" কথাটা যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই এর খাঁটি রূপ জেনেছেন। পূর্ববঙ্গের চাল, চিঁড়ে প্রভৃতির উচ্চারণেও এই চ (ts) পাওয়া যায়। কলকাতাই ভাষায় যে সকল সাধু কথার ছ মুখের কথায় চ হয়—যেমন "চলিয়াচি" থেকে "চলেছি"—সেই চ-র উচ্চারণ চ (ts) হয়, তবে মারাঠী ভাষার মত অতটা স্পষ্ট নয়—চলেচি —choletsi। ব্যঙ্গ করেও সময় সময় চ-কে চ-শব্দ দেওয়া হয়—চমৎকার (tsmotkar) আর কি!

জ (z) শব্দ কলকাতাই উচ্চারণে চলিত নেই বলে হঠাৎ মনে হতে পারে, কিন্তু সাজতে (shazte), বুঝতে (buzte), মেজ্‌দা (mezda) নমুনাগুলি পেলে আর সন্দেহ থাকে না।

হ-বর্গ

প্রশ্বাসের নানা শব্দে হ বর্গের উৎপত্তি। অবাধে শ্বাস ছাড়লে শুদ্ধ হ জন্মায়। শ্বাস গলায় বাধা পেলে আরবী ফার্সী ধরনের Guttural খ, এবং ঠোঁটে বাধা পেলে ঠোঁটের ভঙ্গী ভেদে ফ (f) ও ভ (v) শব্দের উৎপত্তি হয়।

বাংলায় খ-র Guttural (ঘরঘড়ে) শব্দ শুনতে হলে চাটগাঁয় যেতে হয়।

কলকাতাই উচ্চারণে এ শব্দ দৈবাৎ শোনা যায় মাত্র—যেমন বিরক্তির আঃ (আখ্)।

ফ (f) আওয়াজটা বাংলা কথার স্বাভাবিক ধ্বনির সঙ্গে তেমন মিশ খায় না। তবে ফার্সীর ছোঁয়াচে এটা বাংলায় ঢুকে রয়ে গেছে—যেমন সাফ্ (Saf), তফাৎ (tafat)। কেও কেও ফুলে ফলেও এ শব্দ আনতে চান (ful, fal) কিন্তু সে ফেশনের বে'কুফীকে তারিফ্ করা যায় না!

ভ (v) বাংলার একটি বিবাদী আওয়াজ। এর ন্যায্য ব্যবহার একমাত্র হ্-য়ে ব-য়ের (হ্ব) উচ্চারণে পাওয়া যায়। মারাঠী ভাষায়ও সম্ভবত তাই; কেননা মারাঠীতে Victoria-কে হ্বিক্টোরিয়া লেখে। বাঙালীর মুখে হ্ব যুক্তাক্ষরটি যথা লিখিতং তথা কথিতং হয় না। কারও কারও মুখে ওটা ব-য়ে ভ-য়ের মতো উচ্চারণ হয়। যেমন বিভ্বল (বিহ্বল)। কিন্তু আজকাল কলকাতার শিক্ষিত সমাজের কায়দা হচ্ছে হ ও ব-র জায়গা অদল-বদল ক'রে হ্-কে শেষে ফেলা, তারপর ব-কে ভ (v) উচ্চারণ করা। তবে সে ভ (v) উচ্চারণের মধ্যে একটু রকমারি আছে। যুক্তাক্ষরের বাংলা রীতি অনুসারে ঐ ভ (v) টার হ-র যোগে সাদা ভাবে দ্বিত্ব না হয়ে ওটা uv বা ov হয়ে যায়—যেমন জিহ্বা = jiuvha, গহ্বর = gaovhar। সুনীতিবাবু আশঙ্কা করেন যে ভ (v) শব্দ সভ্য উচ্চারণকেও আক্রমণ করবার যোগাড়ে আছে। তা যদি হয় তবে আশা করি অবস্থা এখনও Voyonkar-হয়ে ওঠেনি—Sovvo উচ্চারণের বর্বরতা ভদ্রসমাজে Voolay ও চলবে না![৫]

বাংলার বিসর্গ বেশীর ভাগ হসন্ত হ মাত্র। সময় বিশেষে হ-বর্গের অপর হসন্ত বর্ণেরও কাজ করে—যেমন, উঃ (uf), আঃ (German ach!)। বাংলা কথার শেষে বিসর্গটার আওয়াজ লোপ পেয়েছে সুতরাং সেখানে ওর ফাঁকা

---

৫ বাংলা ভাষায় v শব্দের অনধিকার চর্চার মূল সম্বন্ধে আমার Theory এই—

ইংরেজ আমলের আগে এ শব্দ বাঙালীর মুখে আনাও দরকার হত না, জানা-ও ছিল না। কাজেই রাজভাষার v যখন দায়ে ঠেকে বার করবার চেষ্টা করতে হল, তখন প্রথম প্রথম বাংলা ভ দিয়েই তার কাজ চালিয়ে দিয়ে Victoria কোনমৎ প্রকারে ভিক্টোরিয়া ব'লে উচ্চারিত হল। ক্রমে, ইংরাজী উচ্চারণ সড়গড় হতে, যখন মুখ দিয়ে খাঁটি v কাড়া সম্ভব হ'ল, তখন নূতন বিদ্যের আহ্লাদে দরকারে-বেদরকারে যেখানেই ভ দেখা, সেইখানেই v বলার লোভ সামলান মুস্কিল হয়ে পড়ল। তাই বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণকান্তের উইলের নাটকের বিজ্ঞাপনে Vramar! Vramar! ক'রে ক্ষেপিয়ে তোলে। রোগের উৎপত্তি ঠিক করতে পারলে চিকিৎসার বিলম্ব হ'বে না এই আশায় Theoryটি ব'লে রাখা গেল।

চেহারা দেখিয়ে লাভ কি? বিদ্যাসাগরের আমলে শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ প্রভৃতি বিসর্গ দিয়ে বানান করা হত, এখন সাবালক ব্যাঙাচির মতো স্রোত বিনা ল্যাজে বেশ চলেছে। তবে আর কেন? আপাতত ক্রমশ প্রভৃতির বিসর্গগুলিকেও কালের স্রোতে ভেসে যেতে দেওয়াই শ্রেয়।

স্বরবর্ণ

বাংলা শব্দের লিপি হিসেবে পণ্ডিতি ব্যঞ্জনবর্ণের চেয়ে স্বরবর্ণের গণ্ডগোল আরও বেশী। বর্ণপরিচয়ে আজকাল অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ, এই দশটি স্বরবর্ণ দেখান হয়। এই ফর্দটি অসংযুক্ত স্বরে, কেজো অক্ষরে বাজে অক্ষরে, এবং তদুপরি আবশ্যক অক্ষরের অভাবে, একটি আলোনা খিচুড়ি বিশেষ।

যুক্ত স্বরের মধ্যে শুধু ওই (ঐ), ওউ (ঔ) কেন; আই, উই এই আছে; আউ, ইউ, এউ আছে; আও, উও, এও আছে; একহারা স্বরগুলি উল্টে পাল্টে যত রকম Permutation-Combination হতে পারে প্রায় তত রকমই আছে। বাকিগুলির জন্যে যখন ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের দরকার হয়নি, তখন ঐ, ঔ, দুটিমাত্র রেখে বাংলা বর্ণমালা ভারী না করলেও চলত।

ঋ ঌ অক্ষর থাক্‌লে কি হবে, বাংলার মধ্যে ওরকম স্বর শব্দ কোথাও নেই। এ দুটির আওয়াজ র-য়ে ইকার (রি) ল-য়ে ইকার (লি) হয়ে রয়েছে। তার জন্যে আলাদা অক্ষর কেন?[৬] এ দুটি স্বর শব্দ আসলে কি (সংস্কৃত ভাষায় যা থাকায় স্বতন্ত্র অক্ষর আবশ্যক হয়েছিল) তাই বা কজন বাঙালী খবর রাখে? ঋ হচ্ছে র-র রত্ব অর্থাৎ জীভ কাঁপার মর্মর রব। আর ঌ হচ্ছে ল-র লত্ব অর্থাৎ জীভের ধারে ধারে লালা-কল্লোল কলধ্বনি। ইংরেজী little কথার শেষে ঌ-র আওয়াজ পাওয়া যায়। ফরাসী Chambre (উচ্চারণ শাঁব্র্‌) কথার শেষে ঋ। সংস্কৃত আমলে লিট্‌ঌ ও শাঁবৃ লিখলে এই ইংরাজীও ফরাসী কথা দুটি ঠিকমত উচ্চারণ হতে পারত, কিন্তু ও ভাবে বানান করলে বাঙালীর দ্বারা তা হবে না।[৭] মোট কথা বাংলার চলিত কোনো স্বরে শব্দ লিখতে ঋ বা ঌ অক্ষরের প্রয়োজন হয় না।

---

৬ বিকৃতি (Bikriti)তে বিক্রিতি (Bikkriti)তে ক'র দ্বিত্ব ঘটিত উচ্চারণের যে তফাত আছে, দুঃখের বিষয় সেটা পড়বার সময় কেও কেউ মেনে চলেন না। ব্যঞ্জন র-ফলার মতো পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন-শব্দের দ্বিত্ব ঘটাতে না পারায় ঋকারের যা একটু স্বত্ব বাংলায়ও রহে গেছে।

বাংলার অ সংস্কৃত অ-র মত, হ্রস্ব আ (অা) নয়। আমাদের অ একেবারে আলাদা স্বর শব্দের চিহ্ন যার আওয়াজ ইংরেজী aw দিয়ে বোঝান যেতে পারে।

ইকার ও উকারের যেমন হ্রস্ব দীর্ঘ আছে তেমনি বাংলার অপর সকল স্বরশব্দেরই হ্রস্ব দীর্ঘ আছে, কিন্তু, সে সবের জন্যে স্বতন্ত্র অক্ষরের অভাবেও কাজ বেশ চলে যাচ্ছে। তাতে বোঝা যায় যে দীর্ঘ ঈ ও ঊ অক্ষর বাহুল্য। এমন কি, ইকার উকারের আলাদা হ্রস্ব দীর্ঘ চিহ্ন না থাকলেই ভাল হত, কারণ বাংলার বানান চলে একদিকে উচ্চারণ বলে অপরদিকে, তাতে ক'রে বাংলা ছাত্রের মাথা খারাপ করা ছাড়া এই ফাজিল চিহ্নগুলি আর কোনো কাজে লাগে না। আমরা লিখি তিন, বলি তীন (ইকারের হ্রস্বত্ব ইং tin শব্দে খাঁটি পাওয়া যায়), লিখি সতী, বলি সতি ; লিখি কূল, বলি কুল (হ্রস্ব উকার কাকে বলে তা হিন্দী কুল্ শব্দে পরিষ্কার শোনা যায়) ; লিখি মুহূর্ত বলি মূহুর্ত।

যাহোক্, যত রকম স্বরশব্দ আছে, আর এক এক স্বরের যত রকমের মাত্রা (হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি) পাওয়া যায়, দৃষ্টান্ত সমেত তার ফর্দ ধ'রে দিলেই আসল অবস্থাটা ত বোঝা যাবে। তবে, কোনো কালে সংস্কৃত বর্ণমালার হাত থেকে রেহাই পেয়ে, বাংলার অবস্থার মতো ব্যবস্থা হয়ে উঠ্‌বে কি না তা' কে বলতে পারে ?

যে স্বর—শব্দমালা নীচে সাজিয়ে দেওয়া যাচ্ছে সেটা পড়বার সময় মনে রাখা আবশ্যক যে বাংলায় স্বরের দৈর্ঘ্য দুরকমে হয়—১। টানে ২। ঝোঁকে। যেমন বাক্য কথাটার আকার ঝোঁকে দীর্ঘ, বাক্ কথাটার আকার টানে দীর্ঘ। রাধার রা ঝোঁকে দীর্ঘ, রাধার ধা ঝোঁক্ টান দুইয়েরই অভাবে হ্রস্ব। ইং hat, mat, eat সবই হ্রস্ব ; এক (অ্যাক) টানে দীর্ঘ ; act ঝোঁকে দীর্ঘ।

হ্রস্ব—ইং doll (ডল্), কত, কথা, অকপট।
অ দীর্ঘ—ইং ball (বল্), ছল, দল।
চাপা—ইং cut (কট্), বস্, আপনি, আমরা।

---

৩ দাক্ষিণাত্যে ঋ, ঌ-কে বাংলা হিন্দীর মতো, রি, লি উচ্চারণ না ক'রে, রু, লু বলে। দাক্ষিণাত্যের বেশীর ভাগ সংস্কৃত উচ্চারণ বাংলার চেয়ে বিশুদ্ধ ব'লে বাঙালীরা অনেক সময় মনে করেন যে এই রু, লু-ই বুঝি খাঁটি সংস্কৃত উচ্চারণ। কিন্তু উপরে গেছে যে তা নয়। সুনীতিবাবু দেখেছেন যে কোনো প্রাকৃত ভাষায় ঋ, ঌ-র আসল উচ্চারণ বজায় রাখা হয়নি।

লুপ্ত আকারের চিহ্নটা সংস্কৃত কথা অবিকল লিখতে ছাড়া বাংলায় কোনো কাজে আসে না।

হ্রস্ব—আমি, রোগা, রাধার ধা।

আ

দীর্ঘ—রাধার রা, গাছ, বাড়ী।

হ্রস্ব—চিঠি, পাই, সতী, চাষী।

ই

দীর্ঘ—তিন, দীন, বীর, স্থবির।

অস্ফুট—পূর্ববঙ্গের কাইল (কালি), বাইক্ক (বাক্য) প্রভৃতি কলকাতাই উচ্চারণে এই ই শব্দটা অস্ফুট ভাবেও নেই, অর্থাৎ অস্ফুট ই-টা লোপ পেয়েছে।[৮]

হ্রস্ব—সাধু, তুলা, ধূলা।

উ

দীর্ঘ—চুল, কুল, কূপ, রূপ।

হ্রস্ব—লোহা, বোঝা, গতি (গোতি) মন্দ (মোন্দো)।

ও

দীর্ঘ—রোগ, শোক, শ্রম (Srom) যম (জোম)।

হ্রস্ব—একটু, বেদানা, সময়ে, ব্যক্তি (বেক্তি)।

এ

দীর্ঘ—বেদ, উদ্দেশ, ক্লেশ।

হ্রস্ব—ব্যস্ত (ব্যাস্ত), ত্যজ্য (ত্যাজ্য), সমস্যা।

অ্যা

দীর্ঘ—এক (অ্যাক), ত্যাগ, ব্যাকুল।

৮ কলকাতাই উচ্চারণে সাধু ভাষার ই যেখানে যেখানে সেখানে কিন্তু সে তার প্রভাব রেখে গেছে। অন্যান্য গুণের মধ্যে ইকার পূর্ববর্তী অকারের উচ্চারণ ওকারের মত ক'রে দেয়। আমরা সাধু "করিয়া" স্থলে পূর্ববঙ্গের মতো "কইর‍্যা" বলিনে বটে, কিন্তু "কোরে" বলি। মুখের ভাষা লিখ্‌তে হলে সমাপিকা করে (Kawre) ও অসমাপিকা করে (Kore) এ দুইয়ের প্রভেদ বাঁচিয়ে বানান করা উচিত, নইলে পাঠকের পড়তে গোল লাগবে। কেও কেও ক-য়ে ওকার দিয়ে অসমাপিকা "কোরে" লেখবার পক্ষপাতী, কিন্তু তার চেয়ে লুপ্ত ইকারের চিহ্ন দিয়ে "ক'রে" লেখা ভাল, এ বিষয়ে অধিকাংশ লোকের রায় যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুরের সঙ্গে মতের মিল হবে, কারণ তাহলে বানানের মধ্যে উৎপত্তির ইতিহাসটুকু থেকে যায়।

হ্রস্ব-দীর্ঘের আলাদা চিহ্ন দরকার নেই তা ত দেখা গেল। কিন্তু বাহুল্য নিয়ে যদি বা চালান যায়, তবু অভাব নিয়ে আর চুপ ক'রে ব'সে থাকা চলে না। বাংলা এখন আর কুনো অবস্থায় নেই—বিদেশী কথা নিয়ে কারবার করতে হচ্ছে, কাজেই একছুটে থাকলে আর ভাল দেখায় না। মারাঠীতে খোলা অ (all) চাপা অ (us) ও অ্যা শব্দের অক্ষর ছিল না। তারা অকারে চিহ্ন দিয়ে চাপা অ, আকারে চিহ্ন দিয়ে খোলা অ, একারে চিহ্ন দিয়ে অ্যা, ক'রে নিয়েছে—যেমন ঑াঁল্ (all), অঁাস্ (us) আমি বলি মাথায় ৺ দিয়ে চাপা অ, আর মাথায় ৺ দিয়ে খোলা এ (অ্যা) বাংলায় বেশ চিহ্নিত হতে পারে। যেমন Cut=কঁট্, Cat=কেঁট। এছাড়া আবশ্যক মতো য়ুরোপীয় হ্রস্ব ও দীর্ঘের সাধারণ চিহ্ন ব্যবহার করলে আর বাংলায় স্বরলিপিকে কোন শব্দ লিখনে পিছপাও থাকতে হয় না। ওদিকে ত ব্যঞ্জনলিপিতে ব-র পেট কেটে, আর জ, ফ, ভ-তে বিন্দু দিয়ে, সকল চলিত ব্যঞ্জন-শব্দের অক্ষর পূরণ ক'রে নেওয়া গেছে।

চিহ্নের কথা বলতে মনে হল যে বাংলা হাতের লেখা থেকে ছাপার অক্ষর তৈরী সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত ভাল ক'রে মাথা খাটান হয়নি। চীনে ভাষার কম্পোজিটারদের মতো ঘরের এক পাশ থেকে আর এক পাশ দৌড়-দৌড়ির আবশ্যক না হলেও অক্ষর ও চিহ্নের বাহুল্যের কারণে বাংলা ছাপাখানার অনেক অনর্থক অসুবিধে ভোগ করতে হয়। রেল-গাড়ি মোটর-গাড়ি সবই প্রথম প্রথম ঘোড়া-গাড়ির গড়নে তৈরী হয়েছিল, ক্রমে স্ব স্ব ধর্ম অনুসারে তাদের চেহারা বদলে এসেছে। বাংলার ছাপার অক্ষরেরও এখন নিজমূর্তি ধারণ করবার সময় হয়েছে। কিন্তু এ আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে নয়।

'সবুজ পত্র'। অগ্রহায়ণ ১৩২৪

বাংলার দুর্বলতা

শ্রীঅরবিন্দ

১৮৭২ - ১৯৫০

আমার এ ধারণা হয় যে, ভারতের দুর্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয় দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্ম বোধের বা ধর্মের অভাব নয়, কিন্তু চিন্তাশক্তির হ্রাস—জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। সর্বত্রই দেখি inability বা unwillingness to think, চিন্তা করার অক্ষমতা বা চিন্তা-"ফোবিয়া"। মধ্যযুগে যাই হোক, কিন্তু এখন এই ভাবটি ঘোর অবনতির লক্ষণ। মধ্যযুগে ছিল রাত্রিকাল, অজ্ঞানীর জয়ের দিন। আধুনিক জগতে জ্ঞানের জয়ের যুগ। যে বেশী চিন্তা করে, বিশ্বের সত্য তলিয়ে শিখতে পারে, তার তত শক্তি বাড়ে। য়ুরোপ দেখ, দেখবে দুটো জিনিস—অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র, আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ সুশৃঙ্খল শক্তির খেলা। য়ুরোপের সমস্ত শক্তি সেইখানে ; সেই শক্তির বলে জগতকে সে গ্রাস করতে পারছে ; আমাদের পুরাকালের তপস্বীদের মতো, যাদের প্রভাবে বিশ্বের দেবতারাও ভীত, সন্দিগ্ধ, বশীভূত। লোকে বলে, য়ুরোপ ধ্বংসের মুখে ধাবিত। আমি তা মনে করি না। এই যে বিপ্লব, এই যে ওলটপালট—এসব নব সৃষ্টির পূর্বাবস্থা।

তারপর ভারত দেখ। কয়েকজন solitary giant ছাড়া সর্বত্রই সোজা মানুষ, average man ; যে চিন্তা করতে চায়না, পারেনা। যার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা। ভারতে চায় সরল চিন্তা, সোজা কথা ; য়ুরোপে চায় গভীর চিন্তা, গভীর কথা। সামান্য কুলিমজুরও চিন্তা করে, সব জানতে চায়, মোটামুটি জেনেও সন্তুষ্ট নয়, তলিয়ে দেখতে চায়। প্রভেদ এই যে, য়ুরোপে শক্তি ও চিন্তার Fatal limitation আছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে এসে তার চিন্তা শক্তি আর চলে না। সেখানে য়ুরোপ সব দেখে হেঁয়ালি, Nebulous metaphysics, yogic hallucination ; ধোঁয়ায় চোখ রগড়ে কিছু ঠাহর করতে পারে না। তবে এখন এই limitation ও surmount করবার য়ুরোপে কম চেষ্টা হচ্ছে না। আমাদের অধ্যাত্মবোধ আছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের গুণে ; আর যার সেই বোধ আছে তার হাতের কাছে রয়েছে এমন জ্ঞান এমন শক্তি যার এক ফুৎকারে য়ুরোপের সমস্ত প্রকাণ্ড শক্তি তৃণের মতো উড়ে যেতে পারে। কিন্তু সে শক্তি পাবার জন্য শক্তির (উপাসনা) দরকার। আমরা কিন্তু শক্তির উপাসক নই ; সহজের উপাসক ; সহজে শক্তি

পাওয়া যায় না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিশাল চিন্তার সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে বিশাল জ্ঞান পেয়েছিলেন ; বিশাল সভ্যতা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা পথে যেতে যেতে অবসাদ এসে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে ; চিন্তার বেগ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বেগও কমে গেল। আমাদের সভ্যতা হয়ে গেছে অচলায়তন, ধর্ম বাহ্যের গোঁড়ামি, অধ্যাত্মভাব একটি ক্ষীণ আলোক বা ক্ষণিক উন্মাদনার তরঙ্গ। এই অবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন ভারতের স্থায়ী পুনরুত্থান অসম্ভব।

বাংলা দেশেই এই দুর্বলতার চরম অবস্থা। বাঙালীর ক্ষিপ্র বুদ্ধি আছে, ভাবের capacity আছে, intuition আছে ; এইসব গুণে সে ভারতে শ্রেষ্ঠ। এই সকল গুণই চাই, কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট নহে। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীর শক্তি, বিরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তা' হলে বাঙালী ভারতের কেন, জগতের নেতা হ'য়ে যাবে। কিন্তু বাঙালী তা' চায় না ; সহজে সারতে চায় ; চিন্তা না করে জ্ঞান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজ সাধনা করে সিদ্ধি। তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, কিন্তু জ্ঞানশূন্য ভাবাতিশয্যই হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ। তারপর অবসাদ তমোভাব। এদিকে দেশের ক্রমশ অবনতি ; জীবনশক্তি হ্রাস হয়েছে ; শেষে বাঙালী নিজের দেশে কি হয়েছে—খেতে পাচ্ছে না, পরবার কাপড় পাচ্ছে না, চারিদিকে হাহাকার, ধনদৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি, চাষ, পর্যন্ত পরের হাতে যেতে আরম্ভ কচ্ছে। শক্তি সাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নাই (সেখানে) প্রেমও থাকে না, সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা আসে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মনে, প্রাণে হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই। প্রেম কোথায় বঙ্গদেশে? যত ঝগড়া, মনোমালিন্য ঈর্ষা, ঘৃণা, দলাদলি এ দেশে আছে, ভেদক্লিষ্ট ভারতে, ও আর কোথাও তত নাই।

আর্যজাতির উদার বীরযুগে এত হাঁকডাক নাচানাচি ছিলনা, কিন্তু যে চেষ্টা আরম্ভ করত তারা, তা বহু শতাব্দী ধরে স্থায়ী থাকত। বাঙালীর চেষ্টা দু'দিন স্থায়ী থাকে।

তুমি বল্‌চ চাই ভাব উন্মাদনা, দেশকে মাতান। রাজনীতিক্ষেত্রে ও-সব করেছিলাম, স্বদেশী সময়ে যা করেছিলাম সব ধূলিসাৎ হয়েছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে কি শুভতর পরিণাম হবে? আমি বলছি না যে কোনো ফল হয়নি। হয়েছে? যত movement হয়, তার কিছু ফল হয়ে দাঁড়াবে, তবে তা' অধিকাংশ possibility-র বৃদ্ধি ; স্থিরভাবে actualise করবার এটা ঠিক রীতি নয়।

সেইজন্য আমি আর emotional excitement ; ভাব, মন মাতানোকে base করতে চাই না। আমার যোগের প্রতিষ্ঠা করতে আমি চাই বিশাল বীরসমতা ; সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধারে সকল বৃত্তিতে পূর্ণ দৃঢ় ; অবিচলিত শক্তি ; শক্তিসমুদ্রে জ্ঞানসূর্যের রশ্মির বিস্তার ; সেই আলোকময় বিস্তারে অনন্ত প্রেম, আনন্দ, ঐক্যের স্থির ecstasy। লাখ লাখ শিষ্য চাই না ; একশ ক্ষুদ্র আমিত্ব-শূন্য পুরে মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে যদি পাই, তাই যথেষ্ট। প্রচলিত গুরুগিরির উপর আমার আস্থা নাই ; আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক, কেহ যদি ভিতর থেকে নিজের সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে ভগবৎ জীবন লাভ করে, এটাই আমি চাই। এইরূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।

'পণ্ডীচারীর পত্র'। ১৯২০

গৌড়রাজমালা

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৮৫ - ১৯৩০

গুপ্তরাজবংশের একখানি মাত্র তাম্রশাসন বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশের নানাস্থানে গুপ্তসম্রাটগণের যে-সমস্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে বঙ্গদেশ তাঁহাদিগের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। সুতরাং গুপ্তসাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের বিবরণ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলে গ্রন্থখানির অঙ্গ পূর্ণ হইত। গুপ্তসাম্রাজ্যের ধ্বংস হইলে আর্যাবর্তের পূর্বসীমান্তের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় আবিষ্কৃত তাম্রশাসনের মুদ্রায় (মোহরে), ফরিদপুরে আবিষ্কৃত ধর্মাদিত্য ও গোপচন্দ্র নামক রাজদ্বয়ের তাম্রশাসনত্রয়ের মুদ্রায় এই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনুমান হয় গুপ্তবংশের অধিকার মগধের সীমায় বদ্ধ হইলে গৌড়ে ও বঙ্গে রাজকর্মচারীগণ স্বাধীন হইয়াছিলেন, কিন্তু পুরুষানুক্রমে প্রাচীন গুপ্তসাম্রাজ্যের সীলমোহর ব্যবহার করিতেন। গুর্জরাষ্ট্রে বলভীরাজগণ যেমন পুরুষানুক্রমে প্রতিষ্ঠাতা ভটার্কের নামাঙ্কিত সীলমোহর ব্যবহার করিতেন, উত্তরাপথের পূর্বপ্রান্তেও কুমারামাত্যাধিকরণ ও মণ্ডলাধিকরণগণের বংশধরগণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াও রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা গুপ্তসাম্রাজ্যের কর্মচারীরূপে সীলমোহর ব্যবহার করিতেন। মোগলসাম্রাজ্যের শেষ অবস্থায় দেশীয় রাজগণের কতকটা এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান্ সাম্রাজ্যের ভিত্তি এত দৃঢ় করিয়াছিলেন যে মহম্মদশাহের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা বস্তুত স্বাধীন হইয়াও প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে সাহসী হইতেন না। দাক্ষিণাত্যে চীন কিলীচ খাঁ, নিজাম-উল্ মুল্ক্, বঙ্গে মুর্শিদকুলী ওরফে জায়ার আলি খাঁ, অযোধ্যার কমর-উদ্দিন খাঁ ও তাঁহাদিগের বংশধর ও উত্তরাধিকারীগণ চিরকাল নবাব নিজাম, নবাব উজীর প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাজা ছিলেন। অযোধ্যায় বিদেশীয় বণিকগণের মন্ত্রণায় ভুলিয়া গাজিউদ্দিন হায়দার যখন বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন হিমবানের পদতল হইতে কুমারিকা পর্যন্ত যে দীর্ঘশ্বাস বহিয়াছিল তাহা মুসলমান ঐতিহাসিকের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র। হিন্দুস্থানবাসী মাত্রেই অযোধ্যায় নূতন বাদশাহকে মনে মনে অভিশাপ দিয়াছিল,

কিন্তু রাজভয়ে প্রকাশ্যে কোনো কথা বলিতে সাহসী হয় নাই। আর্কট, খাম্বায়ত (Cambay) প্রভৃতি স্থানে নবাব উপাধিধারী মোগল রাজকর্মচারীগণ পুরুষানুক্রমে স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করিয়া আসিয়াছেন, কেবল ইংরাজ আগমনে তাঁহাদিগের অধিকার লোপ পাইয়াছে। বিস্তৃত মোগলসাম্রাজ্যের একমাত্র চিহ্ন—হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অধিকারী এখনও নিজাম বা প্রতিনিধি উপাধিতে পরিচিত, ইতিহাসে তাঁহার অন্য নাম নাই! কোঙ্কণের পর্বতসঙ্কুল উপত্যকা সহেন্দ্র মহারাষ্ট্রজাতি যখন পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতেছিল তখনও বিশ্বাসরাও, বাজীরাও, মাধোরাও সিন্ধে, মলহার রাও হোলকার প্রভৃতি ইতিহাস বিশ্রুত মহারাষ্ট্র সেনানায়কগণ ময়ূরসিংহাসনে উপবিষ্ট চিত্রপুত্তলিকাবৎ তৈমুর বংশধরের নিকট সনদ ও উপাধি প্রাপ্ত হইয়া আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেন। এখনও মহারাষ্ট্র অধিপতিগণ দিল্লীর নামেমাত্র সম্রাটের প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করিয়া বংশগৌরবের পরিচয় দিয়া থাকেন।

যশোধর্মদেবের ক্ষণস্থায়ী সাম্রাজ্যের বিবরণ অতি সুন্দর হইয়াছে, গ্রন্থকার প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার হনলির ঐতিহাসিক স্বপ্নদর্শন বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মর্মোদ্ঘাটন করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আজকাল যাঁহারা শার্দ্ধদ্বাবিংশতি রজত মুদ্রার প্রভাবে প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য দীর্ঘ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাঁহারা বিলাতের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় কোনো প্রবন্ধ দেখিলেই তাহা ধ্রুবসত্য জ্ঞান করেন এবং কেহ প্রতিবাদ করিলে নাসিকাকুঞ্চন করিয়া থাকেন। এ শ্রেণীর বিদ্বন্মণ্ডলীকে "গৌড়রাজ মালা" পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সম্প্রতি ডাক্তার হনলি যশোধর্মদেব সম্বন্ধে এক নূতন স্বপ্ন দেখিতেছেন, ফরিদপুরের ধর্মাদিত্য ও যশোধর্মদেব একই ব্যক্তি ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। "গৌড়রাজমালা"র ধীমান্ গ্রন্থকার, বিচক্ষণ কর্ণধার যেমন সমুদ্রযাত্রাকালে ঝটিকার পথ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ, সংশয়াচ্ছন্ন ফরিদপুরের তাম্রশাসনগুলিকে দূরে রাখিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের নাম হইতে শতসহস্রবর্ষ প্রাচীন কলঙ্ককালিমা মোচনের চেষ্টা করিয়া রমাপ্রসাদবাবু স্বীয় স্বাধীন চিন্তা ও গভীর গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। শ্বেতাঙ্গ বা গৌরাঙ্গ ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্ববিদ কেহই এ পর্যন্ত শশাঙ্কের স্বপক্ষে কোনো কথা বলেন নাই। হিন্দুদ্বেষী বৌদ্ধগণ ত্রয়োদশ শতাব্দী ধরিয়া শশাঙ্কের কুৎসা করিয়াছে, প্রমাণাভাব মনে করিয়া বীরশ্রেষ্ঠ

গৌড়রাজের পক্ষ সমর্থনের জন্য কেহ একটি কথাও বলিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু প্রমাণ ছিল, স্থান্বীশ্বর রাজ্যের চাটুকার শোণতীরবাসী ব্রাহ্মণের গ্রন্থ মধ্যেই তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাই মৌলিক গবেষণা, ইহাই লুপ্ত ইতিহাসোদ্ধারের প্রকৃত পন্থা। কিন্তু "গৌড়রাজমালা"র সমালোচকবর্গের মধ্যে কয়জন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন? বাণভট্টের গ্রন্থের যতটুকু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে শশাঙ্কের প্রশংসাবাদ দূরে থাকুক, শিষ্টাচারসম্মত একটি বিশেষণও দেখিতে পাওয়া যায় না; চীন দেশীয় পরিব্রাজকেরা গ্রন্থে ব্রাহ্মণদ্বেষী বৌদ্ধধর্মযাজকগণের নিকট শ্রুত নিন্দারাশি দেখিতে পাওয়া যায়। বাণভট্ট ও হিউয়েন থ্‌সঙ্গ শশাঙ্কের প্রতি সহস্র গালিবর্ষণ না করিলে আমরা তাঁহার নাম পর্যন্ত শুনিতে পাইতাম না। শশাঙ্কের অপর নাম নগেন্দ্রগুপ্ত তিনি সম্ভবত গুপ্তবংশসম্ভূত ছিলেন। রাজ্যবর্ধনের হত্যা ও বোধিদ্রুম নাশ এই দুইটিই শশাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ। একপক্ষের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই শশাঙ্ককে দোষী স্থির করিয়াছেন। যদি কখনও শশাঙ্কের আশ্রিত কোনো ব্রাহ্মণ রচিত তদীয় জীবনচরিত আবিষ্কৃত হয় এবং যদি কখনও কোনো বৌদ্ধদেশে হিন্দুর ভ্রমণবৃত্তান্ত আবিষ্কৃত হয় তাহা হইলেই প্রকৃত ঘটনা জ্ঞাত হওয়া যাইবে। হর্ষের আশ্রয়ে প্রতিপালিত বাণভট্ট বলিয়া গিয়াছেন যে "বহু দিবস অতীত হইলে হর্ষ সংবাদ পাইলেন তাঁহার ভ্রাতা অক্লেশে মালব সৈন্যের পরাজয় সাধন করিতে সমর্থ হইলেও গৌড়াধিপ তাঁহাকে মিথ্যা লোভ দেখাইয়া বিশ্বাস উৎপাদন করাইয়া, স্বভবনে লইয়া গিয়া অস্ত্রহীন অবস্থায় একাকী পাইয়া গোপনে নিহত করিয়াছেন।" বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চীনদেশীয় পর্যটক বলিয়াছেন যে শশাঙ্ক, রাজ্যবর্ধনকে সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন। ইহা হইতে "গৌড়রাজমালা"র গ্রন্থকার যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা আর্যাবর্তের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হওয়া উচিত। গ্রন্থকার বলিতেছেন, "বাণভট্ট-প্রদত্ত রাজ্যবর্ধন নিধনের এই সংক্ষিপ্ত সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।" "গৌড়রাজমালা"র কয়জন সমালোচক ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? একজন প্রতিযোগী (মালবাধিপতি, যাঁহার ভগিনীপতিকে নিহত করিয়া ভগিনীকে শৃঙ্খলাবদ্ধচরণে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই রাজ্যবর্ধন যে মুখের কথায় ভুলিয়া একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় আর একজন প্রতিযোগীর (গৌড়াধিপের) ভবনে যাইতে সম্মত

হইয়াছিলেন তাহা সম্ভব নহে।) গ্রন্থকার 'হর্ষচরিতে' প্রকৃত ঘটনার আভাস দেখিতে পাইয়াছিলেন। মালবরাজকে পরাজিত করিয়া মাতুলপুত্র ভণ্ডির লুণ্ঠিত ধনরত্নাদি স্থান্বীশ্বরে প্রেরণ করিয়া রাজ্যবর্ধন কান্যকুব্জাভিমুখে চলিয়া গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে গৌড়েশ্বর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সম্ভবত তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন। কিরূপে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই। কিন্তু রাজ্যবর্ধন যে মিথ্যাপ্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া স্বেচ্ছায় গৌড়াধিপের শিবিরে গমন করেন নাই, গত্যন্তর ছিল না বলিয়াই গিয়াছিলেন, একথা গৌড়বঙ্গে পূর্বে কেহ শুনায় নাই। গ্রন্থকার আরও শুনাইয়াছেন নবীন স্থান্বীশ্বররাজ সত্যানুরোধে শত্রুভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

রাজ্যবর্ধন হত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ হর্ষবর্ধন গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করিয়াছিলেন। যুদ্ধের ফল আমরা জ্ঞাত নহি, কিন্তু হর্ষবর্ধন যখন কামরূপ হইতে পঞ্চনদ পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তরাপথ বিজয় করিয়াছিলেন, তখন গৌড়দেশ নিশ্চয়ই তাঁহার পদানত হইয়াছিল। গ্রন্থকার বলিতেছেন, "রাজ্যবর্ধনকে নিহত করিলে, সহজে উত্তরাপথে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হইবেন, এই আশায় শশাঙ্ক শরণাগত রাজ্যবর্ধনকে নিষ্ঠুরভাবে নিহত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা গৌড়াধিপের অদৃষ্টে সার্বভৌমের পদলাভ লেখেন নাই।" তবে কি সত্যসত্যই শশাঙ্ক, রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করিয়া গুপ্ত বংশ কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। শশাঙ্কের শত শত স্বর্ণমুদ্রা বঙ্গদেশের নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার কতকগুলিতে "শশাঙ্ক" এবং কতকগুলিতে "নরেন্দ্রগুপ্ত" নাম পাওয়া যায়। ডাক্তার বুলার বলিয়াছেন যে, "হর্ষচরিতের" একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থে শশাঙ্কের স্থলে নরেন্দ্রগুপ্তের নাম দেখিয়াছেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্রগুপ্ত এবং তিনি মগধের গুপ্তবংশসম্ভূত। মগধের গুপ্তরাজবংশের কোনো খোদিত লিপিতে অদ্যাপি শশাঙ্কের বা নরেন্দ্রগুপ্তের নাম আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে অদ্যাবধি উত্তরাপথ বা দক্ষিণাপথে কোনো খোদিত লিপিতে শশাঙ্কের বংশপরিচয় আবিষ্কৃত হয় নাই। মগধের গুপ্তরাজবংশের মাধবগুপ্ত হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। উত্তরকালে যদি কখনও শশাঙ্কের বংশপরিচয় আবিষ্কৃত হয় তাহা হইলে হয়ত দেখিতে পাওয়া যাইবে যে মগধরাজ্যে শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত মাধবগুপ্তের পূর্ববর্তী রাজা। অনেক সময়ে জ্যেষ্ঠ অপুত্রক অবস্থায় মৃত হইলে বা কনিষ্ঠ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলে কনিষ্ঠের বা তদ্বংশীয়গণের রাজ্যকালীন উৎকীর্ণলিপিতে জ্যেষ্ঠের নাম পাওয়া

যায় না। ভিটাই গ্রামে আবিষ্কৃত সম্রাট দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের সীলমোহরে তাঁহার পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্রাট স্কন্দগুপ্তের নাম নাই। শশাঙ্ক যে স্বেচ্ছায় বিরুদ্ধে উদ্ধত স্থান্বীশ্বররাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন একথা কেহ বলিতেছেন না, সকলেই বাণভট্ট ও হিউয়ান্ থ্সাঙ্গের উক্তির উপরে নির্ভর করিয়া গৌড়রাজকে স্থান্বীশ্বর যুদ্ধের জন্য অপরাধী স্থির করিতেছেন। শশাঙ্ক হয়ত আত্মরক্ষার জন্য রাজ্যবর্ধনকে নিহত করিয়াছিলেন, হয়ত পিতৃরাজ্য রক্ষার্থ গুপ্তবংশসম্ভূত রাজগণের চিরশত্রু স্থান্বীশ্বরাধিপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, হয়ত তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ গৌড়ের স্বাধীনতা রক্ষার্থ যুদ্ধযাত্রায় অতিবাহিত হইয়াছিল। চীন পরিব্রাজকের একটি কথা মিথ্যা, তাহা "গৌড়রাজমালা"র গ্রন্থকারও স্বীকার করিয়াছেন। হর্ষবর্ধনের সিংহাসনপ্রাপ্তির ছয় বৎসর মধ্যে শশাঙ্ক বিজিত হন নাই। হর্ষের রাজ্যাভিষেকের ত্রয়োদশ বর্ষ পরেও শশাঙ্ক সম্রাট উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। স্থান্বীশ্বরের অগণিত সেনা হয়ত তাঁহাকে গৌড়বঙ্গ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল, কিন্তু পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র পর্বতের পাদদেশে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াও শশাঙ্ক মস্তক অবনত করেন নাই। অনুমান হয় তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার উচ্চশির উচ্চই ছিল। চীন পরিব্রাজক কর্তৃক লিপিবদ্ধ হর্ষ কর্তৃক পঞ্চভারত-বিজয়-কাহিনীও কাল্পনিক। দক্ষিণাপথ বিজিগীষু স্থান্বীশ্বররাজকে যে নতি স্বীকার করিয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী ও তদ্বংশীয়গণ নানাস্থানে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐহোলের খোদিত লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চালুক্যরাজ উত্তরাপথের সম্রাটের দাক্ষিণাত্য-বিজিগীষা দূর করিয়াছিলেন। হয়ত শশাঙ্কের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দুর্দশায় করুণা-প্রণোদিত হইয়া চালুক্যরাজ অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্যসেন হর্ষবর্ধনের দেহান্ত হইলে সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপসড়গ্রামে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে মাধবগুপ্ত হর্ষবর্ধনের সংসর্গ কামনা করিয়াছিলেন—

আজৌ ময়া বিজিহতা বলিনো দ্বিশন্তঃ
কৃত্যং ন মেন্ত্যপরমিত্যবধার্য্য বীরঃ।
শ্রীহর্ষদেব নিজ সঙ্গম বাঞ্ছয়া৽চ

এই কুলাঙ্গার মাধবগুপ্ত হয়ত শশাঙ্কের দুর্দশার কারণ, মগধ রাজবংশের অধঃপতনের কারণ, গৌড়রাজ্যের স্বাধীনতা লোপের কারণ। ইহা ঐতিহাসিকের

স্বপ্ন মাত্র, স্বপ্ন কোনো কালে সত্য হইবে কি না তাহা বলা সুকঠিন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর গৌড়ে ও মগধে আদিত্যসেন পুনরায় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। আদিত্যসেনের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ অপসড় শিলালিপি সূক্ষ্মশিব নামক গৌড়বাসী কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। অনুমান হয় গৌড়দেশেও আদিত্যসেনের রাজ্যভুক্ত ছিল।

'প্রবাসী'। কার্তিক ১৩১৯

হাজার-ভুজা বাঙালী

বিনয়কুমার সরকার

১৮৮৭ - ১৯৪৯

আমার নিকট গণসাহিত্য একমাত্র লোকসাহিত্য নয়, আবার একমাত্র নৃতত্ত্বের অন্তর্গত জাত-পাঁচ বিষয়ক বা লোকাচার বিষয়ক সাহিত্যও নয়। গণসাহিত্য জিনিসটাকে আরও বেশী ব্যাপক ভাবে সমঝিতে আমি অভ্যস্ত। সাহিত্যের আসল কথা হইল জীবন। জীবনের সকল প্রকার স্পন্দনই সাহিত্যের নবরস বা নব্বুই রস বা নয় লাখ রসের কোনো না কোনোটা জোগাইয়া থাকে। যেখানে-সেখানে জীবনের খেলা দেখিতেছি, সেইখানেই কিছু-না-কিছু রস চুঁয়াইয়া পড়িতেছে অর্থাৎ সেইখানেই কিছু-না-কিছু সাহিত্যের রসদ আছে।

জীবনের পরিচয় পাই কর্মে। কর্মযোগ ছাড়া জীবন থাকিতেই পারে না। চিন্তাও এক প্রকার কর্মই বটে। যেখানে-সেখানে কিছু-না-কিছু কাজ চলিতেছে সেইখানেই দেখিতে পাই জীবনের সাড়া। মানুষকে স্রষ্টারূপে যত ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, তত ক্ষেত্রেই জীবনের স্পন্দন অনুভব করিতে পারি। আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু-না-কিছু রসও চাখিতে পারি। অর্থাৎ সৃষ্টিকার্যের সঙ্গে জীবন আর জীবনের সঙ্গে সাহিত্য চোপর দিনরাত জটলা করিয়া রহিয়াছে। এই সৃষ্টি-জীবন-রসের চাকায় হাত পড়িবা মাত্রই সাহিত্যের ফোয়ারাও দখল করা হইল।

গণসাহিত্যের বেপারীকে তাই কেবল সৃষ্টিশক্তি আর সৃষ্টিকার্যের খতিয়ান করিতে হইবে। কিন্তু গণটা কি ? কেহ বলে গরীব লোক, কেহ বলে নির্যাতিত নরনারী, কেহ বলে অস্পৃশ্য জাতি। গণ বলিলে আমি বুঝি সব লোক, গোটা দেশ, সমগ্র বাঙালী জাতি। পণ্ডিতকে পণ্ডিত, মুখ্‌খুকে মুখ্‌খু, বড়লোককে বড়লোক, ছোটলোককে ছোটলোক,—কেহই গণ-চৌহদ্দির বহির্ভূত নয়। দেশের সব লোক যাহা কিছু সৃষ্টি করিতেছে তাহার সবকিছুই গণসাহিত্যের রস জোগাইতেছে। এই সৃষ্টিকাণ্ডে আমি দেখিতেছি বাঙালী জাতির বিশ্বরূপ। হাজার-ভুজা বাঙালী জাতির ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সব-কিছুই বঙ্গীয় গণসাহিত্যের বাস্তব ভিত্তি। কাজেই মামুলি লোকসাহিত্য আর নৃতত্ত্বের রাজনীতি-সাহিত্যেও এই বিপুল সৃষ্টিকাণ্ড বিশ্ব কোষের ভিতর আসিয়া পড়িতে বাধ্য।

লোকেরা সৃষ্টিকার্য ঢুঁড়ে নামজাদা লোকের দাড়ি বা টিকির ভিতর। আমি সৃষ্টিকার্য ঢুঁড়ি মিস্ত্রীর রঁ্যাদার আগায় আর কুমোরের চাকার কাদায়। ঢেঁকিতে

ধান কুটিতে কুটিতে পল্লীনারী সৃষ্টির আনন্দ চাখিতেছে, আবার একালের কুটির-শিল্পী হাতের জোরে ছোট্ট যন্ত্রের ডাঁটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ধান-ভাঙার সৃষ্টিসুখ উপভোগ করিতেছে। নৌকার মাঝি লোকে লোকে যোগাযোগ সৃষ্টি করিতেছে, আবার পাটের চাষীও পল্লীশ্রী গড়িয়া তুলিতেছে। রেলের মজুর, খাদের কুলি, বহির্বাণিজ্যের কেরানী, বীমা-ব্যবসার দালাল—সকলের কাজেই সৃষ্টিশক্তি মূর্তি পাইতেছে।

কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টি বুঝিয়া রাখা ভাল। বিজ্ঞান-সেবকের ল্যাবরেটরী তুচ্ছ করিবার দরকার নাই। আকাশচারীর যন্ত্রপ্রয়োগও উপেক্ষা করিবার কথা বলিতেছি না। দার্শনিকের তত্ত্ব-বিশ্লেষণও সৃষ্টিকার্য সন্দেহ নাই। আর কবি, চিত্রকর ও সঙ্গীতের ওস্তাদ ইত্যাদিও সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়। কিন্তু সৃষ্টিকার্যের পরিধি আরো বিস্তৃত। কোনো প্রতিষ্ঠানে, গবেষণালয়ে, মিউজিয়ামে, লাইব্রেরীতে, টোলে বা শাস্ত্রপীঠে সৃষ্টিকার্য আসিয়া পথ ভুলিয়া নাই। সৃষ্টি-কার্যের স্রোত বহিতেছে দেশ জুড়িয়া অনন্ত পথে। পল্লী-কুটিরের মায় হেঁশেল-ঘরেও সৃষ্টিকার্য দেখিতেছি, আর যন্ত্র-মেরামতের কারখানাও সৃষ্টিকার্য দেখিতেছি। গম্ভীরার বোলবাহী গানেও সৃষ্টিকার্য মালুম হয়। আবার রায়বেঁশে নাচেও সৃষ্টিকার্য পরিস্ফুট।

জগতের শক্তিধর পুরুষ-নারী মাত্রেই গণসাহিত্যসেবীর "পূজাস্থান"। বাঙালী জাতির যাহারা গাহিতে পারে, নাচিতে পারে, গাহাইতে পারে, নাচাইতে পারে, তাহারা সকলেই গণসাহিত্যের "সেন্সাসে" ঠাঁই পাইবার যোগ্য। বাঙলার যে সকল নরনারী হাসিতেছে ও হাসাইতেছে, স্বপ্ন দেখিতেছে ও দেখাইতেছে, —গণশক্তির উদ্বোধক হিসাবে তাহারা প্রত্যেকেই বঙ্গবীর। যে সকল বাঙালী মাথার জোরে "হাঁ"কে "না"য়ে পরিণত করিতেছে, অথবা "না"কে "হাঁ"য়ে ঠেলিয়া তুলিতেছে, যে সকল বাঙালী হাতের জোরে পুকুরের "লেঁদ" উঠাইতেছে, নর্দমা সাফ করিতেছে, বনজঙ্গল লোপাট করিয়া পল্লী কায়েম করিতেছে, চরের খোলা মাঠে চাষ বসাইতেছে; যে সকল বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যের জোরে পল্লীকে শহরে পরিণত করিতেছে; শহরের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ কায়েম করিতেছে; যে সকল বাঙালী কর্মকৌশলের জোরে অজ্ঞাত-কুলশীল নরনারীকে নামজাদা নরনারীর আসনে বসাইতেছে; যে সকল বাঙালী আত্মত্যাগের জোরে, স্বদেশসেবার জোরে, গলাবাজীর জোরে, লেখালেখির জোরে অথবা সাহিত্য-গবেষণার জোরে যুবক বাঙলাকে বড় বড় আন্তর্জাতিক ইজ্জত

পাইবার যোগ্য করিয়া তুলিতেছে, তাহারা সকলেই বাঙালী জাতির মহাপুরুষ হিসাবে গণসাহিত্যের নায়ক-নায়িকা। গণসেবকের চোখে একমাত্র দ্রষ্টব্য ব্যক্তি হইল স্রষ্টা, স্থষ্টিকর্তা, গঠনক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিযোগী চিন্তাবীর ও কর্মবীর। গণসেবকের চোখে একমাত্র দ্রষ্টব্য বস্তু হইল স্থষ্টিশক্তি; প্রকৃতিকে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া, দুনিয়াকে ভাঙিয়া-চুরিয়া, ভূতলকে টানিয়া-ছিঁড়িয়া নতুন করিয়া রূপ দিবার ক্ষমতা।

এই ধরনের শক্তিধর ও স্রষ্টা নরনারী অন্যান্য দেশের মত বাঙলা দেশেও বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। চোখের ঠুলি খুলিয়া বাঙলার জেলায়-জেলায়, পল্লীতে-পল্লীতে, নৌকার ঘাটে, জঙ্গল-মাঠে, পাহাড়ে-উপত্যকায় ঘুরা আবশ্যক। দেখিতে পাইব যে, অনেক লোক অসংখ্য দুঃখ কষ্ট সহিয়া দিনের পর দিন আবাদ করিতেছে, মাছ ধরিতেছে, সংসার চালাইতেছে। কে তাহাদিগকে সাহায্য করিল, কে তাহাদিগকে বাধা দিল, সে সব দিকে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। সাহায্য পাইলে তাহারা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পশ্চাৎপদ নয়। বাধা পাইলেও তাহারা বিচলিত হয় না। ধাক্কা খাইয়া, মার খাইয়া, ফেল মারিয়াও তাহারা হাল ছাড়িতেছে না। পল্লী-মোড়লদের কোঁদল, পাড়াপড়শীদের হিংসা-গঞ্জনা তাহাদের নিত্যসহচর। তাহারা দুবেলা আঁচাইলে তাহাদের বন্ধুবান্ধবদের চোখ টাটাইতে থাকে। তাহা সত্ত্বেও তাহারা সটান বুকে ঘাড় খাড়া রাখিয়া নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিয়া চলিতেছে। রোদকে রোদ, বৃষ্টিকে বৃষ্টি, রসকে রস, কষকে কষ, বিজয়কে বিজয়, পরাজয়কে পরাজয় তাহারা সবই সমানভাবে বরদাস্ত করিতে অভ্যস্ত। তাহারা পাঁচ ঘা খাইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ ঘা না হউক, তিন ঘা লাগাইতে তাহারা সুপটু।

এই ধরনের ডানপিটে লোক বাঙালী জাতির এখানে-ওখানে-সেখানে ছোট-বড় মাঝারি সকল প্রকার কর্মক্ষেত্রেই নজরে পড়ে। ডানপিটেগুলা না থাকিলে দুনিয়া পচিয়া যাইত। বঙ্গীয় স্বদেশী আন্দোলনের আসল বনিয়াদ হইল ডানপিটের কর্মকাণ্ড। ডানপিটেদের স্থষ্টিশক্তি জগতের সর্বত্র মানবজাতির জীবনলীলা বাড়াইয়া দিয়াছে। বাঙালী জাতির ডানপিটেগুলাকে ঢুঁড়িয়া বাহির করা, ডানপিটেদের বীরত্ব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকা, ডানপিটেদের কৃতিত্ব সমূহের যথোচিত সম্বর্ধনা করা, গণপূজার প্রধান সরঞ্জাম।

জগৎ-স্থষ্টি আর জগদ্বৃদ্ধির কাজে আর এক প্রকার নরনারী ডানপিটেদের মতনই পূজাযোগ্য। তাহারা চব্বিশ ঘণ্টা টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, কোথাও আটক থাকে না। তাহারা পল্লীতে ঢুঁড়িতেছে তরিতরকারির ক্ষেত,

শহরে ঢুঁড়িতেছে দুধ বেচিবার সুযোগ। তাহারা গাঁ ছাড়িয়া বসিতেছে চরে, আবার চর ভাঙিতে না ভাঙিতেই কুঁড়ের চালা মাথায় করিয়া ফের গিয়া বসিতেছে গাঁয়ে। তাহারা শহরে থাকিলে কখনো ঢুকিতেছে রেল-কর্মচারীদের অফিসে, কখনো ঢুকিতেছে শেয়ার বাজারের দালাল-পাড়ায়, আবার কখনো ঢুকিতেছে চায়ের ক্যাবিনে। মারিতেছে তাহারা আড্ডা, ঢুঁড়িতেছে তাহারা ফিকির। লোকে বলে তাদেরকে 'ভ্যাগাবণ্ড', আমি বলি 'ভবঘুরে'। 'ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে'।

ধনসম্পদ বাড়াইতে চাও, অথচ শুইয়া থাকিবে সর্বদা নিজ কোটরে, তাহা সম্ভব নয়। তোমার দুয়ারে আসিয়া দেশের লোক, দুনিয়ার লোক তোমাকে রাজা করিয়া দিয়া যাইবে, তাহা কস্মিন্‌কালে ঘটিতে পারে না। বিদ্যা বাড়াইতে চাও, 'যাও সিন্ধুনীরে ভূধরশিখরে'। মত প্রচার করিতে চাও, 'যাও সিন্ধুনীরে ভূধরশিখরে'। দেশের ইজ্জৎ বাড়াইতে চাও, "যাও সিন্ধুনীরে ভূধরশিখরে"। চাই পর্যটন, চাই মোলাকাত, চাই তর্কপ্রশ্ন, চাই বাদানুবাদ, চাই হাতাহাতি, চাই পাঞ্জা-কষাকষি, বঙ্গপল্লীতে, ভারতে, এশিয়ায়, ইয়োরো-মেরিকায়, আফ্রিকায়, ওশিয়ানিয়ায়। কতকগুলা "বাপ্‌কা বেটা" বাঙালী ভবঘুরের নদী-সাঁতরানো, সাগর-ডিঙানো, দুনিয়া-পরিক্রমার দৌলতে বাঙালী জাতির বিদ্যা বাড়িয়াছে, অর্থ বাড়িয়াছে, আত্মা বাড়িয়াছে, রাষ্ট্রিক শক্তি বাড়িয়াছে; চাই আরো ভবঘুরে এবং ভবঘুরের দিগ্‌বিজয়, চাই ভবঘুরেদেরকে ঢুঁড়িয়া বাহির করিবার ব্যবস্থা, চাই ভবঘুরেদেরকে ইজ্জত দিবার প্রবৃত্তি। গণসাহিত্যের আসরে আসল অনুষ্ঠান ভবঘুরে-পূজা।

আর-এক প্রকার শক্তিধর নরনারী জগতের চৌহদ্দি বাড়াইয়া দিতেছে। তাহারা মামুলি মতে সায় দেয় না। লোকজনের পছন্দ-সই কথা বলিয়া বাহবা পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের নাই। সার্বজনিক লোকপ্রিয় মতগুলিকে তাহারা অতি-চোঁথা মত বিবেচনা করিতেই অভ্যস্ত। দশ, বিশ, পঁচিশ বৎসর ধরিয়া কোনো একটা কথা অনবরত প্রচারিত হইতে থাকিলে, তাহা কালে রামা-শ্যামা-ইসমাইল-আবদুলের বোধগম্য হয়। অর্থাৎ মালটা পুরানো, অতিবাসি, একঘেয়ে আর তেতো না হইয়া গেলে বারইয়ারিতলার আসরে তাহা বরদাস্ত হয় না। কিন্তু, এই সব পচা ও বাসি মতামতের প্রচারক যাহারা হয়, তাহারা দুনিয়ায় নতুন দাগ রাখিতে অসমর্থ। বারইয়ারিতলার সর্বজনপ্রিয় দর্শন বা বিজ্ঞানগুলা জগতকে বাড়াইয়া তুলিতে পারে না।

যে সকল শক্তির দৌলতে বাঙালী জাতি গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার ভিতর 'আদিম' নরনারীর শক্তি অন্যতম। হাজার-ভুজা বাঙালী জাতির ইহারা একটা বড় ভুজ। ডানপিটে ভবঘুরে-ত্যাঁদড় হিসাবে ইহারা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মুণ্ডা, ওঁরাও আর সাঁওতাল এই তিন জাতকে পশ্চিমবঙ্গের নয়া "ত্রিবীর" বিবেচনা করা আমার দস্তুর। ইহারা গুণতিতে প্রায় সাড়ে এগার লাখ। বছর চল্লিশেক আগেও এই ত্রিবীরেরা প্রায় নগণ্য ছিল। তখনকার দিনে নাক গুণিলে এই তিন জাত দাঁড়াইত মাত্র সাড়ে তিন লাখের কোঠায়। আজ উত্তর বঙ্গের জলপাইগুড়ি হইতে শুরু করিলে দিনাজপুর, মালদহ, বীরভূম, বর্ধমান ও বাঁকুড়ার পথে মেদিনীপুর পর্যন্ত সোজা দক্ষিণে হাঁটিয়া আসিলে দেখিতে পাই সর্বত্রই মুণ্ডা ওঁরাও সাঁওতাল, অথবা সাঁওতাল, ওরাঁও মুণ্ডার ক্ষেত-খামার, আর ইহাদের সঙ্গে তথাকথিত বাঙালীদের হাটে-বাজারে লেন-দেন। মুণ্ডা, ওরাঁও সাঁওতাল মেয়েরা বাঙালীর ঘরের চাকরানী হয়, আর ঘটনাচক্রে গণ্ডা-গণ্ডা বাঙালীর ছেলে প্রসবও করে। স্থানে স্থানে সাঁওতাল-শিশু বাঙালী শিশু, আর সাঁওতাল-বাঙালীর দো-আঁশলা শিশু বাঙালীদের পাঠশালায় একত্রে পড়িতেও যায়।

আদিমগুলাকে বাঙালী বলিতে আজও আমরা অভ্যস্ত নই। ইহা আমাদের একটা অন্ধতা ছাড়া আর কিছু নয়। চোখ খুলিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি যে, বর্ধমান বিভাগে শতকরা সাতজনই আদিম, আর রাজশাহী বিভাগে ছয়জন। কোনো কোনো জেলায় অবশ্য অনুপাতটা আরো উঁচু। জলপাইগুড়ি জেলার শতকরা পনের জনেরও বেশী এইরূপ। বাঁকুড়া জেলার অবস্থাও তথৈবচ। ইহারা বাঙলা ভাষায় কথা কহিতেছে। অপর দিকে ইহাদের জোরাল সরস শব্দে বাঙলা ভাষাও খানিকটা বাড়িয়া যাইতেছে। বাঙালী কায়দায় কাপড় পরাও ইহাদের দস্তুর। বাজার-হাটে লেন-দেন, ঘাটে-মাঠে লেন-দেন, ঘরকন্নায় লেন-দেন, আর ধর্মে কর্মে লেন-দেন—এই সকল লেন-দেন যাহাদের সঙ্গে আমাদের অহরহ চলিতেছে, তাহাদিগকে অ-বাঙালী সমঝিয়া রাখা অতিমাত্রায় অবিবেচনা বা দুর্বিবেচনার কাজ। অধিকন্তু রক্ত-সংমিশ্রণ ত আছেই।

বাঙালী জাতিকে যে সকল নরনারী গড়িয়া তুলিতেছে, তাহাদের ভিতর 'পতিত্' জাতিগুলা অন্যতম; পতিত্রা দলে খুব পুরু। গুণ্তিতে ইহারা চুরাশী লাখ, অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান সমন্বিত গোটা বাঙালী জাতির ছয় ভাগের এক ভাগ। আর যদি একমাত্র হিন্দু-বাঙালীর নাক গুণিতে শুরু করি, তাহা হইলে শতকরা প্রায় আটত্রিশ জনই পতিত্ শ্রেণীর লোক।

এই পতিত্‌গুলার সৃষ্টিশক্তি জবর। ইহারের ভিতরকার ডানপিটে-ভবঘুরে-ত্যাঁদড়েরা বেশ করিৎকর্মা। আদিমকে বয়কট করিলে বাঙালীর যেমন চলে না, পতিত্‌দের সঙ্গে অসহযোগ কায়েম হইলেও সেইরূপ বাঙালীর চলিতে পারে না। পতিত্‌রা ফেলিবার লোক নয়। নাম করিলেই যে-কোনো মাতব্বর স্থানীয় লোক বুঝিবেন যে, পতিত্‌ বাদ দিলে বাঙালীর একটা বড় গোড়াই কাটা হইয়া যায়। জেলে-কৈবর্ত, কলু, তেলি, ঝালো-মালো ইত্যাদি শ্রেণীর লোক প্রায় বার লাখ। বাঙলার সম্পদ গড়িয়া তুলিবার কাজে এই সকল পতিতের কৃতিত্ব সুবিদিত। সাড়ে এগার লাখ আদিমের ভিতর দশ লাখ হইতেছে হিন্দু। ইহারা সকলেই পতিত্‌। আগেই বুঝিয়াছি যে, আদিমগুলা বাঙালী জাতির আত্মাশক্তি বিশেষ। এদিকে নমঃশূদ্রের কর্মক্ষমতা ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ বাঙালী পূর্ববঙ্গে অন্তত একজনও আছে কিনা সন্দেহ। নমঃশূদ্রেরা গুণতিতে বিশ লাখের বেশী। এই জাতি 'অস্পৃশ্য'। এইরূপই অস্পৃশ্য বাগ্‌দী, পোদ, মুচি, বাউরী, ধোবি ইত্যাদি। অস্পৃশ্যতার আকার-প্রকার রকমারি বলা বাহুল্য। কিন্তু নমঃশূদ্র সমেত ইহারা প্রায় সাতান্ন লাখ নরনারী। বাঙালী জাতির চাষ-আবাদ, বাঙালী জাতির বাহুবল, বাঙালী জাতির ঘর দুয়ার, বাঙালী জাতির জল-বাণিজ্য সবই অনেকাংশে এই সাতান্ন লাখের হাত-পা'র জোরে আর মাথার জোরে গড়া। অপর দিকে ডোম, হাঁড়ী, মেথর, ধাঙ্গড়, ঝাড়ুদার ইত্যাদি শ্রেণীর লাখ পাঁচেক নরনারীকে হাজার-ভুজা বাঙালী জাতির অন্যতম বিপুল ভুজরূপে সম্বর্ধনা না করিলে গোঁয়াতুর্মি আর মগজহীনতার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র।

আসল কথা, পুরা অস্পৃশ্য, আধা-অস্পৃশ্য, সিকি-অস্পৃশ্য, নিম্‌-অস্পৃশ্য, মন্দিরে-প্রবেশ অনধিকারী, জল-চলের বহির্ভূত ইত্যাদি পতিত্‌ শ্রেণীর সকল হিন্দুই আর্থিক বাঙলার নিরেট বনিয়াদ। বাঙালীর জীবন-বত্তা, বাঙলার কৃষ্টি, বাঙলার নরনারীর আত্মিক বিকাশ, বাঙলার সভ্যতা-ভব্যতা সবকিছুর সঙ্গেই এই পতিত্‌ জাতির হাত, পা, মাথা আর হৃদয় সুজড়িত। অস্পৃশ্যগুলার স্পর্শহীন হইবামাত্র বাঙালী জাতি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে বাধ্য। গণসাহিত্যের গবেষক হিসাবে যাঁহারা বাঙালী জীবনের সম্পদ ঢুঁড়িতেছেন; তাঁহাদিগকে এই সকল পতিত্‌ জাতির কৃতিত্ব ও সৃষ্টি শক্তির ইজ্জত সম্বন্ধে সজাগ হইতে হইবে। বাঙালী-সভ্যতায় পতিত্‌ জাতিগুলার দান অসীম।

'বাড়তির পথে বাঙালী'। ১৯৩৩

লেখক-পরিচয়

রামমোহন রায় ॥ ১৭৭৪-১৮৩৩

পাশ্চাত্য জ্ঞান, রাজনীতি ও চিন্তাধারার সমন্বয়-সাধনের পথনির্দেশ রামমোহনের প্রধান কীর্তি। তিনি শিক্ষা-সংস্কারক ও সমাজ-সংস্কারক রূপেও কীর্তিমান, সহমরণ-প্রথার উচ্ছেদ তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টাতেই সম্ভব হয়। বাংলা-গদ্যে গুরুগম্ভীর বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধরচনার তিনি অন্যতম প্রবর্তক।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ আর্বী-ফার্সী— তুহ্ফাৎ-উল-মুয়াহ্হিদীন (১৮০৩-০৪)। বাংলা ও সংস্কৃত— বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্তসার (১৮১৫), তলবকার উপনিষৎ (১৮১৬), ঈশোপনিষৎ (১৮১৬), উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (১৮১৬-১৭), ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার (১৮১৭), কঠোপনিষৎ (১৮১৭), মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (১৮১৭), গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮), সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (১৮১৮), গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮), মুণ্ডকোপনিষৎ (১৮১৯), সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯), কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০), সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০), ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ (১৮২১), চারি প্রশ্নের উত্তর (১৮২২), প্রার্থনাপত্র (১৮২৩), পাদরি ও শিষ্য সংবাদ (১৮২৩), গুরুপাদুকা (১৮২৩), পথ্যপ্রদান (১৮২৩), ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ (১৮২৬), কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার (১৮২৬), বজ্রসূচী (১৮২৭), গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং (১৮২৭), ব্রহ্মোপাসনা (১৮২৮), ব্রহ্মসঙ্গীত (১৮২৮), অনুষ্ঠান (১৮২৯), সহমরণ বিষয় (১৮২৯), গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)।

রাসসুন্দরী দেবী ॥ ১৮১০-১৮৯৭

ইনি কিশোরীলাল সরকারের মাতা। সেকালের গৃহবধূ। 'আমার জীবন' গ্রন্থটি ইহার একমাত্র গ্রন্থ, গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে।

গ্রন্থটির ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "লেখাপড়া শিখিবার তাঁহার কোনো সুবিধা ঘটে নাই। তখনকার কালে স্ত্রীলোকের

লেখাপড়া শেখা দোষের মধ্যে গণ্য হইত। তিনি অপার যত্নে, বহু কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।"

দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, "পুস্তকখানিতে প্রাচীন পুরনারীগণের যে চিত্রটি আছে, তাহা আমাদের বর্তমান সময়ের মহিলাগণ একবার যত্নের সহিত দেখিবেন, এই অনুরোধ।"

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ১৮১৭-১৯০৫

পিতা দ্বারকানাথ তাঁকে রামমোহন রায়ের স্কুলে ভর্তি করে দেন। তার পরে তিনি অধ্যয়ন করেন হিন্দু কলেজে। বিষয়কর্মে ইনি যেমন পারদর্শী ছিলেন তেমনি ধর্মপ্রবর্তনায় তাঁর নিষ্ঠা ছিল। মহর্ষি নামেই তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর জীবন কর্মময়। পুত্র রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাঁর পিতার অনেক গুণ লক্ষিত হয়।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ (১৮৫০), আত্মতত্ত্ববিদ্যা (১৮৫২), ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস (১৮৬০), পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্য সংগ্রহার্থে ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা (১৮৬১), কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা (১৮৬২), মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ, ব্রাহ্মধমের ব্যাখ্যান (প্রথম প্রকরণ : ১৮৬১, দ্বিতীয় প্রকরণ : ১৮৬৬), ব্যাখ্যানের পরিশিষ্ট (১৮৮৫), আত্মজীবনী (১৮৯৮) প্রভৃতি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮২০-১৮৯১

ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ। শাস্ত্রবিদ। সমাজসংস্কারক। শিক্ষকতা এবং শিক্ষাবিষয়ক কার্যাদিতে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন। বহু গ্রন্থের প্রণেতা। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বিধবাবিবাহের প্রবর্তনা। তাঁর বন্ধুবাৎসল্য এবং দানশীলতা রূপকথার মতো খ্যাতিলাভ করেছে। তৎকালীন সমাজজীবনের নানাবিধ কলুষতার বিরুদ্ধে তিনি নির্ভীক যোদ্ধারূপে অবতীর্ণ হন। তার অখণ্ড পাণ্ডিত্যের জ্যোতি আজও বাঙালীজীবনে প্রতিভাত। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারতার অন্যতম সহায়ক।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় ভাগ : ১৮৪৮), জীবনচরিত (১৮৪৯), বোধোদয় (১৮৫১), সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৫১), ঋজুপাঠ (১ম ভাগ : ১৮৫১), সংস্কৃত ভাষা

ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩), ব্যাকরণ কৌমুদী (১ম ভাগ : ১৮৫৩), শকুন্তলা (১৮৫৪), বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫), বর্ণপরিচয় (১ম ভাগ : ১৮৫৫), বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (দ্বিতীয় পুস্তক : ১৮৫৫), কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলী (১৮৫৬), মহাভারত (উপক্রমণিকা ভাগ : ১৮৬০), সীতার বনবাস (১৮৬০), আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৩), শব্দমঞ্জরী [বাংলা অভিধান] (১৮৬৪), ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯), বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার (১৮৭১), বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিয়ক বিচার (দ্বিতীয় পুস্তক : ১৮৭৩), নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস (১৮৮৮), পদ্যসংগ্রহ (১৮৮৮), পদ্যসংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড : ১৮৯০), সংস্কৃত রচনা (১৮৮৯), শ্লোকমঞ্জরী (১৮৯০), বিদ্যাসাগরচরিত (১৮৯১), ভূগোলখগোলবর্ণনম্ (১৮৯২)। বেনামী রচনা ॥ অতি অল্প হইল (১৮৭৩), আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩), ব্রজবিলাস (১৮৮৪), বিধবাবিবাহ ও যশোহর-হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা (১৮৮৪), রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬)।

অক্ষয়কুমার দত্ত ॥ ১৮২০-১৮৮৬

প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা এবং পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যে নর্মাল স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা করেন। তিনি উদারনীতিক এবং সংস্কারমুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। জ্ঞানগর্ভ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ অনঙ্গমোহন (১৮৩৪ ?), ভূগোল (১৮৪১), শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা (১৮৪৫), বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (১ম ভাগ : ১৮৫১, ২য় ভাগ : ১৮৫৩), চারুপাঠ (১ম ভাগ : ১৮৫৩, ২য় ভাগ : ১৮৫৪, ৩য় ভাগ : ১৮৫৯), বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ (১৮৫৫), ধর্ম্মোন্নতি সংশোধনবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫), ধর্ম্মনীতি (১৮৫৬), পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬), ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় (১ম ভাগ : ১৮৭০, ২য় ভাগ : ১৮৮৩), প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার (১৯০১)।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ॥ ১৮২২-১৮৯১

ইনি মেডিকাল কলেজের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। মেডিকাল কলেজের পাঠ শেষ করে তিনি কিছুকাল আইন পড়েছিলেন। তিনি ফার্সী

ভালো জানতেন, ক্রমে সংস্কৃত হিন্দী ও উর্দুতেও পারদর্শী হন। তাঁর সম্পাদনায় ১৮৫১ সালে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইংরাজিতেই তিনি বেশি রচনা করেছেন, সংস্কৃত ভাষাতেও কয়েকটি বই আছে। তাঁর বাংলাগ্রন্থের মধ্যে আছে প্রাকৃত ভূগোল (১৮৫৪), শিল্পিক দর্শন (১৮৬০), শিবাজীর চরিত্র (১৮৬০), মেবারের রাজেতিবৃত্ত (১৮৬১), ব্যাকরণ-প্রবেশ (১৮৬২), পত্রকৌমুদী (১৮৬৩), অশৌচ ব্যবস্থা (১৮৭৩), মানচিত্র (১৮৫০-৮)।

রাজনারায়ণ বসু ॥ ১৮২৬-১৮৯৯

উনিশ শতকের একজন বিশিষ্ট ও সাহিত্যপ্রাণ পুরুষ। সমাজসংস্কারক রূপেও তাঁর দান অসামান্য।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (প্রথম ভাগ ১৮৫৫), (দ্বিতীয় ভাগ ১৮৭০), ব্রহ্মসাধন (১৮৬৫), ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা (প্রথম ভাগ : ১৮৬৬, দ্বিতীয় ভাগ : ১৮৬৭), আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত (১৮৬৭), প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে ? (১৮৭৩), হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা (১৮৭৩), সেকাল আর একাল (১৮৭৪), ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব (১৮৭৫), হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত (১৮৭৬), বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা (১৮৭৮), বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম খণ্ড : ১৮৮২), সারধর্ম্ম (১৮৮৬), তাম্বুলোপহার (১৮৮৬), বৃদ্ধ হিন্দুর আশা (১৮৮৭), রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯০৯), A defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj being a lecture delivered at the Midnapore Samaj Hall on the 21st June 1863 (1863), Brahmic Questions of the Day Answered (1869), Brahmic Advice, Caution and Help (1869), The Adi Brahmo Somaj, its view and principles. (1870), A Lecture in Reply to the Query : What is Brahmoism ? (1871), Theistic Toleration and Diffusion of Theism (1872), The Adi Brahmo Somaj as a Church (1873), Hints showing the Feasibility of constructing a Science of Religion (1878), Hindu Theist's Brotherly Gift to English Theists. (1881), Bramho catechism (1882), Oldman's Hope (1889)।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ॥ ১৮২৭-১৮৯৪

ইনি প্রথমে সংস্কৃত কলেজে, তারপর ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমিতে ও অতঃপর হিন্দু কলেজে তিনি অধ্যয়ন করেন। এখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন মাইকেল মধুসূদন। যোগ্যতার সঙ্গে এখানকার পাঠ সমাপ্ত ক'রে তিনি সরকারী শিক্ষাবিভাগে যোগ দেন। শিক্ষা-বিষয়ক এই দুইটি বাংলা সাময়িক পত্র তিনি পরিচালনা করেন—'শিক্ষাদর্পন ও সংবাদসার' এবং 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ'।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৬), ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৬), প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (দুই খণ্ড : ১৮৫৮ ও ১৮৫৯), পুরাবৃত্তসার (১৮৫৮), ইংলণ্ডের ইতিহাস (১৮৬২), ক্ষেত্রতত্ত্ব (১৮৬২), রোমের ইতিহাস (১৮৬৩), পুষ্পাঞ্জলি (১৮৭৬), পারিবারিক প্রবন্ধ (১৮৮২), সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২), আচার প্রবন্ধ (১৮৯৪), বিবিধ প্রবন্ধ (১৮৯৫), স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৯৫), বাঙ্গালার ইতিহাস (১৯০৩), বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় ভাগ : ১৯০৪)।

রামগতি ন্যায়রত্ন ॥ ১৮৩১-১৮৯৪

ইনি যেমন শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন তেমনি নাটক ও উপাখ্যানও লিখেছিলেন। বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্য নিয়ে তাঁর গবেষণা সর্বজনস্বীকৃত।

রচিত গ্রন্থাবলী। কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ এবং অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস (১৮৫৮), বস্তুবিচার (১৮৫৯), বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম ভাগ : ১৮৫৯), রোমাবতী (১৮৬২), বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৮৬৪), ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস (১৮৬৫), ঋজুব্যাখ্যা (১৮৬৮ ?), শিশুপাঠ (১৮৬৮), দময়ন্তী (১৮৬৯), চণ্ডী (১৮৭২), বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১ম ভাগ : ১৮৭২), ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৮৭৫), গোষ্ঠীকথা (১৮৭৭), কুপিতকৌশিক নাটক (১৮৭৮), নীতিপথ (১৮৮১), রামচরিত (১৮৮৩), ইলছোবা (১৮৮৮)।

কেশবচন্দ্র সেন ॥ ১৮৩৮-১৮৮৪

প্রখ্যাত সমাজ-সংস্কারক। ইনি ব্রাহ্মসমাজে নববিধানের প্রবর্তক।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ দুইটি প্রার্থনা (১৮৬১ ?), বিশ্বাস প্রকৃত

উদ্দেশ্য (১৮৬৫), ভক্তি (১৮৬৮), ধর্ম্মসাধন (১৮৭২), জীবনবেদ (১৮৮৩) প্রভৃতি বাংলা ও ইংরাজিতে শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ ১৮৩৮–১৮৯৪

প্রকৃতপ্রস্তাবে বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই প্রথম বাঙালী ঔপন্যাসিক। উপন্যাসে মানসিকতার প্রবর্তন তাঁর প্রধান শিল্পকীর্তি। বাংলাসাহিত্যে সাম্যবাদের প্রবর্তনাও তাঁর অন্যতম কীর্তি। বাংলাগদ্যকে গতিশীল করার মূলে বঙ্কিমের দান অপরিসীম। চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিসাবেও বঙ্কিম প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে নূতন আলোক আনয়ন করেন। কবিতা লিখে সাহিত্য জীবনের শুরু।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ ললিতা: পুরাকালিক গল্প: তথা মানস (১৮৫৬), দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), ইন্দিরা (১৮৭৩), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), লোকরহস্য (১৮৭৪), বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রাধারাণী (১৮৭৫), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫), বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬), রজনী (১৮৭৭), উপকথা (১৮৭৭), রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী (১৮৭৭), কবিতা-পুস্তক (১৮৭৮), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), প্রবন্ধ-পুস্তক (১৮৭৯), সাম্য (১৮৭৯), রাজসিংহ (১৮৮২), আনন্দমঠ (১৮৮২), মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত (১৮৮৪), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস (১৮৮৬), কৃষ্ণচরিত্র (প্রথম ভাগ: ১৮৮৬), সীতারাম (১৮৮৭), বিবিধপ্রবন্ধ (প্রথম ভাগ: ১৮৮৭), ধর্ম্মতত্ত্ব (১৮৮৮), বিবিধপ্রবন্ধ (দ্বিতীয় ভাগ: ১৮৯২), সহজ রচনা-শিক্ষা (১৮৯৪, দ্বিতীয় সংস্করণের সন), সহজ ইংরেজী শিক্ষা (১৮৯৪, তৃতীয় সংস্করণের সন), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৯০২), Rajmohan's Wife (১৯৩৫)।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ১৮৪০–১৯২৬

কবি ও দার্শনিক রূপে খ্যাত। তিনি খাঁটি স্বদেশী ছিলেন। তিনিই প্রথম আকারমাত্রিক স্বরলিপির প্রচলন করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথই বিখ্যাত ভারতী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ মেঘদূত (১৮৬০), ভ্রাতৃভাব (১৮৬৩), তত্ত্ববিদ্যা (১ম খণ্ড: ১৮৬৬, ২য় খণ্ড: ১৮৬৭, ৩য় খণ্ড: ১৮৬৮, ৪র্থ খণ্ড: ১৮৬৯),

স্বপ্নপ্রয়াণ (১৮৭৫), সোনার কাটি রূপার কাটি (১৮৮৫), সোনায় সোহাগা (১৮৮৫), আর্য্যামি এবং সাহেবীআনা (১৮৯০), সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা (১৮৯১), সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (১৮৯২), অদ্বৈতমতের সমালোচনা (১৮৯৬), অদ্বৈতমতের প্রথম ও দ্বিতীয় সমালোচনা (১৮৯৭), পত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম (১৮৯৮), আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত (১৮৯৯), ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন (১৯০০), আচার্য্যের উপদেশ (১ম খণ্ড : ১৯০০, ২য় খণ্ড : ১৯০২), শ্রীমন্মহর্ষিদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আচার্য্য শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা (১৯০১), বিত্ত্যা এবং জ্ঞান (১৯০৬), একটি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর (১৯০৬), বঙ্গের রঙ্গভূমি (১৯০৭), হারামণির অন্বেষণ (১৯০৮), দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব (১৯০৮), রেখাক্ষর-বর্ণমালা (১৯১২), গীতাপাঠ (১৯১৫), নানাচিন্তা (১৯২০), প্রবন্ধমালা (১৯২০), কাব্য-মালা (১৯২০), চিন্তামণি (১৯২২), পুরাতন প্রসঙ্গ (১৯২৩), Geometry in which the 12th axiom has been replaced by new ones (1864?), Ontology (1871), Boxometry (1913?)।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ॥ ১৮৪৫-১৮৮৬

বঙ্কিমসুহৃৎ রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও সেই সময়ে অত্তে পত্তে বন্ধুর মতোই সব্যসাচী ছিলেন। তিনি সুচিন্তিত কয়েকটি মাত্র প্রবন্ধ লেখেন এবং স্বল্পসংখ্যক কবিতা লেখেন। তাই আজ তিনি বিস্মৃতপ্রায়। তথাপি এ কথা বলতেই হবে তিনি তৎকালীন বাংলা গত্ত লেখকদের ভিতর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ যৌবনোত্থান (১৮৬৮), মিত্রবিলাপ (১৮৬৯), কাব্যকলাপ (১৮৭০), রাজবালা (১৮৭০), প্রথম শিক্ষা বীজগণিত (১৮৭২), প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৭৪), কবিতামালা (১৮৭৭), মেঘদূত (১৮৮২), নানা প্রবন্ধ (১৮৮৫), A lecture on Hindu Philosophy (1870), Hindoo Mythology (1870), Theory of Morals and origin of Language (1871), Hints to the Study of the Bengali Language, for the use of European and Bengali Students (1883)।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ॥ ১৮৪৬-১৯১৭

গ্রন্থ-মধ্যে ভ্রম-ক্রমে লেখকের নাম অক্ষয়কুমার মুদ্রিত হয়েছে।

সরল ভাষায় রাজনীতি আলোচনার উদ্দেশ্যে তিনি চুঁচুড়া থেকে 'সাধারণী' নামে একটি সাপ্তাহিকপত্র প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার দীপ্তিতে যখন বাংলাদেশ আলোকিত, সেই সময়েই 'সাধারণী' মারফত অক্ষয়চন্দ্র নূতন জ্যোতিষ্করূপে চিহ্নিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তরে' অক্ষয়চন্দ্রের একটি রচনা যুক্ত করে অক্ষয়চন্দ্রকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ শিক্ষানবিশের পদ্য (১৮৭৪), প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ (১৮৭৪-৭৭), সমাজ-সমালোচনা (১৮৭৪), গোচারণের মাঠ (১৮৮০), হাতে হাতে ফল (১৮৮২), সংক্ষিপ্ত রামায়ণ (১৮৮২), আলোচনা (১৮৮২), সনাতনী (১৯১১), কবি হেমচন্দ্র (১৯১২)।

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত— মোতিকুমারী (১৯১৭), মহাপূজা (১৯২১), রূপক ও রহস্য (১৯২৩) প্রভৃতি।

শিবনাথ শাস্ত্রী ॥ ১৮৪৭-১৯১৯

শিবনাথ শাস্ত্রী মূলতঃ সাহিত্যিক হলেও তাঁর হাতে ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধমালাও যে কতখানি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল 'ধর্মজীবন' গ্রন্থই তার প্রমাণ। বাংলা সাহিত্যের তিনি একজন দিক্‌পাল পণ্ডিতরূপে খ্যাত। শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনারাজির ভিতর আমরা দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের পরিচয়ও পাই।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ নির্বাসিতের বিলাপ (১৮৬৮), পুষ্পমালা (১৮৭৫), এই কি ব্রাহ্মবিবাহ (১৮৭৮), মেজবৌ (১৮৮০), গৃহধর্ম্ম (১৮৮১), জাতিভেদ (১৮৮৪), রামমোহন রায় (১৮৮৬), হিমাদ্রিকুসুম (১৮৮৭), বক্তৃতাস্তবক (১৮৮৮), পুষ্পাঞ্জলি (১৮৮৮), ছায়াময়ী পরিণয় (১৮৮৯), যুগান্তর (১৮৯৫), নয়নতারা (১৮৯৯), মাঘোৎসবের উপদেশ (১৯০২), মাঘোৎসবের বক্তৃতা (১৯০৩), রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯০৪), প্রবন্ধাবলি (১৯০৪), উপকথা (১৯০৮), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র (১৯১০), ধর্মজীবন (১ম-৩য় খণ্ড ১৯১৪-১৬), বিধবার ছেলে (১৯১৬), আত্মচরিত (১৯১৮)।

রমেশচন্দ্র দত্ত ॥ ১৮৪৮-১৯০৯

পাঠ্যাবস্থায় কৃতী ছাত্র ছিলেন। কর্মজীবনে প্রথিতযশা আই. সি. এস.। সাহিত্যে তাঁর অপরিসীম কৃতিত্বই দেশবাসীর চিত্তকে জয় করার পথ সুগম করে। প্রথমত তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসকার। এছাড়া তিনি স্বাদেশিকতায় সরকারী চাকুরি করা সত্ত্বেও বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অনেক ইংরেজিগ্রন্থ বিদেশেও আদৃত হয়েছে।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪), মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭), জীবন-প্রভাত (১৮৭৮), জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯), শতবর্ষ (১৮৭৯), ঋগ্বেদসংহিতা (১৮৮৫-৮৭), সংসার (১৮৮৬), হিন্দুশাস্ত্র (১-৯ ভাগ : ১৮৯৩-৯৭), সমাজ (১৮৯৪), সংসার কথা (১৯১০), *Three years in Europe* being extracts from letters sent from Europe. (1872). The Peasantry of Bengal (Cal. 1874), The Literature of Bengal (Cal 1877), A History of Civilization in Ancient India (Vols 1-3 : Cal. 1889-90) Lays of Ancient India (London 1894), Rambles in India (Cal. 1895), Reminiscences of a Workman's life (Cal. 1896), England and India (London 1897), Mahabharata (London 1899), Ramayana (London 1900), Open letters to Lord Curzon on Famines and Land Assessments in India (London 1900), The Lake of Palms (London 1902), The Economic History of India : 1757-1837 (Lodon 1902), Speeches and Papers on Indian Questions (Cal. 1902), India in the Victorian Age (London 1904), Baroda Administration Report (1905-7), Indian Poetry (London 1905), The Slave girl of Agra (London 1909).

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ১৮৪৯-১৯২৫

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিচিত্রকর্মা পুরুষ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মানস বিকাশে তাঁর কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত। দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি জাতীয়চেতনা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি এক উৎসাহী পুরুষ ছিলেন।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২), পুরুবিক্রমনাটক (১৮৭৪), সরোজিনী (১৮৭৫), এমন কর্ম আর ক'রব না (১৮৭৭), অশ্রুমতী নাটক (১৮৭৯), মানময়ী (১৮৮০), স্বপ্নময়ী নাটক (১৮৮২), হঠাৎ নবাব

(১৮৮৪), হিতে বিপরীত (১৮৯৬), স্বরলিপি, গীতিমালা (১৮৯৭), পুনর্বসন্ত (১৮৯৯), অভিজ্ঞান শকুন্তলা (১৮৯৯), বসন্ত-লীলা (১৯০০), ধ্যানভঙ্গ (১৯০০), উত্তরচরিত (১৯০০), রত্নাবলী নাটক (১৯০০), মালতী-মাধব (১৯০০), মৃচ্ছকটিক (১৯০১), মুদ্রা-রাক্ষস (১৯০১), বিক্রমোর্ব্বশী (১৯০১), মালবিকাগ্নিমিত্র (১৯০১), মহাবীর-চরিত (১৯০১), চণ্ডকৌশিক (১৯০১), বেণীসংহার নাটক (১৯০১), প্রবোধচন্দ্রোদয় (১৯০২), নাগানন্দ (১৯০২), দায়ে পড়ে দার-গ্রহ (১৯০২), ভারতবর্ষে (১৯০৩), ঝাঁশির রাণী (১৯০৩), বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা (১৯০৩), রজত-গিরি (১৯০৪), ধনঞ্জয়-বিজয় (১৯০৪), কর্পূরমঞ্জরী (১৯০৪), প্রিয়দর্শিকা (১৯০৪), ফরাসীপ্রসূন (১৯০৪), প্রবন্ধ মঞ্জরী (১৯০৫), এপিকটেটসের উপদেশ (১৯০৭), জুলিয়স্ সীজার (১৯০৭), ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ (১৯০৯), মার্কাস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা (১৯১১), সত্য, সুন্দর, মঙ্গল (১৯১১), জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি (১৯২০), শোণিতসোপান (১৯২০), অবতার (১৯২২), মিলিতোনা (১৯২৩), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রহস্য (১৯২৪)।

মীর মশার্‌রফ হোসেন ॥ ১৮৪৮–১৯১২

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাসাহিত্যে মীর মশার্‌রফ হোসেনের দান উল্লেখযোগ্য। উদারনৈতিক অসাম্প্রদায়িক মানুষ হিসেবে তিনি যশস্বী হন—তাঁর রচনাদিতেও এই আদর্শ অত্যুজ্জ্বল। তিনি নবাব-এস্টেটে চাকরি করলেও দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা করেছেন—দেশ-দেশান্তরের খবরাখবর যা তাঁর প্রত্যক্ষগোচর হত—তিনি রিপোর্ট হিসেবে সেগুলো তৎকালীন পত্রিকায় প্রকাশার্থে পাঠাতেন। মীর মশার্‌রফ হোসেন কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ প্রভৃতি বিষয়েই গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ রত্নবতী (১৮৬৯), গোরাই-ব্রিজ অথবা গৌরী-সেতু (কবিতা, ১৮৭৩), বসন্তকুমারী নাটক (১৮৭৩), জমীদার দর্পণ (১৮৭৩), এর উপায় কি? (১৮৭৬), বিষাদ সিন্ধু (মহরম-পর্ব, ১৮৮৫; উদ্ধারপর্ব, ১৮৮৭; এজিদবধ পর্ব, ১৮৯১), সংগীতলহরী (প্রথম খণ্ড ১৮৮৭), গো-জীবন (১৮৮৯), বেহুলা গীতাভিনয় (১৮৮৯), উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯১), গাজী মিয়াঁর বস্তানী (প্রথম অংশ ১৮৯৯), মৌলুদ শরীফ(?), মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা (প্রথম ভাগ : ১৯০৩),

(দ্বিতীয় ভাগ : ১৯০৮), বিবি খোদেজার বিবাহ (১৯০৫), হজরত ওমরের ধর্ম্মজীবন লাভ (১৯০৫), হজরত বেলালের জীবনী (১৯০৫), হজরত আমীর হাম্‌জার ধর্ম্মজীবন লাভ (১৯০৫), মদিনার গৌরব (১৯০৬), মোস্লেম-বীরত্ব (১৯০৭), এসলামের জয় (১৯০৮), আমার জীবনী (১৯০৮-১০), বাজীমাৎ (১৯০৮), হজরত ইউসোফ (আমার জীবনী ১ম খণ্ডে এই পুস্তক সম্বন্ধে ঘোষণা আছে "যন্ত্রস্থ" ১৩১৫), বিবিকুলসুম (১৯১০)।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ॥ ১৮৫৩-১৯৩১

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালী জাতির পূর্বকথা, তথা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও চর্যা আলোচনায় শাস্ত্রী মহাশয় অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উপরন্তু হরপ্রসাদের ভাষাবৈশিষ্ট্য স্মরণীয়। তাঁহার সাহিত্যবোধ গভীর ছিল, উজ্জ্বল সৃষ্টিপ্রতিভা ছিল। সর্বোপরি ছিল স্বজাতি ও স্বদেশ -প্রীতি।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ ভারত-মহিলা (১৮৮১), বাল্মীকির জয় (১৮৮১), সচিত্র রামায়ণ (১৮৮২), মেঘদূত ব্যাখ্যা (১৯০২), কাঞ্চনমালা (১৯১৬), বেণের মেয়ে (১৯২০), কলিকাতা মহানগরীতে আহূত ভারত হিন্দুসভার প্রথম মহাধিবেশনে সভাপতি মহোদয়ের সম্বোধন (১৯২৩), প্রাচীন বাংলার গৌরব (১৯৪৬), বৌদ্ধধর্ম্ম (১৯৪৮), বাঙ্গালা প্রথম ব্যাকরণ (১৮৮২), ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৯৫), প্রথম শিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৯১২), প্রসাদ পাঠ ১ম ২য় ভাগ। ইহা ছাড়া শাস্ত্রী মহাশয়ের বহু রচনা বিভিন্ন মাসিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অবস্থায় আছে। তিনি বহু ইংরাজী গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন।

বিপিনচন্দ্র পাল ॥ ১৮৫৮-১৯৩২

বিপিনচন্দ্র কেবল ধর্মসংস্কারেই আপনাকে আবদ্ধ রাখেন নি কিংবা একক রাজনীতিচর্চাও তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল না। রাজনীতি সমাজ এবং সাহিত্য—সকল বিষয়েই বিপিনচন্দ্র অগ্রণী ছিলেন। অসাধারণ বাগ্মিতা-শক্তির জন্য তিনি সারা ভারতে খ্যাতিলাভ করেন।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ শোভনা (১৮৮৪), ভারত-সীমান্তে রুস (১৮৮৫), ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া (১৮৮৭); সুবোধিনী (১৮৯২), ভক্তিসাধন (১৮৯৪), জেলের খাতা (১৯১০), চরিতকথা (১৩২৩), সত্য ও মিথ্যা

(১৩২৩), প্রবর্তক বিজয়কৃষ্ণ (১৩৪১), নবযুগের বাঙ্গালা (১৩৬২), মার্কিনে চার মাস (১৩৬২), রাষ্ট্রনীতি (১৩৬৩)।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ॥ ১৮৫৯-১৯৫৬

অধ্যাপক হিসাবে জীবন শুরু করেন। ১৯১০ সালে পুরীর পণ্ডিতসভা তাঁকে 'বিদ্যানিধি' উপাধিতে ভূষিত করেন। চাকুরিজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পরই তিনি অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে বিদ্যাচর্চা শুরু করেন। ১৯৫১ সালে *Ancient Indian Life* গ্রন্থের জন্য তিনি রবীন্দ্র-পুরস্কার লাভ করেন। বাংলা বানান সংস্কারের জন্য তাঁর উদ্যোগ স্মরণীয়।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ (১৯০৩), রত্নপরীক্ষা (১৯০৪), বাঙ্গালা ভাষা (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অধ্যায় যথাক্রমে ১৩১৫, ১৩১৭, ১৩১৯), বাঙ্গালা ভাষা (প্রথম-চতুর্থ খণ্ড ১৩২০-১৩২২), ক্ষুদ্র ও বৃহৎ (প্রথম খণ্ড ১৯১৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৩৩), শিক্ষা-প্রকল্প ১৩৫৫), পূজাপার্বণ (১৩৫৮), কোন্ পথে (১৩৫৯), বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল (১৩৬১), কি লিখি (১৩৬৩)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ১৮৬১-১৯৪১

আধুনিক ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। গল্প, উপন্যাস, ব্যঙ্গকৌতুক, দিন-লিপি, ভ্রমণকাহিনী, শিক্ষা, রাজনীতি ও দেশপ্রেম বিষয়ক প্রবন্ধ, শব্দ ছন্দ ও ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, নাটক, গদ্য-কবিতা, রূপকনাট্য, প্রহসন এবং সর্বোপরি সংগীতরচনা—একজনের হাতে বাংলা গদ্যসাহিত্য এমন নানাভাবে এর আগে আর কখনো পুষ্ট হয় নি। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে ইনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন তাঁর অসামান্য কীর্তি। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা শতাধিক।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ ১৮৬১-১৯৩০

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র প্রতিভা বহুমুখী ছিল। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও বাগ্মী ছিলেন।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ সমরসিংহ (১৮৮৩?), সিরাজদ্দৌলা (১৮৯৮), সীতারাম রায় (১৮৯৮), মীরকাসিম (১৯০৬), ফিরিঙ্গি বণিক (১৯২২), অজ্ঞেয়বাদ (১৯২৮), গৌড়লেখমালা (প্রথম স্তবক : ১৯১২)।

এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় দুই শতাধিক আলোচনা এবং প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত অবস্থায় আছে—এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ॥ ১৯৬১-১৯০৭

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় একজন সর্বত্যাগী রাজনৈতিক নেতা হিসেবেই বাঙালী সমাজে পরিচিত। তাঁর পূর্বাশ্রম নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দৈনিকপত্র সম্পাদনায় ব্রহ্মবান্ধব যুগান্তর আনেন। বাংলা সাহিত্যের চর্চায়ও তিনি নবযুগের প্রবর্তক।

রচিত গ্রন্থাবলী॥ বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি (১৯০৬), ব্রহ্মামৃত (১৯০৯), সমাজতত্ব (১৯১০), আমার ভারত উদ্ধার (১৯২৪), পালপার্বণ (১৯২৫)।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ॥ ১৮৬১-১৯৪৪

ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীদের ভিতর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবীর। তিনি কেবলমাত্র বিজ্ঞানচর্চাতেই জীবন অতিবাহিত করেন নি। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবক ও দেশপ্রেমিক। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা জাতীয়জীবনের উৎসমূলে বার বার আঘাত হেনেছেন এবং জাতিকে এক নবজীবনে উদ্‌বুদ্ধ হবার প্রেরণা জুগিয়েছেন।

রচিত গ্রন্থাবলী॥ Life and Experience of a Bengali Chemist, A History of Hindu Chemistry, হিন্দু রসায়নী বিদ্যা, প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ ॥ ১৮৬৩-১৯০২

বিবেকানন্দ দেশের কুসংস্কার দূর করে প্রকৃত আধ্যাত্মিক চেতনা আনয়নে ব্রতী ছিলেন। জাতিভেদ প্রথায় তীব্র সমালোচক ছিলেন বিবেকানন্দ। স্বল্পপরিমাণ লেখার মধ্যেও তাঁর প্রতিভার দীপ্তি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত। তাঁর হাতে গদ্যরীতি বলিষ্ঠ কথ্যভাষায় পুষ্টিলাভ করে।

রচিত গ্রন্থাবলী॥ পরিব্রাজক (১৯০৩), ভাববার কথা (১৯০৫), বর্তমান ভারত (১৯০৫), পত্রাবলী (১৯০৫), প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য; বীরবাণী (১৯০৫) ইত্যাদি।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥ ১৮৬৪-১৯১৯

যদিও রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন তথাপি তিনি বাংলা সাহিত্যের উন্নতিসাধনের জন্য অনলস প্রচেষ্টা করে গেছেন। এমন-কি সহজ ও সাবলীল বাংলায় তিনি কলেজে বিজ্ঞানের ক্লাস নিতেন এবং বাংলাভাষায় সহজবোধ্য বিজ্ঞানের গূঢ়বিষয়ে আলোচনাও করেছেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ প্রকৃতি (১৮৯৬), পুণ্ডরীককুলকীর্তিপঞ্জিকা (১৯০০), জিজ্ঞাসা (১৯০৪), বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা (১৯০৬), মায়াপুরী (১৯১১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১৯১১), কর্ম্মকথা (১৯১৩), চরিতকথা (১৯১৩), বিচিত্রপ্রসঙ্গ (১৯১৪), শব্দ কথা (১৯১৭), বিচিত্র জগৎ (১৯২০) যজ্ঞকথা (১৯২০), নানাকথা (১৯২৪), জগৎকথা (১৯২৬), পদার্থবিদ্যা (১৮৯৩), ভূগোল (১৮৯৮), বিজ্ঞানপাঠ (১৯০২), বিজ্ঞানকথা।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ॥ ১৮৬৫-১৯৪৩

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক সময়ে ভারতবর্ষের প্রখ্যাত সাংবাদিক হিসাবে বিদেশেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর সম্পাদিত Modern Review এবং প্রবাসী এক সময়ে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাসিক বলে গণ্য হয়। সাংবাদিকতা ছাড়াও তিনি বিবিধ শিক্ষা-সাহিত্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮৯১), সচিত্র বর্ণপরিচয় (১৮৯২), সচিত্র বর্ণপরিচয় (২য় ভাগ : ১৮৯৪), আরব্য উপন্যাস (১৯০৬), রাজা রবি বর্মার জীবনী (১৯০৭), সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ (১৯০৯), সচিত্র অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত (১৯২৬)। এ ছাড়া তিনি অনেক ইংরাজী গ্রন্থও প্রকাশিত করেন।

মুন্সী আবদুল করিম ॥ ১৮৭১-১৯৫৩

গ্রন্থমধ্যে রচনাশীর্ষে ভ্রমক্রমে মুন্সী আবদুল করিমের জন্মমৃত্যু তারিখ এইরূপ ছাপা হয়েছে—১৮৬৫-১৯৫২। তিনি চট্টগ্রামের পটীয়া থানার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে ১৮৭১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম কলেজে এফ. এ. পর্যন্ত পাঠ করেন, তারপর কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর

চেষ্টায় তাঁর সম্পাদিত অনেকগুলি প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

সম্পাদিত গ্রন্থতালিকা॥ রাধিকার মানভঙ্গ, বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (১ম খণ্ড ১৩২১, ২য় খণ্ড ১৩২০), সত্যনারায়ণের পুঁথি (১৩২২), মৃগলুব্ধ (১৩২২), মৃগলুব্ধ সংবাদ (১৩২২), গঙ্গামঙ্গল (১৩২৩), জ্ঞানসাগর (১৩২৪), শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস (১৩২৪) সারদামঙ্গল (১৩২৪), গোরক্ষবিজয় (১৩২৪), আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য (১৯৩৫,), পুঁথি-পরিচিতি (১৯৫৮)।

যে-সব পুরোনো পুঁথি আবদুল করিম উদ্ধার করেন তাদের পরিচয় তিনি প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন—সেই প্রবন্ধমালার সংখ্যা আনুমানিক পাঁচ শত।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়॥ ১৮৬৬-১৯২৩

পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সে যুগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় মতে উচ্চশিক্ষিত একজন সাহিত্যসেবী ছিলেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধরচনায় তিনি অসমান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

রচিত গ্রন্থাবলী॥ আইন-ই-আকবরী (১৯০০), শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (১৯০০), উমা (১৯০১), রূপ-লহরী (১৯০২), সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস (১৯০৯), বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয় (১৯১৫), সাধের বউ (১৯১৯), দরিয়া (১৯২০)।

দীনেশচন্দ্র সেন॥ ১৮৬৬-১৯৩৯

বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে দীনেশচন্দ্র সেন শ্রদ্ধার্হ। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অন্ত ছিল না। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনাতে তিনি যেমন ব্যাপৃত ছিলেন তেমনি আবার রামায়ণের একাধিক চরিত্রকে তিনি তাঁর পৌরাণিকীর ভিতর প্রাঞ্জলভাষায় ছোটদের গল্পাকারে ব্যক্ত করেছেন। এক কথায় বাংলাসাহিত্যে দীনেশচন্দ্রের দান অসামান্য।

রচিত গ্রন্থাবলী॥ কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ (১৮৯০), রেখা (১৮৯৫), বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬), তিনবন্ধু (১৯০৪), রামায়ণী কথা (১৯০৪), বেহুলা (১৯০৭), সতী, (১৯০৭), ফুল্লরা (১৯০৭), জড়ভরত (১৯০৮), সুকথা

(১৯১২), ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ (১৯১৩), গৃহশ্রী (১৯১৬), সম্রাট ও সম্রাট-মহিষীর ভারত-পরিদর্শন (১৯১৮), নীলমাণিক (১৯১৮), সাঁঝের ভোগ (১৯২০), মুক্তাচুরি (১৯২০), রাখালের রাজগি (১৯২০), রাগরঙ্গ (১৯২০), গায়ে হলুদ (১৯২০), বৈশাখী (১৯২০), সুবলসখার কাণ্ড (১৯২২), সরল বাঙ্গালা সাহিত্য (১৯২২), ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য (১৯২২), বৈদিক ভারত (১৯২২), ভয়-ভাঙ্গা (১৯২৩), দেশমঙ্গল (১৯২৪), আলোক-আঁধারে (১৯২৫), কানুপরিবার ও শ্যামলী খোঁজা (১৯২৫), চাকুরীর বিড়ম্বনা (১৯২৬), ওপারের আলো (১৯২৭), মামুদের শিবমন্দির (১৯২৮), পৌরাণিকী (১৯৩৪), বৃহৎ বঙ্গ (১ম খণ্ড-২য় খণ্ড ১৯৩৫), আশুতোষ স্মৃতিকথা (১৯৩৬), পদাবলী মাধুর্য (১৯৩৭), শ্যামল ও কজ্জল (১৯৩৮), পুরাতনী (১৯৩৯), বাংলার পুরনারী (১৯৩৯), প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে মুসলমানের অবদান (১৯৪০), History of Bengali Language and Literature (1911), Sati (1916), The Vaisnava Literature of Mediaval Bengal (1917), Chaitanya and his Companions (1917), The Folk-literature of Bengal (1920), The Bengali Ramayans (1920), Bengali prose Style (1921), Chaitanya and His age (1922), Eastern Bengal Ballads Mymensingh I to IV vols (1923, '26, '28 and 1932), Glimpses of Bengal Life (1925)।

প্রমথ চৌধুরী ॥ ১৮৬৮-১৯৪৬

ইনি ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ.। যদিও ব্যারিস্টারি পাস করেন, প্রকৃতপক্ষে প্রমথ চৌধুরী ব্যরিস্টারি করেন নি। ইনি বীরবল ছদ্মনামে লিখতেন। 'সবুজপত্র'—মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ইঁহার অন্যতম কীর্তি।

রচিত গ্রন্থাবলী॥ বীরবরের হালখাতা, চারইয়ারী কথা, সনেট পঞ্চাশৎ, নীললোহিত, রায়তের কথা, গল্পসংগ্রহ এবং প্রবন্ধসংগ্রহ ১-২।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ১৮৭০-১৮৯৯

বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকাকালীনই গদ্য লেখায় যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেন। বলেন্দ্রনাথের রচনাশক্তি বঙ্গীয় পাঠকদের মুগ্ধ করে। বলেন্দ্রনাথ সাহিত্যসমালোচক হিসাবে দক্ষ শিল্পী ছিলেন।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ চিত্র ও কাব্য (১৮৯৪), মাধবিকা (১৮৯৬), শ্রাবণী (১৮৯৭), ও বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী।

চিত্তরঞ্জন দাশ ॥ ১৮৭০-১৯২৫

প্রখ্যাত ব্যারিস্টার হিসাবে যশস্বী লাভ করলেও ইনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন দেশসেবক, এইজন্য দেশবাসীর কাছে 'দেশবন্ধু' নামেই অধিক পরিচিত। সাহিত্যচর্চাতেও এঁর নিষ্ঠা সর্বজনস্বীকৃত। উত্তরজীবনে ওকালতি ত্যাগ করে ইনি পরিপূর্ণভাবে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এরই ফলস্বরূপ কারারুদ্ধও হন।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ মালঞ্চ (১৩০৩), সাগরসঙ্গীত, মালা, অশোকগুচ্ছ।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ১৮৭২-১৯৪০

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা ইংরেজীতে অনুবাদ করে খ্যাতিলাভ করেন। এঁর গদ্য সংস্কৃত-প্রধান হয়েও প্রাঞ্জল ও সাবলীল হয়ে ওঠে।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ বিশ্বমানবের লক্ষীলাভ, কুরুপাণ্ডব।

শ্রীঅরবিন্দ ॥ ১৮৭২-১৯৫০

অরবিন্দ ঘোষ ভারতবাসীর কাছে শুধু শ্রীঅরবিন্দ নামেই খ্যাত। তাঁর আধ্যাত্মসাধনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবার জন্য তিনি পণ্ডিচেরীতে একটি আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করেন এবং সেইখানেই আমৃত্যু সাধনা করে যান। যৌবনে তিনি ইংরেজিতে অনেক কবিতা লিখেছিলেন। প্রথমজীবনে স্বাদেশিকও ছিলেন। মাণিকতলার বোমার মামলা থেকে উদ্ধার পাবার পরই অকস্মাৎ তিনি আধ্যাত্মিকজগতে আত্মলীন হন।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ The light divine (1939) সাবিত্রী (১৯৫০) The Hero and the Myth (বিক্রমোর্বশী), Urvasie, Song of Myrtilla and other poems, Essays on Gita.

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১৮৮৫-১৯৩০

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দুইভাবে আমাদের নিকট পরিচিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হিসাবে তাঁর যেমন খ্যাতি, তেমনি আবার তিনি ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক রূপেও আমাদের কাছে পরিচিতি লাভ করেছেন। রাখালদাসের

আগে বিশেষভাবে মোগল-রাজপুত কাহিনী নিয়েই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়েছে, কিন্তু রাখালদাসই সর্বপ্রথম হিন্দুযুগকে আশ্রয় করে সেযুগের ছবি উপন্যাসে চিত্রিত করলেন।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ পাষাণের কথা (১৩২১), শশাঙ্ক (১৩২১), ধর্মপাল (১৩২২), করুণা (১৩২৪), ময়ূখ, অসীম (১৩৩১) ইত্যাদি।

বিনয়কুমার সরকার ॥ ১৮৮৭-১৯৪৯

বাঙালী যুবকদের মধ্যে প্রেরণাসঞ্চারের জন্যই বিনয়কুমার সরকার প্রভৃত কাজ করেছেন। দেশবিদেশে ভারতের বাণী বহন করা তাঁর অন্যতম কাজ ছিল। বঙ্গীয়-সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ ও বঙ্গীয়-ধনবিজ্ঞান পরিষৎ নামে দুইটি সংঘ গঠন করে তিনি বিবিধ বিষয় নিয়ে তরুণদের আলোচনা করার ব্যবস্থা করেন। বাংলা ভাষা জোরদার করার দিকে তাঁর প্রয়াস সর্বজনবিদিত।

রচিত গ্রন্থাবলী ॥ বিনয় সরকারের বৈঠকে, বাড়তির পথে বাঙালী। ইংরাজিতেও অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

———

সুশীল রায় বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী। সাহিত্য-সমালোচকেরা সংগতভাবেই তাঁকে এই আখ্যায় অভিহিত করেছেন। কবিতা গল্প উপন্যাস রম্যরচনা জীবনী—সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে তিনি সমান নিপুণতার ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সাহিত্য-রসিকমাত্রেরই প্রীতিভাজন হয়েছেন। সুশীল রায় ক্লাসিক মনের অধিকারী। তাঁর চিন্তার গভীরতা ও আন্তরিকতা থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতের আখ্যায়িকা অবলম্বনে তিনি রচনা করেছেন কাহিনীকাব্য 'প্রণয়ীপঞ্চক', বর্তমান কালে কাহিনীকাব্যের তিনি



প্রর্তবক; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী বলেছেন "এই পথে তিনি নূতন যুগের প্রথম পথিক।" আবার, সুশীলবাবু রচনা করেছেন কালিদাসের মেঘদূত খণ্ডকাব্যের নূতন ভাষ্য 'আলেখ্যদর্শন'; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লেখকের কারয়িত্রী প্রতিভার সঙ্গে ভাবয়িত্রী প্রতিভার উল্লেখ ক'রে এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন সুশীলবাবুকে আখ্যাত করেছেন "নূতন মল্লিনাথ" ব'লে।

সুশীল রায় রচিত অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে—'গল্পসঞ্চয়ন' 'একদা' 'শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু' 'মধুমাধবী' 'ত্রিনয়না' 'পাঞ্চালী' ইত্যাদি এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'অনল-আয়তি'।

তাঁর রচিত 'মনীষী-জীবনকথা' গ্রন্থে জীবনী-সাহিত্যরচনায় সুশীল রায় যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন সম্ভবত তার তুলনা নেই। তাঁর প্রবর্তিত ধারা অনেককে আজকাল অনুসরণ করতে দেখা যাচ্ছে। এই গ্রন্থে তেত্রিশ জন মনীষীর জীবনকথা গ্রথিত হয়েছে, তাঁদের কাছ থেকে তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করে সুশীলবাবু রচনা করেছেন এই মহাগ্রন্থটি। এই গ্রন্থটি সুশীলবাবুর সাহিত্যিক জীবনের একটি অন্যতম স্মরণীয় কীর্তি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনকথা 'জোতিরিন্দ্রনাথ' গ্রন্থটির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সুশীলবাবুকে তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ কিছুকাল আগে ডক্টরেট উপাধি দিয়েছেন। রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে সুশীলবাবুর জ্ঞানের গভীরতাও এই গ্রন্থে ধরা পড়ে।

তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ হচ্ছে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত 'মেঘদূত' ও বাংলা দেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের রচনাসংগ্রহ এই 'বঙ্গপ্রসঙ্গ' গ্রন্থটি।

সুশীল রায় 'বিশ্বভারতীর পত্রিকা'র সম্পাদক এবং কবিতার মাসিক পত্র 'ধ্রুপদী'র সম্পাদক।